কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

Kwlwk¶v

beg-`kg †kwY

রচনা

প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন fTv
প্রফেসর মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দ. জুলফিকার হোসেন
এ কে এম মিজানুর রহমান

m¤úv`bv
অধ্যাপক ড. মোঃ সদরুল আমিন

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †ewW, XvKv

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW
69-70, gwZwSj ewYwR¨K GjvKv, XvKv-1000
KZK cKwkZ|

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

cvV¨c¯ÍK **প্রণয়নে সমন্বয়ক**
kvnxbi বেগম
মোঃ দুলাল মিঞা fTv

Kw¤úDUvi K‡¤úvR
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

c"Q`
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
স্নিগ্ধ শেখর চিন্তাপত্র

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ¯—ক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামল্যে বিতরণের জন্য

g`‡Y:

cm•M-K_v

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের cekZ| আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার cwicY বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক ¯—‡i অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে D"PZi শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ ¯—‡ii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত cUfwgi প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj¨‡eva থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃ ùZ প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ev¯—evq‡b শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii cvq mKj cvV¨c¯—K। উক্ত cvV¨c¯—K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও ce অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। cvV¨c¯—K¸‡jvi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj¨vqb‡K সৃজনশীল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ gjZ কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত fwgi সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলানোর লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে cvV¨c¯ÍKwU প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে cvV¨c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। কাজেই cvV¨c¯ÍKwUi আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো MVbgjK ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। cvV¨c¯ÍK প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে cvV¨c¯ÍKwU‡K আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

cvV¨c¯ÍKwU iPbv, m¤úv`bv, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। cvV¨c¯ÍKwU শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

c‡dmi †gvt †gv¯Ídv Kvgvj Dwïb
†Pqvig¨vb
RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW, XvKv

mwPcÎ

Aa¨vq	Aa¨v‡qi wk‡ivbvg	cô v
c_g	Kwl chw³	1-35
wØZxq	Kwl DcKiY	36-71
ZZxq	Kwl I Rjevq	72-96
PZ_	KwlR Drcv`b	97-174
cÂg	ebvqb	175-200
lô	Kwl mgevq	201-207
mßg	cwiewiK Lvgvi	208-227

প্রথম অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

কৃষিকাজ এবং কৃষি প্রযুক্তি একে অপরের cwiciK| gjZ যে প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজ করা হয় তাই n‡"Q কৃষি প্রযুক্তি। প্রতিটি কৃষিকাজের সাথে সুনির্দিষ্ট কৃষি প্রযুক্তির m¤úK রয়েছে। বর্তমানে কৃষি আর শুধু পারিবারিক খাদ্য সংস্থানের বিষয় নয়। এটা এখন ব্যবসায়িক পেশায় উন্নীত হয়েছে। আগে কৃষি বলতে জমি হাল-চাষ করে বীজ বুনে ঘরে ফসল তুলে বছরের খোরাক সংগ্রহ করাকেই বোঝাত। কিন্তু এখন কৃষির প্রতিটি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচাদি ও ফসলের evRvig‡j¨i মাপকাঠিতে আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করে ব্যবসায় দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিকে gj¨vqb করা হয়। তই এখন কৃষি সমস্যা যেমন জটিলতর n‡"Q তেমনি কৃষি বিজ্ঞানীরাও D"PZi জ্ঞানসমৃদ্ধ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। আগের শ্রেণিগুলোতে আমরা কৃষিকাজের নাম, সংশিষ্ট প্রযুক্তির নাম, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়াদি শিখেছি। নবম-দশম শ্রেণিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে জমির c¯‘wZ, উর্বরতা বৃদ্ধি, ফসলভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য, fwgক্ষq, fwg¶q‡ivা, বীজ সংরক্ষণ, রোগবালাই দমন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং সংশিষ্ট প্রযুক্তি m¤ú‡K Rvbe।

চিত্র : পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে জমি চাষ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারব।

২। ধাপ উল্লেখপূর্বক জমির c¯‘Z পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

৩। জমি c¯‘wZi প্রয়োজনীয়তা বিশেষণ করতে পারব।

৪। fwg¶q, fwg¶‡qi কারণ ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫। fwg¶‡qi ¶তিকারক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব।

৬। ভূমিক্ষয়ের কার্যকরী Dcvqmgn বিশ্লেষন করতে পারব।

৭। বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব।

৮। বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯। শস্যবীজ সংরক্ষণ করতে পারব।

১০। মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

১১। মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।

১২। m¤úiK খাদ্য m¤ú‡K ব্যাখ্যা করতে পারব।

১৩। মাছের ও পশুপাখির m¤úiK খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারব।

১৪। মাছ ও পশুপাখি m¤úiK খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

১৫। মাছ ও পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য m¤úiK খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল নির্বাচন

মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটি ফসল উৎপাদনের একটি মাধ্যম। ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল। মাটি পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস। সব মাটিতে সব ফসল জন্মায় না। যেমন: ধানগাছ কাদা মাটি বা কাদা দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। অপর দিকে বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ পছন্দ করে। তবে বাংলাদেশের মাটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পলি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরনের ফসলই কমবেশি জন্মায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই নরম, হালকা, awjgq ও কর্ষণযোগ্য। মাটি বলতে তাকেই বোঝায় যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় আর গবাদিপশু বিচরণ করে। একজন কৃষককে যখন মাটি m¤ú‡K জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঝটপট বলে থাকেন যে f-Z‡Ki গভীরে যতটুকু লাঙলের ফলা পৌঁছে, তাই মাটি এবং ফসল উৎপাদনের উপযোগী। অর্থাৎ কৃষকের ভাষায় ভ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি. গভীর ¯Íi‡K মাটি বলা হয়। অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ ¯Í‡iB নিহিত।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মাটিতে অল্প we¯Íi সব ফসলই জন্মে। কিন্তু সব AÂ‡ji মাটির বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও ধান ভালো হয়, কোথাও গম, কোথাও আলু আবার কোথাও পাট ভালো হয়। নিচে বিভিন্ন ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ধান চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	গম চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) কংকর ও বেলেমাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষের উপযোগী। এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য খুব ভালো। নদ-নদীর অববাহিকা ও হাওর-বাঁওড় এলাকা যেখানে পলি জমে সেখানেও ধান ভালো হয়। ২) প্রকারভেদে উঁচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনের জমিতেই ধানের চাষ করা যায়। যেমন, নিচু জমিতে বোরো ও জলি আমন চাষ করা হয়। ৩) মাটির অম্লত্বক থেকে নিরপেক্ষ অবস্থা ধান চাষের অনুকূল। ৪) মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কমপোস্ট ব্যবহার করে এর মাত্রা বড়ানো যায়। ৫) মাটির নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিঙ্ক, সালফার ইত্যাদির মাত্রা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।	১) উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। মাঝারি নিচু জমিতেও গম চাষ করা হয়। ২) দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য ভালো। এঁটেল - দোআঁশ মাটিতেও গমের চাষ হয়। ৩) বাংলাদেশের DËivÂ‡ji জেলাগুলোতে গমের চাষ ভালো হয়। এছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরেও গমের আবাদ হয়। ৪) বাংলাদেশের সব কৃষি AÂ‡j গমের চাষ হয় না। বিশেষ করে হাওর - বাঁওড় ও বিল AÂ‡j গমের আবাদ করা হয় না। ৫) যে মাটিতে অম্লত্বক-ক্ষারত্বক মাত্র ৬.০ থেকে ৭.০ সেসব মাটিতে গম ভালো হয়।

পাট চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	ডাল চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল fwg‡Z পাট ভালো জন্মে। ২) নদীবাহিত গভীর পলিমটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। ৩) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট ভালো জন্মে।	১) উঁচু ও মাঝারি জমিতে দোআঁশ, বেলে দোআঁশ এঁটেল দোআঁশ এবং পলি দোআঁশ মাটিতে ডাল জাতীয় জন্মে। ডাল ফসল অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারেনা। তাই নিষ্কাশনযোগ্য মাটিই ডাল চাষের জন্য উপযোগী। ২) ডাল নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় চুনযুক্ত মাটিতে ভালো হয়। ৩) শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহওয়া এবং অল্প বৃষ্টিপাত ডাল ফসল চাষের জন্য উপযোগী। এরূপ আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত যদি থাকে আর মাটি যদি হয় বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ। তবে সে আবহাওয়ায় অবশ্যই ডাল ফসল ভালো ফলন দিবে। ৪) বিনা চাষে ডাল ফসল আবাদের জন্য নিচু ও মাঝারি জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি থেকে বর্ষার পানি নেমে গেলে ভেজা মাটিতে ডাল ফসলের বীজ বোনা হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটি উপযোগী ফসলগুলোর তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সবজি জাতীয় ফসলের মাটির বৈশিষ্ট্য

সবধরনের শাকসবজিই উঁচু, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। নিচে আলু ও চমেটো চাষপোযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

গোল আলু চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি আলু উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।	১) যে কোনো প্রকার মাটিতে টমেটোর চাষ করা যায়। তবে বেলে ও কংকরময় মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় না।
২) আলুর জন্য বায়ু চলাচল করতে পারে এরূপ নরম ও ঢিলেঢালা মাটি দরকার। এতে আলু বড় হওয়ার সুযোগ পায়।	২) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের উপযোগী।
৩) গোলা আলুর মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকা দরকার।	৩) বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করলে টমেটোর চাষ মোটামুটি করা যায়।
৪) মাটির অম্মানের মাত্রা ৬-৭, এর মধ্যে থাকা ভালো।	৪) মাটির অম্মান মাত্রা নিরপেক্ষ মাত্রার কাছাকাছি হলে ভালো হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কোন ধরনের মাটিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

মৃত্তিকাভিত্তিক পরিবেশ AÂ‡ji বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

আগের পাঠগুলোতে আমরা ফসলের শ্রেণি অনুযায়ী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শিখেছ। এই পাঠে আমরা মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে শিখব। মাটির বৈশিষ্ট্য বলতে মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত খনিজের মাত্রা ও অম্মান মাত্রা এবং মাটির বন্ধুরতাকে বোঝায়। আমরা নিশ্চয় জেনেছ যে মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশেকে ত্রিশটি কৃষি পরিবেশ AÂ‡j ভাগ করা হয়েছে। কোনো একটি কৃষি পরিবেশ AÂj প্রকৃতপক্ষে সে AÂ‡ji মাটির প্রতিনিধিত্ব করে। এক একটি কৃষি AÂj এক একটি প্রযুক্তিও বটে। কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মাটির বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা। মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন কৃষি কর্মের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি যত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষিকাজের ফলাফলও তত বেশি লাভজনক হবে। মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০ টি কৃষি পরিবেশ AÂj‡K নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই AÂj¸‡jvi মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন দেখানো হলো।

১। দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি AÂj

২। কাদা মাটি AÂj

৩। বরেন্দ্র AÂj ও মধুপুর AÂj

৪। পাহাড়ি ও cv`fwg AÂj

৫। DcKjxq AÂj

মৃত্তিকা ভিত্তিক AÂj	চাষ উপযোগী ফসল
দোআঁশ মাটি AÂj: কৃষি পরিবেশ AÂj ১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৯-এর মাটি দোআঁশ। তন্মধ্যে ৯ ও ১৯ এর AÂj মাঝারি নিচু হলে মাটি দোআঁশ মাটিবিশিষ্ট। অপর দিকে পরিবেশ AÂj ১১ উঁচু fwg ও মাটি দোআঁশ বিশিষ্ট। এছাড়া সবই উঁচু fwgi অন্তর্ভুক্ত। দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি।	দোআঁশ মাটিতে প্রায় সব রকমের ফসল ফলে। দোআঁশ ফসল উৎপাদনের আদর্শ মাটি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। আবার সেচের উপর নির্ভর করেও কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উলেখ করা হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** **রবি মৌসুম :** গম, মুলা, টমেটো, ফুলকুপি, বাধাকপি, ঢেঁড়শ, মরিচ, চিনা বাদাম ইত্যাদি খরিপ-১ : রোপা আউশ, বোনা আমন, পাট (সাদা), কাউন, বেগুন, তিল, মুগ, বোনা আউশ, ভুট্টা, ^aÂv ইত্যাদি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত/ উফশী) **সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন** **রবি মৌসুম :** বোরো, আখ, আখ+আলু, আখ+মুগ, পিয়াজ, রসুন, গম, আলু, মুগ, সরিষা ইত্যাদি খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট (তোষা), তিল, ভুট্টা খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত জাত/ উফশী)
কাদা মাটি AÂj পরিবেশ AÂj ৫, ৬, ১৫, ২০ ও ২১ কাদামাটি AÂ‡ji অন্তর্গত। এই AÂj¸‡jvi মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু এলাকার মাটি কর্দম বিশিষ্ট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলি কাদা বিশিষ্ট মাটিও লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মাঝারি মাত্রায় জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে D"Pমাত্রার জৈব পদার্থও আছে। পটাশজাত খনিজের মাত্রা মাঝারি।	মাঝারি নিচু ও নিচু AÂjmg‡n কাদা মাটি বেশি দেখা যায়। কাদা মাটিতে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। নিম্নে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উলেখ করা হলো। বৃষ্টিনির্ভর বা সেচনির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই এই AÂ‡ji ফসল প্রধানত ধান। রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা থাকলে কিছু পরিমাণ অন্যান্য ফসলও জন্মে।

মৃত্তিকা ভিত্তিক AÂj	চাষ উপযোগী ফসল
বরেন্দ্র ও মধুপুর AÂj বরেন্দ্র ও মধুপুর AÂ‡j বেশিরভাগ জমিই উঁচু এবং মাঝারি উঁচু। কৃষি পরিবেশ AÂ‡ji ২৫, ২৬, ২৭ বরেন্দ্র AÂ‡ji অন্তর্ভুক্ত। ২৮ মধুপুর AÂj¸‡jv সমতল ও উঁচু fwg বিশিষ্ট। এর মাটি দোআঁশ। মাটিতে নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর অম্মান মাত্রা ৫.৫-৬.৫। চিত্র : দোআঁশ মাটি	উঁচু ও মাঝারি উঁচু fwg বরেন্দ্র ও মধুপুর AÂ‡ji প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই AÂ‡ji মাটি দোআঁশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো সেচ পেলে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করা যায়। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নামের তালিকা দেওয়া হলো। **বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : বোরো, আম, আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, বার্লি ও শীতকালীন শাকসবজি। খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, কাউন, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)। **সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, গম, সরিষা, চিনাবাদাম, মসুর, টমেটো, বাধাকপি, ছোলা, শতীকালীন শাকসবজি খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট, মুগ, ঢেঁড়শ খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উফশী)।
পাহাড়ি ও পাদভূমি AÂj কৃষি পরিবেশ AÂj ২২, ২৯ ও ৩০ এর অর্ন্তভুক্ত। এর ৯০ শতাংশের বেশি fwg উঁচু। খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও আখাউড়া এই AÂ‡ji অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আরও অনেক জেলার পাহাড়ি AÂj এর অন্তর্ভুক্ত। এই AÂ‡ji মাটি দোআঁশ। জৈব পদার্থের ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা সামান্য। এখানকার মাটির অম্মান মাত্রা ৫ - ৫.৭।	পাহাড়ি ও cv`fwg AÂ‡jর মাটি দোআঁশ হওয়াতে পাহাড়ি AÂ‡jI নানাবিধ ফসল উৎপাদন হয়। নিচে এই মাটিতে উপযোগী বৃষ্টি নির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের তালিকা দেওয়া হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, গম ইত্যাদি খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, বোনা আমন খরিপ-২ : রোপা আমন **সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, আখ+মসুর, বোরো, গম, সরিষা ইত্যাদি খরিপ-১ : ^aÂv, বোনা আউশ, রোপা আউশ খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত/ উফশী)

মৃত্তিকা ভিত্তিক AÂj	চাষ উপযোগী ফসল
উপকূলীয় AÂj কৃষি পরিবেশ AÂ‡ji ১৩, ১৪, ১৮, ২৩, ২৪ DcKjxq AÂ‡ji অন্তর্ভুক্ত। এখানে মাঝারি উঁচু fwgi আধিক্য বেশি। এর মাটি দোআঁশ এবং বেলে ও পলি দোআঁশ, যার জৈব পদার্থের ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা অল্প। এই AÂ‡ji মাটির অম্মান মাত্রা ৭.০ - ৮.৫। 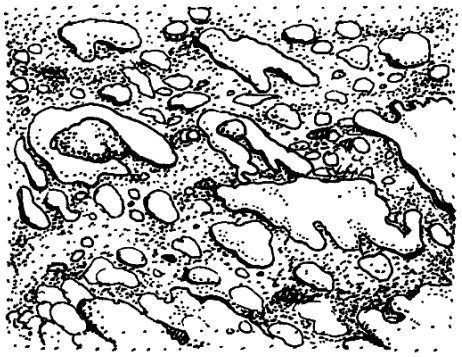 চিত্র : পলিমাটি	সেন্টমার্টিন দ্বীপ, চিটাগং, ফেনী, বরিশাল এই AÂ‡ji প্রধান প্রধান এলাকা। যেহেতু এখানকার মাটি দোআঁশ, বেলে ও পলি দোআঁশ তাই বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য এই AÂ‡j উৎপাদন হয়। নিচে এই AÂ‡j বৃষ্টিনির্ভর ও সেচনির্ভর ফসলের নাম উলেখ করা হলো। **বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : গম, সরিষা, মুগ, মরিচ, পেয়াজ, রসুন, মুলা, বেগুন, শিম, টমেটো, চিনাবাদাম, ভুট্টা ইত্যাদি খরিপ-১ : বোনা আউশ, রোপা আউশ, পাট, কাকরোল ইত্যাদি খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত/ উফশী) **সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন** রবি মৌসুম : বোরো, টমেটো, আলু, সরিষা, তরমুজ, মুগ, মরিচ ইত্যাদি। খরিপ-১ : রোপা আউশ খরিপ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত/ উফশী)

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম/উপজেলা কোন পরিবেশ AÂ‡ji অন্তর্ভুক্ত তা শিকের কাছ থেকে জেনে নেবে। অতঃপর গ্রামের মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশেষণ করে মাটির প্রকার উলেখ করেএই m¤ú‡K প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

কৃষির যত কাজ আছে তন্মধ্যে গুরুতcY কাজ হলো জমি c¯‘wZ| সব ফসলের জন্য জমি c¯ÍwZ এক রকম নয়। যেমন বোরো বা বোনা আমন ধানের ক্ষেত্রে আগে চারা উৎপাদন করতে হবে, তারপর gj জমি c¯‘Z করে চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু বোনা আউশ বা বোনা আমনের ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন না করে সরাসরি c¯‘ZKZ gj জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রায় একইরূপ গমের ক্ষেত্রেও ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। জমি c¯‘wZi সাথে বহুমুখী কাজ জড়িত। যথা জমি চাষ, মই দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে ফসলভিত্তিক প্রত্যেকটি কাজের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হলো।

রোপা আমন ও বোরো জমির প্রস্তুতি:

রোপা আমন ও বোরোর জন্য জমির দ্বিবিধ c¯‘wZ নিতে হবে। যথা বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন এবং gj জমি c¯‘Z করা।

বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন: রোপা আমন/ বোরো চাষের প্রথম কাজ n‡"Q বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন করা। কর্দম ও শুকনো দুই অবস্থায়ই রোপা আমনের বীজতলা তৈরি করা হয়। কিন্তু বোরোর বেলায় শুধু কর্দম বীজতলা করা হয়।

কর্দম বীজতলা প্রস্তুতি : বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু fwg নির্বাচন করা দরকার যেখানে বর্ষার পানি দাঁড়ায় না। বীজতলা কত বড় হবে তা নির্ভর করে কৃষকের gj জমি কত বড়। gj জমি যদি এক হেক্টর হয় তবে সাড়ে সাত কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। দেশি মাপে এক বিঘা জমির জন্য এক কাঠা বা ৭০ বর্গমিটার পরিমাণ বীজতলার প্রয়োজন। নিচে এক কাঠা জমিতে কীভাবে বীজতলা তৈরি করা যায় তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো।

ধাপ- ১: ১০×৭ বর্গ মিটার জমি নির্বাচন করা। অত:পর এই নির্বাচিত জমিতে ২০০ - ২৫০ কেজি গোবর বা কমপোস্ট প্রয়োগ করা। এরপর জমিতে ২ - ৩টি চাষ এমনভাবে দেওয়া যেন গোবর বা কমপোস্ট মাটির সাথে মিশে যায়।

ধাপ- ২: সঠিকভাবে চাষের পর (১০×১.৭৫) বর্গমিটার পরিমাণ ৪টি খণ্ড করা। জমির চার পাশে ২৫ সেমি নালার জন্য ফাঁক রেখে খণ্ড করতে হবে। এক খণ্ড থেকে অপর খণ্ডের মাঝে প্রায় ৩০ সেমি. ফাঁক থাকবে। আর ফাঁক জায়গা থেকে ১৫ সেমি. গভীর নালা করে মাটি উভয় দিকে ফেলা ও বীজতলা উঁচু করা। এই নালার সাহায্যে বীজতলায় পানি সেচ ও নিষ্কাশন সহজতর হয়।

ধাপ- ৩: এই ধাপে বীজতলায় সার প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া ২৫০ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ গ্রাম এবং এমপি ১২৫ গ্রাম বীজতলায় ছিটিয়ে কাদা করা।

ধাপ- ৪: বীজতলায় সার ছিটিয়ে কাদা করার পর সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বুনতে হবে।

শুকনো বীজতলা কর্দম বীজতলার ন্যায় c¯‘Z করা হয়। এর জন্য বীজতলা কাদা না করে মাটি ঝুরঝুরা করে ৩ কেজি বীজ বপন করতে হবে। আর নালায় পানি প্রবাহিত করে মাটিকে সিক্ত করা হয়।

নিয়মিত ও প্রয়োজনমতো যত্ন করলে চারা গজাবে এবং ২৫-৩০ দিন বয়স হলে gj জমিতে রোপণের উপযুক্ত হবে।

মল জমি প্রস্তুত: জমি c¯‘wZi সর্বপ্রথম কাজ হলো জমি চাষ দেওয়া। জমি চাষ বলতে বোঝায় ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমির উপরের ¯Í‡ii মাটি আলগা করা যাতে সুষ্ঠুরূপে বীজ গজায় এবং ফসলের বৃদ্ধি ঘটে।

চারা রোপণের জন্য মল জমি প্রস্তুত করা : রোপা আমন, খরিপ-২ এর ফসল। তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং জমিতে ৪-৫ বার চাষ ও বার দুয়েক মই দিয়ে কাদা করা হয়। আজকাল পাওয়ার ট্রিলারের সাহায্যে রটোভেটর লাগিয়ে সহজে ভেজা মাটিকে কাদা করা যায়। জমিতে ceeZx ফসলের গোড়া বা আবর্জনা থাকে সেগুলো কাদায় ঢেকে যায়। এগুলো ঠিকমতো পচার জন্য ১০-১৫ দিন সময় লাগে। আবর্জনাগুলো m¤úY পচে গেলে জমি চারা রোপনের উপযুক্ত হয়। বোরো মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না। তখন সেচের মাধ্যমে জমি ভিজিয়ে কাদা করতে হয়। জমিতে কাদা করার সময় ক্ষেতের চারদিকের আল ঘেষা জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঠিক করে নিতে হবে। পানি আটকানোর জন্য জমির ঢাল অনুসারে জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করার দরকার হয়ে পড়ে। তা না হলে পানি ঢাল বেয়ে একদিকে চলে যায়। এতে পানির অপচয় হয় এবং সার প্রয়োগ করতেও অসুবিধা হয়। ধান চাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ে we¯ÍwiZ আলোচনা করা হয়েছে।

গম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ

গম রবি শস্য। বর্ষার মৌসুম শেষ হওয়ার পর নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত গম চাষের উপযুক্ত সময়। মাটির 'জো' দেখে জমিতে লাঙল চালনা করা হয়। গমের মাটি ঝুরঝরা করে c¯‘Z করা প্রয়োজন। এজন্য ৩ থেকে ৪ বার আড়াআড়ি জমি চাষ দিয়ে বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা হয়। জমিতে যাতে কোনো বড় ঢেলা না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। গমের জন্য দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। এ মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয়। পাওয়ার টিলারের সাথে রটোভেটর সংযোগ করে জমি চাষ দিলে মাটি চাষ হয় এবং একই সাথে মইও দেওয়া হয়। ঝুরঝুরা মাটি গমের অঙ্কুরোদগমের জন্য খুবই উপযোগী। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা গম চাষে সার প্রয়োগ m¤ú‡K জেনেছি।

ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি প্রস্তুতি :

বাংলাদেশে ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি চাষ করা হয় না। তবে মসুর ডালের জন্য জমিতে দু-একটি চাষ দেওয়া হয়। বর্ষা শেষ হলে আশ্বিন - কার্তিকে যখন নদীর চর ও নিচু এলাকা হতে পানি সরে যায় তখন নরম পলি মাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। চাষ দেওয়া সম্ভব হলে দু-একটি চাষও দেওয়া হয়। চাষের পর পতিত জমিতে আবার অনেক সময় রোপা ও বোনা আমনের জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ডালের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

নিচু এলাকায় বর্ষার পানি নেমে গেলে বা উঁচু এলাকায় আশ্বিন মাস হতে আলু চাষের জন্য জমি c¯‘wZi কাজ শুরু করা হয়। সাধারণত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আলুর চাষ করা হয়। এই মাটি চাষ করা মোটামুটি সহজ। আলুর জমি ৫-৬ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরাঝুরা করে জমি পাইট করা হয়। আজকাল পাওয়ার টিলার দ্বারা চাষ করা হয় বলে ৩-৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিলেই ঝুরঝুরা হয় এবং সমান করা হয়।

নালা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি :

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেওয়ার পর জমি সমান করে বীজ বপনের জন্য জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নালা করতে হবে। প্রত্যেকটি নালা প্রায় ১০-১২ সেমি. গভীর করতে হবে। একটি নালা থেকে আর একটি নালার `iZ হবে ৬০ সেমি। অতঃপর নালার মধ্যে ১৫ সেমি. `‡i `‡i বীজ বুনে দিতে হয়। আলুচাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জমি প্রস্তুতির গুরুত্ব

fwg কর্ষণ জমি c¯‘wZi প্রথম ধাপ। fwg কর্ষণের সংকীর্ণ অর্থ হলো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জমির মাটি যন্ত্রের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা। কিন্তু fwg কর্ষণের সাথে নানা প্রযুক্তি জড়িত। যেমন, বীজকে অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক গভীরতায় স্থাপন করা, মাটিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করা, উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিয়ে আসা, মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করে জমি c¯‘wZi গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আর এই গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য fwg কর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে "শস্যের বীজ মাটিতে সুষ্ঠুভাবে বপন ও পরবর্তী পর্যায়ে চারাগাছ বৃদ্ধির জন্য মাটিকে যে প্রক্রিয়ায় খুঁড়ে বা আঁচড়ে যে আগাছামুক্ত, নরম, আলগা ও ঝুরঝুরা করা হয় তাকে fwgKlY বলে"।

fwg কর্ষণ জমি c¯‘wZi প্রাথমিক ধাপ। আদিকাল থেকেই মানুষ fwg কর্ষণ তথা জমি c¯‘wZi গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তারা কাঠের বা পাথরের তৈরি সুচালো যন্ত্রের সাহায্যে মাটি আলগা ও নরম করে ফসলের বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতেন। ফসলভেদে fwg কর্ষণের তারতম্য হতে পারে কিন্তু এর গুরুত্ব কখনো খাট করে দেখার বিষয় নয়।

জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খনার বচনে উলেখ আছে যে,

ষোল চাষে মুলা
তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবে। কৃষকেরা ধান চাষের জন্য জমি তৈরি করছেন তা দেখবে এবং জমি c¯‘wZi কর্মকাণ্ডগুলো খাতায় লিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন রকমের জমি c¯‘wZi কারণ খুঁজে বের করে লিখবে।

অর্থাৎ মুলা চাষের জন্য ষোলটি চাষ দিতে হবে যতক্ষণ না মাটি ঝুরঝুরা আলগা না হয়। Zjv চাষের জন্য আট চাষ দিতে হবে আর ধানের জন্য চারটি চাষই যথেষ্ট। মজার ব্যাপার হলো পান উৎপাদনে কোনো চাষই লাগেনা। আর এই ধারণা থেকেই আজকাল বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে 'বিনা চাষ' প্রথা প্রচলন করা হয়েছে। এখন অনেক কৃষকই বিনা চাষে fÆv, ডাল ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করেন।

fwg কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য :

fwg কর্ষণের উদ্দেশ্য থেকেই জমি c¯‘ZKi‡Yi প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। নিচে fwg কর্ষণের উদ্দেশ্য উলেখ করা হলো:

১. **মাটি বীজের অঙ্কুরোদগম অবস্থায় আনয়ন:** যে প্রক্রিয়ায় মাটিকে ঝুরঝুরা করে বীজের অঙ্কুরোদগমের অবস্থায় আনা ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করা হয় তাকে কর্ষণ বলে। জমিতে বারবার চাষ দেওয়ার ফলে মাটি নরম হয়, দানাদার পাউডার হয় আর তাতে বীজ গজানো ও ফসল জন্মানোর এক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কীভাবে কতটুকু c¯‘Z করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদ, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারের উপর। দোআঁশ, বেলে বা বেলে দোআঁশ মাটির মতো হালকা মাটিতে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিলে fwg কর্ষণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মতো ভারী মাটিতে ৫/৬ বার চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে রস থাকলে চাষের সময় মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয় আর রস না থাকলে বড় বড় ঢেলা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে মাটির কণা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অঙ্কুরোদগম হয়।

২. **মাটি সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণকরণ :** জমিতে সার দিতে হয় এবং জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। fwg কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাটির সাথে সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো। এ জন্যে জমি দুই একবার চাষ দেওয়া হলে গোবর বা Kg‡cv÷ জমিতে ছিটাতে হয়। পরবর্তী চাষের সময় এগুলো মাটিতে মিশে যায়। অনেক সময় ˆaÂvi চাষ করেও সবুজ সার হিসাবে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশানো হয়। তাতে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

৩. **ভ-অভ্যন্তরস্থ কীঠ-পতঙ্গ দমন:** মাটির অভ্যন্তরে অনেক পোকা আছে যেগুলো ফসলের অনেক ক্ষতি করে। fwg কর্ষণের সময় এসব পোকা, পুত্তলি ও ডিম উন্মুক্ত হয় এবং পাখিরা এগুলো খেয়ে নিধন করে। আর mhv‡jvKl সেগুলো ধ্বংস করে। মাটির নিচের পোকাগুলোর মধ্যে উই, উরচুঙ্গা ও পিপিলিকা প্রধান।

৪. **মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:** fwg কর্ষণ মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। অকর্ষিত fwg থেকে পানি তাড়াতাড়ি ew®ú হয়ে যায় অথবা পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কর্ষিত জমিতে সার বা সেচের পানি আটকা পড়ে যা পরে মাটি শুষে নেয়। অর্থাৎ কর্ষিত জমির মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এরূপ মাটিতে বীজ বুনলে ভালো অঙ্কুরোগম হয় এবং ফসলের বৃদ্ধি ঘটে।

৫. **মাটিস্থ জীবাণুসমহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি :** মাটিতে অনেক জীবাণু আছে যা মাটিকে সুস্থ্য রাখতে সাহায্য করে তন্মেধ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এসব জীবাণু মাটি থেকে মাটির জৈব পদার্থ পচনে সাহায্য করে। ভালোভাবে fwg কর্ষণ করলে মাটিস্থ এই জীবাণুগুলোর কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায়। গাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে এবং ফলন অনেক ভালো হয়।

৬. **মাটির ক্ষয়রোধ :** fwg কর্ষণের আর একটি গুরুZcY উদ্দেশ্য হলো উঁচু-নিচু জমিকে সমতল করা এবং আঁটসাঁট করা। তাতে বৃষ্টির বা সেচের পানি গড়িয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। আর এতে একদিকে fwg¶q নিরোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুব্যবহার হয়।

জমি চাষের বিবেচ্য বিষয়:

জমি কীভাবে চাষ করতে হবে তা নির্ভর করে কতকগুলো বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো n‡"Q:

১. ফসলের প্রকার

২. মাটির প্রকার

৩. আবহাওয়া ও

৪. খামারের প্রকার ইত্যাদি।

১. **ফসলের প্রকার:** জমি চাষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কৃষক কী কী ফসল ফলাবেন। যেমন ধান চাষের জন্য কয়েকবার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি কর্দমাক্ত করতে হয়। সরগম এবং সিমিলেটের জন্য তেমন চাষের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মুলা, মরিচ, ইত্যাদির জন্য মাটি মিহি ঝুরঝুরা করে চাষ করতে হয়। আখ আলু চাষের জন্য গভীরভাবে জমি চাষ করতে হয়।

২. **মাটির প্রকার:** জমি চাষ মাটির প্রকারের উপর নির্ভর করে। কাদা মাটিতে বেশি আর্দ্রতা বা ভেজা থাকলে চাষ করা যায় না। মাটির জো আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

আবার হালকা মাটি যেমন দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে আর্দ্রতা একটু বেশি থাকলেও চাষ করা যায়। এই মাটিগুলো চাষের জন্য খুব ভালো।

৩. **আবহাওয়া:** আবহাওয়ার প্রভাবে মাটিতে আর্দ্রতার তারতম্য ঘটে। বৃষ্টি-বাদল কম হলে মাটিতে আর্দ্রতার অভাব ঘটে। এই অবস্থায় জমিতে গভীর চাষ দেওয়া অনুচিত। মাটিতে গভীর চাষ দিলে আর্দ্রতার প্রকট দেখা দিবে। আবার বর্ষকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে এবং রোপা আমন চাষের জন্য জামি c¯‘Z করা সহজ হয়।

৪. **খামাররের প্রকার:** বাড়ির আশে পাশের জমিতে নিবিড় শস্য চাষ করা হয়। নিবিড়ি শস্য চাষে একটা ফসল তুলেই আর একটা ফসল লাগানো হয়। তখন জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে না। জমির মাটি এমনিতেই আলগা থাকে। তবে অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জমি c¯‘wZi সময় কোনো বিশেষ ধাপ বাদ পড়লে ফলাফল কী হবে? সে m¤ú‡K লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভমিক্ষয় ও ক্ষয়রোধ

ভমিক্ষয়

মুষলধারায় বৃষ্টির সময় মাটির দিকে লক্ষ কর। দেখবে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যখন fcwZZ হয়, তখন বৃষ্টির আঘাতে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয় আর এতে পানি ঘোলা হয়। কাদামিশ্রিত ঘোলা পানি অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে বৃষ্টিপাতের সময় কাদামিশ্রিত ঘোলা পানির মাধ্যমে fwg¶q হয়। আবার ঝড়-বাতাস বা ঘুর্ণিঝড়ের দিকে লক্ষ কর। দেখবে বাতাসের বেগের সাথে মাটির কণা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে যায়। বাইরে থাকলে তোমার চোখে মুখেও মাটির কণাগুলো আঘাত করে। অর্থাৎ বাতাস দ্বারাও fwg¶q হয়। এখন হয়ত বলতে পারবে যে বিভিন্ন কারণে জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াকে fwg¶q বলে।

fwg¶q প্রক্রিয়ায় একস্থানের মাটির ক্ষয় হয় আর অপেক্ষাকৃত নিম্নতম স্থানে জমা হয়। fwg¶‡qi প্রধান কারণগুলো n‡"Q বৃষ্টিপাত, ঘুর্ণিবাত্যা, নদীর স্রোত, বনজঙ্গাল পরিষ্কার করে চাষাবাদ, পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ ইত্যাদি। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি মাটির উপরের ¯Í‡ii কিছু মৃত্তিকা কণা বহন করে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পানি প্রবাহের সাথে fwgi উপরি ¯Í‡ii মাটি আলগা হয় এবং wbgfwg‡Z গিয়ে জমা হয়। তেমনি কর্ষিত জমি হতে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেও ধুলার আকারে মাটি `iদূরান্তে চলে যায়। নদীর স্রোত নদী তীরের পাড় ভেঙে মাটি অন্যস্থানে বহন করে নিয়ে যায় ও PivÂj গড়ে তোলে। মানুষ যখন বন-জঙ্গাল কেটে পরিষ্কার করে ফসলের আবাদ করে তখন fwg উন্মুক্ত হয়। আর গবাদিপশুও বিচরণ করে। এতে fwgi ¶য় হয়। একইভাবে পাহাড়ের জঙ্গাল কেটে পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ করে। বৃষ্টিপাতাতের জলস্রোত উপরের ¯Í‡ii মাটি উপত্যকায় পরিণীত হয়।

ভমিক্ষয়ের প্রকার:

fwg¶q দুই প্রকার যথা: (১) প্রাকৃতিক fwg¶q ও (২) মানুষ্য কর্তৃক fwg¶q| নিচে এগুলোর আলোচনা করা হলো:

প্রাকৃতিক ভমিক্ষয়: fwg¶‡qi প্রাকৃতিক n¯Í‡c¶ ব্যাপক। f-সৃষ্টির শুরু থেকেই এর ক্ষয় শুরু হয়েছে। দীর্ঘকালের এই ক্ষয়ের ফলেই নদীর মোহনায় বা সমুদ্রে চর সৃষ্টি হয়েছে বা দ্বীপ গড়ে উঠেছে। এই fwg¶‡qi ফলে পৃথিবীর অনেক AÂj উর্বর হয়েছে আবার অনেক AÂj অনুর্বর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনবরত fwg¶q n‡"Q অথচ আমরা তা উপলব্ধি করি না।

চিত্র : প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলো চলার পথে f-পৃষ্ঠের মাটির কণা বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য যে পরিমাণ মাটির ক্ষয় হয় তা খুবই নগণ্য এবং দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয় না। হয়তো তাই fwgi এই ক্ষয়কে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় মাটি গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বলে বিবেচতি হয়। মাটি গঠন ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিয়ের ফলে কৃষিকাজ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

মানুষ কর্তৃক ভমিক্ষয়: মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানুষ মাটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আসছে কৃষি সভ্যতার mPbvjM থেকে। fwgKlY, পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ কৃষিকাজের gj অংশ। এ কাজগুলো দ্বারা মাটিকে প্রতিনিয়ত উৎপীড়ন করা হচ্ছে। ফলে fwg,‡jv প্রাকৃতিক শক্তির তথা বৃষ্টি ও বাতাসের নিকট উন্মোচিত করছে এবং ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে যত ব্যবহার করা হবে ততই এর ক্ষয় হতে থাকবে। অনাচ্ছাদিত মাটি বৃষ্টি, বায়ু, বন্যা, এগুলোর আক্রমণের শিকার। পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষের ফলে বা ধাপ করে চাষ করার ফলে মাটি আলগা হয়ে যায়। gljavivq বৃষ্টির ফলে সেখানকার মাটিতে পাহাড়ি ধস নামে। এতে বিপর্যয় আকারে fwgধস হয়। শুধু তাই নয়- এতে জান মালেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া গাবাদিপশু বিচরণকালে অনেক ধুলাবালি উড়ে যায়। মেঠোপথে চলার সময়ও ধুলাবালি উড়ে।

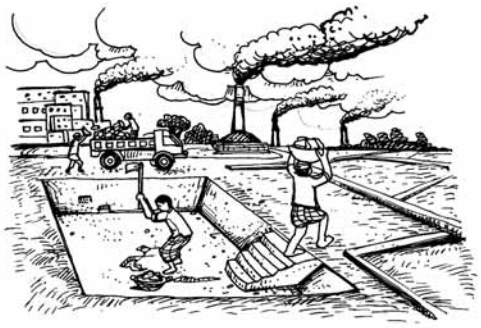

চিত্র : মানুষ কর্তৃক ভূমিক্ষয়

ভমিক্ষয়ের ক্ষতির বিভিন্ন দিক

fwg¶‡qi ক্ষতিকারক দিকগুলো নিমic:

(১) fwg¶‡qi কারণে জমির পুষ্টিসমৃদ্ধ উপরের ¯Í‡ii মাটি অন্যত্র চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতার ব্যাপক অপচয় হয়।

(২) fwg¶‡qi ফলে মাটিতে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ফসলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

(৩) ক্রমাগত fwg¶‡qi কারণে নদী-নালা, হাওর-বিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে দেশে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে ফসল, পশুপাখি, বাড়িঘর অনেক ক্ষতি হয়।

(৪) fwg¶‡qi বিরাট অংশ নদীতে জমা হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

(৫) প্রবাদ আছে যে উর্বর মাটির ক্ষয় মানে সভ্যতার ক্ষয়।

ভমিক্ষয়ের শ্রেণিবিভাগ

fwg¶q‡K প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

(১) বৃষ্টিপাতজনিত fwg¶q এবং

(২) evqcevnRwbZ fwg¶q

বৃষ্টিপাতজনিত ভমিক্ষয়: বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক fwg¶q হয়। এই fwg¶q‡K নিচের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়;

(১) Av¯ÍiY fwg¶q

(২) রিল fwg¶q

(৩) নালা বা গালি fwg¶q

(৪) নদী ভাঙন।

নিচে এই ভমিক্ষয়গুলোর আলোচনা করা হলো :

Av¯ÍiY **ভমিক্ষয় :** যখন বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি উঁচু স্থান থেকে ঢাল বেয়ে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন জমির উপরিভাগের নরম ও উর্বর মাটির কণা কেটে পাতলা আবরণের বা Av¯Íi‡Yi মতো চলে যায়। এইটাকেই বলা হয় Av¯ÍiY fwg¶q| বৃষ্টির ফলে যে fwg¶q হয় তা সহজে চোখে পড়েনা। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বোঝা যায় যে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। আর এর কারণ হলো Av¯ÍiY fwg¶q।

রিল ভমিক্ষয়: রিল ভুমিক্ষয় Av¯ÍiY fwg¶‡qiB দ্বিতীয় ধাপ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পানি বেশি হলে জমির ঢাল বরাবর লম্বাকৃতিয় রেখা সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা হাতের রেখার মতো। এই ছোট ছোট রেখা কালক্রমে দৈর্ঘ্য ও c‡¯' বড় হতে থাকে। বৃষ্টির পানির স্রোতধারা উর্বর মাটি জমি থেকে হারিয়ে যায় ফলে জমি উর্বরতা হারায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও অসুবিধার সৃষ্টি করে।

চিত্র : রিল ভূমিক্ষয়

নালা বা গালি ভমিক্ষয়: এই fwg¶q Av¯ÍiY fwg¶‡qi তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ রিল fwg¶q থেকেই নালা বা গালি fwg¶‡qi উদ্ভব। দীর্ঘকাল ধরে রিল fwg¶‡qi ফলে এর ছোট ছোট নালাগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ফসলের মাটিও বেশি ক্ষয় হতে থাকে। একসময় এগুলো নর্দমা বা ছোট নদীর মতো দেখায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে নালা বা গালি fwg¶q ততই বেশি হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য AÂ‡j এরূপ fwg¶q দেখা যায়।

নদীভাঙন: নদীভাঙন বাংলাদেশের fwg¶‡qi একটি উলেখযোগ্য কারণ। চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি AÂ‡j প্রতি বৎসরই নদীভাঙনে শত শত হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন n‡"Q| বর্ষার শুরুতে কিংবা বর্ষার শেষে নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নদীতীরের কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

চিত্র : নদী ভাঙন

বায়ু ভমিক্ষয়:

গতিশীল বায়ু প্রবাহ কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বাত্যাজনিত fwg¶q বলে। যেসব এলাকা সমতল, Zjbvgj Kfv‡e গাছপালা কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম, সেসব এলাকায় বাত্যাজনিত কারণে fwg¶‡qi প্রকোপ দেখা যায়। বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটি আলগা ও হালকা। কাজেই প্রবল বেগে বায়ুবাহিত হলে এসব মাটি সহজেই উড়ে যায়। আর যে স্থানে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সে স্থানের বাত্যাজানিত fwg¶q আরও বেশি।

মরুভমিতে বায়ুপ্রবাহ উর্বর AÂ‡j বালি নিক্ষেপ করে অনুর্বর করে তোলে। বাংলাদেশের DËivÂ‡j দিনাজপুর - রাজশাহী AÂ‡j চৈত্র - বৈশাখ মাসে বায়ুজনিত fwg¶‡qi প্রকোপ সামান্য দেখা যায়। এর ফলে বায়ু প্রবাহে আবাদি জমির উর্বরতা কমে যায়।

ভমিক্ষয়ের কারণ:

অনেক কারণেই fwg¶q হয়। উপরের fwg¶‡qi প্রকার থেকেও অনুধাবন করা যায় fwg¶‡qi কারণ কী কী। নিচে fwg¶‡qi কারণগুলো উলেখ করা হলো।

(১) বৃষ্টিপাত
(২) fwg ঢাল
(৩) মাটির প্রকৃতি
(৪) শস্যের প্রকৃতি
(৫) জমি চাষের পদ্ধতি
(৬) নিবিড় চাষ
(৭) বায়ু
(৮) মানুষের কার্যাবলি।

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিপাত চাষাবাদের জন্য যেমন ভালো আবার fwg¶‡qi প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সংখ্যা ও পরিমাণ fwg¶q‡K প্রভাবিত করে। মুষলধারায় বৃষ্টি হলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় এবং মাটিতে সজোরে আঘাত করে আর এতে মাটির কণা আলগা হয়। মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পনি একটি প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। যাওয়ার পথে পানির সঙ্গে আলগা ও নরম মাটি স্থানান্তরিত হয়। পনির বেগ যত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হবে।

ভমির ঢাল: অধিক ঢালু মাটিতে অধিক বেগে পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য পার্বত্য এলাকায় সমতল এলাকার চেয়ে fwg¶‡qi পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় সাধারণত জুম চাষ করা হয়। ফলে জুম চাষ এলাকার মাটি আলগা হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই মাটি বৃষ্টির পানির সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে চলে যায়। কয়েক বছসরের মধ্যে জুম চাষের স্থানটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

মাটির প্রকৃতি: fwg¶q মাটির কাঠামো, বুনট ও জৈব পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। বেলে-দোআঁশ মাটি অধিক mw"Qদ্রতা বলে m¤úb বৃষ্টির পানি সহজেই শুষে নিতে পারে। তাই এই মাটির fwg¶q কম। কিন্তু কাদা ও ভারী মাটি mw"Q`Zv কম থাকায় এর শোষণক্ষমতাও কম। তাই সামান্য বৃষ্টি হলেও মাটির উপরে পানি জমে যায় এবং fwgi ¶য় করে মাটিসহ নিচের দিকে ধাবিত হয়।

চাষ পদ্ধতি ও শস্যের প্রকৃতি: পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে যদি ঢালের বরাবর চাষ করা হয়, তবে বৃষ্টিপাতের ফলে fwg¶q হয়। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ সৃষ্টি করে ফসলের চাষ করা হয়। কিন্তু যদি তা না করে সাধারণভাবে জমি চাষের চেষ্টা করা হয় তবে পাহাড়টি fwgam বা fwg¶‡qi শিকার হয়। জমি ঘন ঘন চাষ করলেও fwg¶q হয়।

যেসব ফসল মাটি ঢেকে রাখে, সেগুলো মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন চিনাবাদম, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি। কিন্তু আখ, ভুট্টা, ধান, গম ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে মাটিকে ঢেকে রাখেনা। ফলে fwg¶q হয়।

বায়ু প্রবাহ: যে AÂ‡j গাছপালা কম সে AÂ‡j বায়ুপ্রবাহ দ্বরা fwg¶q হয়। বাংলাদেশের রাজশাহীও দিনাজপুর AÂ‡j এরূপ fwg¶q হয়।

মানুষের কার্যাবলি: fwg¶‡qi প্রকৃত কারণ মানুষ নিজে। ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। তাতে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত হয় এবং fwg¶‡qil mPbv হয়। তাছাড়া মানুষ ঘরবাড়ি, iv¯ÍvNvU ইত্যাদি নির্মাণ করেও কৃষিজমি বিনষ্ট করছে এবং fwg¶q করছে।

ভমিক্ষয়ের কার্যকরী উপায়সমুহ

fwg¶q‡iva করা কৃষিকাজের অন্যতম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি fwg¶q †iv‡ai কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি। পদ্ধতিগুলো n‡"Q-

পানিপ্রবাহ হ্রাসকরণ:

১) fwg¶q কমাতে পানি প্রবাহের বেগ কমানো জরুরি। বিভিন্নভাবে পানি প্রবাহের বেগ কমানো যায়। যথা, বাঁধ বা আল দিলে পানির বেগ কমে আসে, মাটি পানি শোষণের সময় পায় ও fwg¶q রোধ হয়।

২) রিল fwg¶‡qi ফলে যে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয় তা ভরাট করে সমান করে দিলে পানির বেগ কমে যাবে এবং fwg¶q ও রোধ হবে।

৩) বড় নালার মধ্যে আগাছা জন্মাতে দেওয়া এবং শেষ প্রান্তে খুঁটি পুতে তারের জাল বাঁধলে পানির বেগ কমে যাবে।

৪) উপরন্ত তারের জালের g‡j খড়কুটা ফেললে পানির বেগ একেবারেই gš'i হবে এবং fwg¶q রোধ হবে।

পানি নিষ্কাশনের me‡›`ve¯ÍKiY:

জমিতে পানি জমা থাকলে এর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হলে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং জমির মাটি আলগা হয়ে অন্যত্র চলে যায়। কাজেই কৃষিজমি কয়েক খণ্ডে ভাগ করে প্রতি খণ্ড হতে পানি সরালে fwgi এরূপ ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হবে।

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ:

জমিতে জৈব পদার্থ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে মাটির দানাবন্ধন ভালো হয়। বৃষ্টির পানি মাটিকে ক্ষয় না করে সহজেই নিচের দিকে চলে যেতে পারে। যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমির মাটি সহজেই ক্ষয় হয়।

পাহাড়ে ধাপে ধাপে ফসল চাষ করা:

জুম চাষের ফলে পাহাড়ের মাটি সহজেই আলগা হয় ও fwg¶য় হয়। জুম চাষ না করে যদি পাহাড়ের গায়ে চতুর্দিক ঘিরে সমতল সিঁড়ি বা ধাপ করে চাষাবাদ করা হয় তা হলে বৃষ্টির পানি পাহাড়ের মাটির ক্ষয় করতে পারবেন।

কন্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা:

এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি সমন্বিত লাইনে জমি চাষ করা হয়। ঢালের আড়াআড়ি জমি চাষ হয় বলে বৃষ্টির পানির গতি কম হয়। মাটি স্থানান্তরিত না হয়ে ফসলের গোড়ায় আটকে থাকে।

কাজ

১. শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় কৃষিজমি ক্ষয়রোধের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় m¤ú‡K প্রতিবেদন লিখবে।

২. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে fwg¶q †iv‡a m‡PZbZvgjK পোস্টার লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীজ সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

বীজ উৎপাদন থেকেই বীজ সংরক্ষণের শুরু। জমিতে এর বপন বা রোপণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ। তাহলে দেখা hv‡"Q বীজ সংরক্ষণ বলতে বীজের উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন যাবতীয় কাজ সুষ্ঠভাবে m¤úb করাকেই বোঝায়।

বীজ সংরক্ষণের শর্তসমহ

বীজ উৎপাদন:

বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার:

১) কেবল বীজের জন্যই ফসলের চাষ করা;

২) নির্বাচিত জমিতে আশপাশের জমিতে নির্দিষ্ট বীজ ফসলের আবাদ না করা;

৩) বীজ উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ করা;

৪) বীজের চারা বৃদ্ধিকালে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলা;

৫) বীজের ক্ষেত ঘন ঘন পরিদর্শন করা যাতে (১) আগাছা দমন (২) ভিন্ন জাতের গাছ তেলা ও (৩) রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব ইত্যাদি m¤ú‡K সঠিক ব্যবস্থা নেয়া যায়;

৬) ফসলের পরিপক্বতার দিকে দৃষ্টি রাখা;

৭) পরিষ্কার cwi"Qbfv‡e ফসল কাটা, মাড়াই করা ও ঝাড়া।

বীজ শুকানো:

বীজকে দীর্ঘায়ু দান ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজকে শুকানো প্রয়োজন। বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়াতে বীজ শুকানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের আর্দ্রতা একটি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রায় আনার জন্যই বীজ শুকানো হয়। ক্ষেত থেকে যখন ফসল কাটা হয় তখন এর আর্দ্রতা থাকে ১৮% থেকে ৪০% পর্যন্ত। এই আর্দ্রতা বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলে। তাই বীজকে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের নিমিত্তে বীজের আর্দ্রতাকে ১২% বা তার নিচে নামিয়ে আনা আবশ্যক। আর এ জন্যই বীজ শুকানোর প্রয়োজন হয়।

বীজ শুকানোর পদ্ধতি:

বীজ শুকানো দুই প্রকার। যথা: (১) ক) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বাতাসে শুকানো খ) স্বাভাবিক বাতাস প্রবেশ করিয়ে শুকানো এবং (২) উত্তপ্ত বাতাস বীজ পাত্রে প্রবেশ করিয়ে শুকানো

বীজের চারিপার্শ্বস্থ বাতাসের আর্দ্রতা যদি বীজের আর্দ্রতা থেকে বেশি হয় তবে বাতাস থেকে আর্দ্রতা বীজের মধ্যে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বীজ ও বাতাসের আর্দ্রতা সমান হয়। বীজের আর্দ্রতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখতে হলে চারিপার্শ্বস্থ বাতাসকে শুকনো রাখা প্রয়োজন।

বীজ শুকানোর সময় নির্ভর করে (১) বীজের আর্দ্রতার মাত্রা কেমন? (২) বাতাসের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মাত্রা কেমন? (৩) বাতাসের গতি কিরূপ? এবং (৪) বীজের পরিমাণের উপর।

মনে রাখতে হবে যে, (১) বেশি তাপমাত্রায় বীজ শুকালে ev‡Ri mgn ¶তি হয়। যেমন- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। (২) অপর্যাপ্ত তাপে বীজ শুকালেও একই রকম ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পরিমিত তাপে দক্ষতার সাথে বীজ শুকালে

- m‡ev"P মানের বীজ পাওয়া যায়।
- বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজের ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ:

ফসল কাটার পর ফসলের দানাকে বীজে পরিণত করা এবং পরবর্তী বপনের ce পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বপ্রকার পরিচর্যাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। বীজ শুকিয়ে মান ও আকার অনুযায়ী ভাগ করা এবং সর্বশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুতcY কার্যকলাপ।

বীজকে সুষ্ঠভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে যে সুফল পাওয়া যায়

১) বীজের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়;

২) বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়;

৩) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ:

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কৃষিতাত্ত্বিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন হয়েছে কি না, সঠিকভাবে ফসল কর্তন, মাড়াই ও ঝাড়াই হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে বীজ শুকিয়ে নির্দিষ্ট আর্দ্রতার আনা হয়েছে কি না এসব বীজের মান নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলি। প্রতিটি কাজেই বীজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা জরুরি:

একটি বীজের নমুনার মধ্যে (১) বিশুদ্ধ বীজ (২) ঘাসের বীজ (৩) অন্যান্য শস্যের বীজ ও (৪) পাথর থাকে। এই চারটি ভাগের মধ্যে বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হার বের করাই বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।

বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা:

নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গজায় তা বের করাই বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা। যখন বীজের আর্দ্রতা ৩৫ - ৬০% বা তার উপর হয় তখন অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। এর হার শতকরায় প্রাকশ করা হয়। ১০০ টি বীজ গুণে একটি বেলে gwUcY মাটির পাত্রে রেখে বা পানি দ্বারা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে পানি যেন শুকিয়ে না যায়। নির্ধারিত সময় পরে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হবে। যতটি বীজ গজাবে ততটি হবে বীজের অঙ্কুরোদগম হার।

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা :

বীজ থেকে আর্দ্রতা বের করে দিয়ে তাতে কতটুকু আর্দ্রতা আছে তা জানার পদ্ধতিকে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা বলা হয়। তা শতকরা হারে নিম্নোক্ত mÎ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$mÎ: \quad \frac{\text{নমুনা বীজের ওজন - নমুনা বীজ শুকানোর পর ওজন}}{\text{নমুনা বীজর ওজন}} \times ১০০$$

বীজের জীবনীশক্তি পরীক্ষা:

এই পরীক্ষার জন্য বীজ গজানোর একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই cwZKj Ae¯'vq যে বীজ বেশি গজাবে সে বীজেরই জীবনীশক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হবে।

বীজ বিপণন: বীজ বিপণন বীজ প্রযুক্তির একটি উলেখযোগ্য অংশ। বীজ বিপণন বলতে বীজ সংগ্রহ, প্যাকেজ করা, wewµce সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিক্রি এসব কাজকে এক কথায় বিপণন বলে। বীজ বিপণনকালে ক্রেতাদের নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে:

১) বীজের জাত নির্ধারণ
২) বীজের পরিমাণ নির্ধারণ
৩) বীজ অনুমোদনপ্রাপ্ত বা প্রত্যায়িত কি না
৪) বীজের অঙ্কুরোদগমের হার
৫) বীজের বিশুদ্ধতার হার
৬) বীজের আর্দ্রতা
৭) বীজের জীবনকাল
৮) বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার নাম
৯) বীজ অনুমোদন সংস্থার নাম
১০) বীজ বপনের পদ্ধতি
১১) সংরক্ষণের নির্দেশ
১২) বীজের gj¨

বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব:

বীজ ভীষণ AbfwZপ্রবণ। একটু অসর্তকতার জন্য বিপুল পরিমাণে বীজ নষ্ট হয়। কৃষকেরা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বীজ সংরক্ষণ করেন। একটাই উদ্দেশ্য সামনের মৌসুমে যাতে সুস্থসবল বীজ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তবুও কীভাবে বীজের জীবনীশক্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই। বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ফসল বাছাই মাড়াই ও পরিবহনকালেই বীজ নষ্ট হয় বেশি। ইঁদুর, পাখি, ছত্রাক, আর্দ্রতা ইত্যাদির কারণে প্রায় দশ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বীজের সাথে ধুলাবালি, নুড়ি পাথরও বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে।

বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণগতমান রক্ষা করা এবং যেসব বিষয় বীজকে ক্ষতি করতে পারে সেগুলো m¤ú‡K সতর্ক হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি:

বাংলাদেশে বীজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আছে। এক এক ফসলের বীজের জন্য এক এক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন দানাজাতীয় শস্য- ধান, গম, ভুট্টা, বীজের জন্য ধানগোলা, ডোল মাটির পাত্র, চটের ছালা, পলিব্যাগ ও বেড ব্যবহার করা হয়। নিম্নে ফসল সংরক্ষণের পদ্ধতি m¤ú‡K আলোচনা করা হলো।

বীজ শুকানো ও চটের e¯Ívq সংরক্ষণ:

বীজ শুকানো অর্থ n‡"Q বীজ থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সরানো এবং পরিমিত মাত্রায় আনা। আর্দ্রতার মাত্র ১২ - ১৩% হলে ভালো হয়। বাংলাদেশে বীজ শুকানো হয় রোদে বা mhZv‡c| এই আর্দ্রতা ১২ - ১৩ শতাংশ নামাতে বীজগুলোকে প্রায় তিনদিন প্রখর রোদে শুকাতে হয়। ঠিকমতো শুকিয়েছে কিনা তা তারা বীজে কামড় দিয়ে পরখ করতে হবে। বীজে কামড় দেওয়ার পর যদি 'কট' করে আওয়াজ হয় তবে মনে করতে হবে বীজ ভালোমতো শুকিয়েছে। অতঃপর বীজগুলোকে চটের ছালায় e¯Ívew»` করা হয় এবং গোলা ঘরে রাখা হয়। বীজ পোকার উপদ্রব থেকে রার জন্য বীজের e¯Ívq নিমের পাতা, নিমের শিকড়, আপেল বীজের গুঁড়া, বিশকাটালি ইত্যাদি মেশানো হয়।

ধান গোলায় সংরক্ষণ:

ধান সংরক্ষণের জন্য ধানের গোলা ব্যবহার হয়ে থাকে। ধান গোলার আয়তন বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করা হয়। বীজ রাখার আগে ধান গোলার ভিতরে ও বাইরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করতে হবে। বীজগুলো এমনভাবে ভরতে হবে যেন এর ভিতর কোনো বাতাস না থাকে। সেই জন্য ধানগোলার মুখ বন্ধ করে এর উপর গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

ডোলে সংরক্ষণ:

ডোল আকারে ধান গোলার চেয়ে ছোট। ডোল ধানগোলার চেয়ে কম ধারণ ক্ষমতা m¤úb বীজ পাত্র। এটি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে তৈরি করা হয়। ধানগোলার মতোই ডোলের বাইরে ও ভিতরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করা হয়।

চিত্র : ডোলে বীজ সংরক্ষণ

পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ

আজকাল পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতা m¤úb পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এই ব্যাগ আর ডি আর এস কর্তৃক উদ্ভাবিত। সাধারণ পলিথিনের চেয়ে বীজ রাখার পলিথিন অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। শুকনো বীজ এমনভাবে পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে এবং ব্যাগে থেকে m¤úY বাতাস বেরিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাগের মুখ তাপের সাহায্যে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইর থেকে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ না থাকে।

মটকায় সংরক্ষণ:

মটকা মাটিনির্মিত একটি গোলাকার পাত্র। গ্রাম বাংলায় এটি বহুল পরিচিত। অনেক পুরুত্ব দিয়ে এটি তৈরি করা হয় যাতে টোকা লাগলেই ভেঙে না যায়। মটকার বাইরে মাটি বা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলা ঘরের মাচার নির্দিষ্ট স্থানে মটকা রেখে এর ভিতর শুকনো বীজ পুরোপুরি ভর্তি করা হয়। অতঃপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে উপরে প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করা হয়।

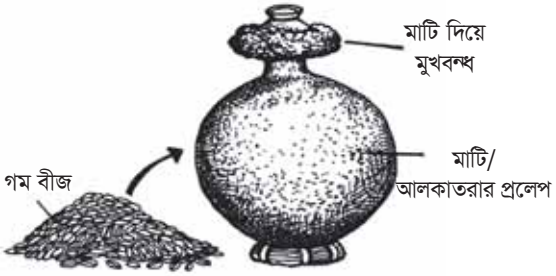

চিত্র : মাটির কলসে বীজ সংরক্ষণ

বাড়ির কাজ:

শিক্ষার্থীরা মাটির কলসে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে সে পদ্ধতি m¤ú‡K একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে জমা দিবে এবং উপস্থাপন করবে।

cÂg পরিচ্ছেদ

খাদ্য সংরক্ষণ

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছ চাষকে লাভজনক করতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে দেওয়া m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে যা খরচ হয় তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় করতে। m¤úiK খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে সচরাচর যে উপাদান গুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো-চালের কুঁড়া, গমের ভুসি,

সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু-ছাগলের রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ি, জলজ উদ্ভিদ যেমন-কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রয়োজনমতো মিশ্রিত করে চাষিরা মৎস্য খাদ্য তৈরি করে। কারখানায় তৈরি বাণিজ্যিক খাদ্যও মৎস্য খামারে ব্যবহার করা যায়। যে ধরনের খাদ্যই মাছ চাষের পুকুরে ব্যবহার করা হোক না কেন তার গুণগতমান ভালো হওয়া আবশ্যক। খাবারের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্থসবল পোনা ও মাছ হবে না, মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হবে এবং মাছের মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যাবে। আবার মাছের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হবে না। খাদ্যের গুণগতমান ভালো রাখার জন্য যথাযথ নিয়মে খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ অত্যন্ত গুরুতcY বিষয়। নিম্নলিখিত wbqvgKmgn খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং ওজনকে ¶wZM¯Í করে-

১. **খাদ্যের আর্দ্রতা:** খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।

২. **বাতাসের আপেক্ষিক আদ্রতা:** বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।

৩. **তাপমাত্রা:** অতিরিক্ত তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট হয়। †cvKv-gvKomgn ২৬-৩০° সে: তাপমাত্রায় খুব ভালো জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ফেলে ও তাদের gjgÎ দ্বারা ব্যাকটোরিয়া ছড়াতে পারে।

৪. **সর্যালোক:** mhv‡jv‡K খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে m‡hi অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

৫. **অক্সিজেন :** খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেন্সিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) ঘটাতে পারে যা খাদ্যের গুণগতমানকে ¶wZM¯Í করে । অক্সিজেন ছত্রাক ও পোকা-মাকড় জন্মাতেও সহায়তা করে।

সঠিক খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

ক) শুকনো খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

১) খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোনো মুখ বন্ধ পাত্রে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে এই খাদ্য পুনরায় রোদে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়।

২) খাদ্য পরিষ্কার, শুকনো, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।

৩) গুদাম ঘরে সংরক্ষিত খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সে.মি. উপরে কাঠের পাটাতনে রাখতে হবে।

৪) পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের e¯ÍvI নিচে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৫) খাদ্য তিন মাসের বেশি গুদামে রাখা যাবে না। এর মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলা উচিত।

৬) ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর উপদ্রবমুক্ত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৭) খাদ্য কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সাথে রাখা যাবে না।

খ) আর্দ্র/ভেজা খাদ্য উপাদান

১) খাদ্য তৈরির জন্য তাজা ছোট মাছ হলে তাৎক্ষণিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

২) তৈলাক্ত/চর্বিযুক্ত খাদ্য কালো রঙের বা অস্ব"Q পাত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।

৩) ভিটামিন ও খনিজ jeYmgn বাতাস এবং আলোকবিহীন পাত্রে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

কাজ :

শিক্ষার্থীরা খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করবে এবং পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ: রেনসিডিটি।

পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কোনো খাদ্যের গুণাগুণ ও পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। আবার তৈরি করা পশুখাদ্যের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখার জন্যও গুদামজাত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদিপশুর খাদ্যের বেশির ভাগ কৃষি শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়াই বা শস্যদানা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে অনেক ঘাস উৎপাদিত হওয়ায় তা গবাদিপশুকে খাওয়ানোর পরও অতিরিক্ত থেকে যায়। আবার শীতকালেও অতিরিক্ত শিম গোত্রীয় ঘাস উৎপাদন হয়। তাই এই অতিরিক্ত ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যখন ঘাসের অভাব হয় তখন এই সংরক্ষিত ঘাস গবাদিপশুকে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য n‡"Q খাদ্যকে রোগজীবাণু ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। পশুপাখির দানাদার খাদ্যকে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করে বেশি দিন গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্যের আর্দ্রতা বেশি হলে এতে ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক জন্মানো খাদ্য পশুপাখিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেক সময় পশু অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের বিভিন্ন ধাপসমহ

ক) হে তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হে তৈরি m¤ú‡K আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে হে তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন, সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

২। ফুল আসার সময় ঘাস কাটতে হয়।

৩। ঘাস রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে রাখা হয়।

৪। ঘাস শুকিয়ে মাচার উপর ¯‘cvKv‡i বা চালাযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

খ) সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইলেজ তৈরি m¤ú‡K আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে সাইলেজ তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা, নেপিয়ার, গিনি ঘাস বেশি উপযোগী।

২। ফুল আসার সময় রসাল অবস্থায় ঘাস কাটতে হয়।

৩। ঘাস কেটে বায়ুনিরোধক স্থানে বা সাইলো পিটে রাখা হয়।

৪। সাইলো পিটে ঘাস রাখার সময় ঝোলাগুড়ের দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হয়।

৫। তারপর বায়ু চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

চিত্র : সাইলেজ তৈরির জন্য ভুট্টা কাটার উপযুক্ত অবস্থা

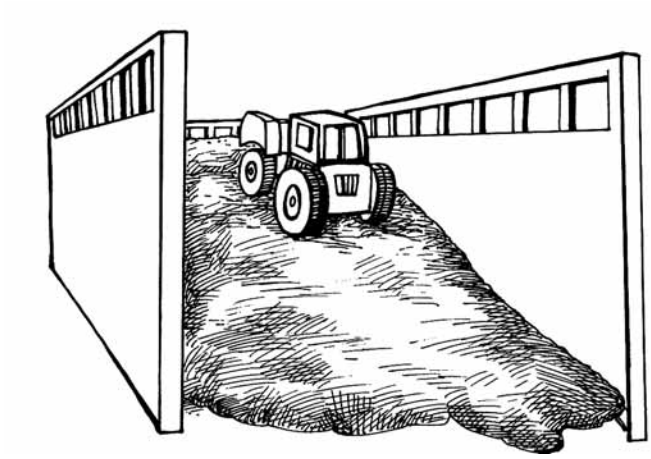

চিত্র : সাইলো পিটে সবুজ ঘাস cwicY করা n‡"Q

গ) খড় তৈরির মাধ্যমে ফসলের বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে বেশিরভাগ কৃষক পরিবারে গরুর জন্য খাদ্য হিসেবে খড় ব্যবহার করা হয়। গরুকে দৈনিক ৩-৪ কেজি শুকনো খড় দেওয়া হয়। এটি আঁশজাতীয় খাদ্য। নিম্নে খড় তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। শস্যগাছ (ধান, ভুট্টা, খেসারি ইত্যাদি গাছ) ক্ষেত থেকে কাটার পর সেগুলো মাড়াই করে শস্যদানা আলাদা করে ফেলা হয়।

২। বর্জ্য গাছগুলো রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে এনে খড় তৈরি করা হয়।

৩। খড় সাধারণত গাদা করে রাখা হয়।

ঘ) দানাশস্য ও তৈলবীজের উপজাত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ধান, গম, ভুট্টা, খেসারি, কলাই ইত্যাদি দানাশস্যের DcRvZmgn যেমন, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের খোসা, খৈল ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়।

ঙ) কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, পোল্ট্রির জন্য দানাদার খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করে মেশ, পিলেট ও ক্রাম্বল ফিড তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাছের m¤úiK খাদ্য

মাছের m¤úiK খাদ্যের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

দেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ফাইটোপাংকটন (উদ্ভিদকণা), জু-পাংকটন (প্রাণীকণা) ক্ষুদেপানা, ছোট জলজ পতঙ্গ, পুকুরের তলদেশের কীট, লার্ভা, কেঁচো, ছোট ছোট শামুক, ঝিনুক, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরে অধিক ঘনত্বে পোনা ছাড়া হয়। এ অবস্থায় শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করলেও তা যথেষ্ট হয় না। এজন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাহির থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। একে m¤úiK খাদ্য বলে। যেমন-চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশ মিল ইত্যাদি। গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এদের জন্য ক্ষুদিপানা, কুটি পানা, শাকসবজির নরম পাতা, ঘাস কেটে m¤úiK খাবার হিসাবে পুকুরে দেওয়া যায়। মাছকে সরবরাহকৃত m¤úiK খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-আমিষ, স্নেহ বা তেল, শর্করা, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের মাত্রা যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে m¤úiK খাবার এ সকল পুষ্টি উপাদান যথাযথ মাত্রায় রেখে তৈরি করা হয় তাকে সুষম m¤úiK খাদ্য বলে।

মাছের m¤úiK খাদ্যের উৎস

মাছের m¤úiK খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসের উপর ভিত্তি করে এসব উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) উদ্ভিদজাত খ) প্রাণিজাত। নিচে এদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক) উদ্ভিদজাত: উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু উলেখযোগ্য উপাদান n‡"Q- চালের কুঁড়া, গম ও ডালের মিহিভুসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, আটা, চিড়াগুড়, খুদিপানা, রান্না ঘরের D‡"Qó, বিভিন্ন নরম পাতা যেমন- মিষ্টিকুমড়া, কলাপাতা, বাঁধা কপি ইত্যাদি।

খ) প্রাণিজাত: প্রাণিজাত কয়েকটি খাদ্য উপাদান n‡"Q শুটকি মাছের গুঁড়া বা ফিশমিল, রেশম কীট মিল, চিংড়ির গুঁড়া (wm¤ú মিল), কাকড়ার গুঁড়া, হাঁড়ের PY (বোন মিল), শামুকের মাংস, গবাদিপশুর রক্ত (বাড মিল) ইত্যাদি।

m¤úiK খাদ্যের উপকারিতা

১. মাছকে নিয়মিত m¤úiK খাবার সরবরাহ করলে অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ চাষ করা যায়।
২. অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থসবল পোনা উৎপাদন করা যায়।
৩. পোনার বাঁচার হার বেড়ে যায়।
৪. মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।
৬. মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।
৭. সর্বোপরি কম সময়ে জলাশয় থেকে অধিক মাছ ও আর্থিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সহজলভ্য কয়েকটি খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করবে এবং উপাদানের নাম খাতায় লিখবে।

মাছের পুষ্টি চাহিদা ও m¤úiK খাদ্য তালিকা

মাছের প্রজাতি, বয়স ও আকারের উপর ভিত্তি করে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিভিন্ন হয়। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেনু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙ্গুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। সুস্থ-সবল মাছ ও এর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাবারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যক। এসব উপাদানের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন গুরুত্বcY ও ব্যয়বহুল। এটি খাবারে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা বলতে প্রধানত আমিষের চাহিদাকে বোঝায়। মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন- শর্করা, তেল ও খনিজ লবণ কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। এসব খাদ্যে আমিষের চাহিদা ciY হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। খাদ্যে আমিষের এই চাহিদা প্রজাতি ও জীবনচক্রের বিভিন্ন ¯Íi ভেদে কার্প বা রুই জাতীয় মাছের জন্য ৩০-৪০%, চিংড়ির জন্য ৩০-৪৫ % ও ক্যাটফিশ (আঁশ বিহীন লম্বা শুঁড়যুক্ত মাছ) বা মাগুর জাতীয় মাছের জন্য ৩৫-৪৫% থাকে।

একটি পুকুরে m¤úiK খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে যখন মাছ উৎপাদন করা হয় তখন ঐ খাদ্য কী পরিমাণ মাছ দ্বারা ব্যবহৃত n‡"Q (gvQ Lv‡"Q) এবং তা থেকে কি পরিমাণ মাছ উৎপাদন n‡"Q তা খাদ্য রূপান্তর হার বা এফ. সি. আর (Food conversion ratio, FCR) নির্ণয়ের মাধ্যমে হিসাব করা যায়। এভাবে একাধিক খাদ্যের FCR নির্নয় করে তুলনা করলে কোন খাদ্য অধিক ভালো তা বোঝা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খাদ্য রূপান্তর হার বা এফ সি আর n‡"Q খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অথাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাই খাদ্য রূপান্তর হার।

$$\text{FCR} = \frac{\text{মাছকে প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মুজুদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হলো যার মোট ওজন ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণের সময় মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল। এ ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হলো ।

সুতরাং, $\text{FCR} = \frac{২১}{১৫ - ১} = ১.৫$

FCR-এর মান সবসময় ১ এর চেয়ে বড় হয়। যে খাদ্যের FCR এর মান যত কম সে খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো অর্থাৎ, সে খাদ্য ব্যবহার করে অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়।

নিচে কার্প বা রুইজাতীয় মাছের সুষম m¤úiK খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মিশ্রণের তালিকা দেওয়া হলো-

বিভিন্ন খাদ্য উপদানে মিশ্রণের তালিকা

খাদ্য উপাদানের নাম	মিশ্র চাষের খাদ্য		নার্সারি খাদ্য বা পোনা মাছের খাদ্য	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিশমিল	১০.০	৪.২	২১.০	১২.১
সরিষার খৈল	৫৩.০	৬.৩	৪৫.০	১৩.৭
চালের কুঁড়া	৩০.৫	৯.২	২৮.০	৩.৩
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	০.৫	-	১.০	-
চিটাগুড়	৬.০	০.৩	-	-
আটা	-	-	৫.০	০.৯
মোট	১০০.০	২০.০	১০০.০	৩০.০

** মিশ্র চাষের জন্য FCR ২.০ ** পোনা মাছের খাদ্যের FCR ১.৫

মাছের m¤úiK খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে ভালো মান m¤úb নির্ধারিত খাদ্য Dcv`vbmgn সংগ্রহ করতে হবে। Dcv`vbmgn প্রয়োজনে আটা পেষা মেশিনে বা ঢেঁকিতে ভালো করে PY বা গুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। mÎ অনুযায়ী খাদ্য Dcv`vbmgn একটি একটি করে মেপে নিয়ে মিক্সার মেশিনে বা একটি বড় পাত্রে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো উপাদানগুলোতে পানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে। এখন মণ্ড ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে ভেজা বা আর্দ্র খাদ্য হিসাবে মাছকে দিতে হবে। মাছকে সরবরাহকৃত খাবার পানিতে বেশি স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসাবে আটা বা ময়দা বা চিটাগুড় ব্যবহার করা যায়। ভেজা বা আর্দ্র খাবার প্রতিদিন প্রয়োগের c‡e পরিমাণমতো তৈরি করতে হবে।

আবার এই মণ্ড দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্প g‡j¨ দেশীয় পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিলেট বা দানাদার খাবার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বায়ুরোধী প্লাস্টিক ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে। খৈলে কিছু বিষাক্ত উপাদান থাকে, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই খৈল একদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হয়। খৈল ভেজানো পানি মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য নির্বাচিত খাদ্য উপাদানের সাথে ০.৫-১% ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়।

মাছের m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

১. মাছ দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ করে। এজন্য চাষের পুকুরে দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে দিতে হবে। অন্যদিকে চিংড়ি নৈশভেজী বলে এদেরকে সন্ধ্যায় বা রাতে খাবার দিতে হয়।

২. প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেণু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙ্গুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে mvúiK খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ বার এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিন বা মাসে ১ বার জাল টেনে কয়েকটি মাছের গড় ওজন নিয়ে পুকুরে সর্বমোট যতটি মাছ ছাড়া হয়েছিল তা দিয়ে গুণ করলে পুকুরে মোট মাছের ওজন পাওয়া যাবে। এভাবে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।

৩. পুকুরে গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি চাষ করা হলে এদেরকে ক্ষুদিপানা, কুটিপানা, সবুজ ঘাস, †n‡jÂv, কচুরিপানার নরম অংশ ও বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা যেমন-বাঁধাকপি, পুঁইশাক, কলাপাতা কেটে পুকুরে সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাঁশের টুকরা বা গাছের ডালদিয়ে বর্গাকারের একটি ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ফ্রেমটি একটি খুঁটির সাহায্যে পুকুরের পানিতে স্থাপন করতে হবে যেন এটি সবসময় একই স্থানে থাকে। এই ফিডিং ফ্রেম বা রিং-এ উপরোক্ত খাদ্য দিতে হবে। মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করতে হবে।

৪. শুকনো খাবার পানির উপরে ছিটিয়ে এবং আর্দ্র বা ভেজা খাবার পানির ৩০-৬০ সে.মি নিচে স্থাপিত খাদ্য দানি, ট্রে বা মাচায় প্রয়োগ করতে হবে। এতে খাদ্যের অপচয় কম হবে।

৫. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের চারপাশে ৩-৪ টি নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিতে হবে। এতে করে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

৬. শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় বলে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ কমিয়ে আনতে হয়।

৭. পুকুর অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

৮. খাদ্য প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পর খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।

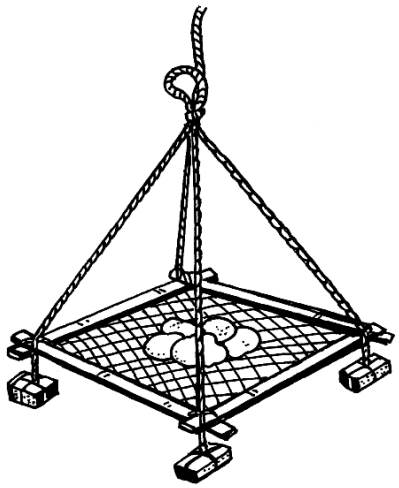

চিত্র: খাদ্যদানি বা ট্রে

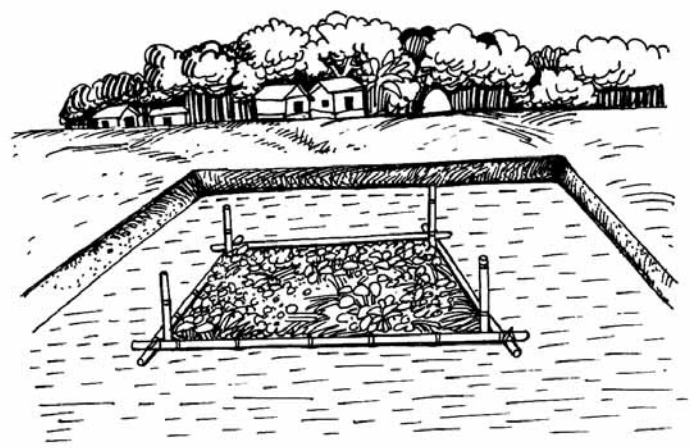

চিত্র: ফিডিং ফ্রেম/ রিং

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ যে কোনো মৎস্য খামারে গিয়ে মাছের m¤úiK খাদ্য তৈরি করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি দেখবে। এর উপর প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

নতুন শব্দ: বল্ড মিল, বোন মিল, wm¤ú মিল, ফিডিং ফ্রেম/রিং, খাদ্যদানি, খাদ্যরূপান্তর হার (FCR)

পশুপাখির m¤úiK খাদ্য

পশুপাখির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এদেরকে প্রচলিত খাবারের সাথে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং পশু পরিপুষ্টি লাভ করে। পশুপাখির মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই পশুপাখি পালনে m¤úiK খাদ্যের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।

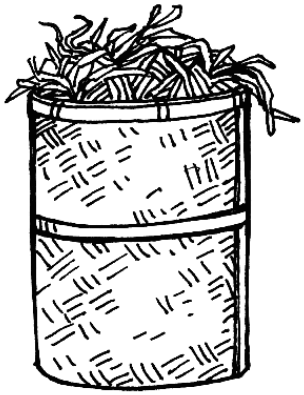

চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি দ্বারা সিক্ত খড়

চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি খড়ে মেশানো n‡"Q

বিভিন্ন m¤úiK খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-

ক) ইউরিয়া মোলাসেস খড় : ইউরিয়ার সাহায্যে

খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ-

উপকরণ

১. খড় : ২০ কেজি
২. ইউরিয়া : ১ কেজি
৩. পানি : ২০ লিটার
৪. একটি মাঝারি আকারের পাত্র
৫. ছালা ও
৬. মোটা পলিথিন।

তৈরির পদ্ধতি

১। প্রথমে একটি বালতিতে ১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে।

২। ডোলের চারদিকে গোবর ও কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।

৩। এবার ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া মেশানো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। mg¯Í খড় m¤úY পানি দ্বারা মিশিয়ে ডোলের মুখ ছালা ও মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৫। দশ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১। একটি গরুকে দৈনিক ২-৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।

২। খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

খ) ইউরিয়া মোলাসেস বক : দানাদার খাদ্যের সাহায্যে ইউরিয়া মোলাসেস বক তৈরিকরণ-

উপকরণ

১. গমের ভুসি : ৩ কেজি

২. ঝোলাগুড় : ৬ কেজি

৩. ইউরিয়া : ৯০ গ্রাম

৪. লবণ : ৩৫ গ্রাম

৫. খাবার চুন : ৫০০ গ্রাম

৬. ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স : ৫০ গ্রাম

৭. কাঠের ছাঁচ (১ কেজি বক তৈরির জন্য)

চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস বক তৈরির উপকরণ

তৈরির পদ্ধতি

১। প্রথমে একটি লোহার কড়াইতে সামান্য ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ ঝোলাগুড়সহ জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করতে হবে।

২। কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে এর মধ্যে ইউরিয়া, চুন, লবণ, গমের ভুসি যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৩। এরপব ছাঁচের মধ্যে কিছু ভুসি ছিটিয়ে মিশ্রিত দ্রব্যগুলো ভরে বক তৈরি করতে হবে।

৪। বকগুলো শুকনো আলো বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১। একটি গরুকে দৈনিক ৩০০ গ্রাম বক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে দিতে হবে।

২। প্রথমে বক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে না চাইলে বকের উপর কিছু ভুষি ও লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।

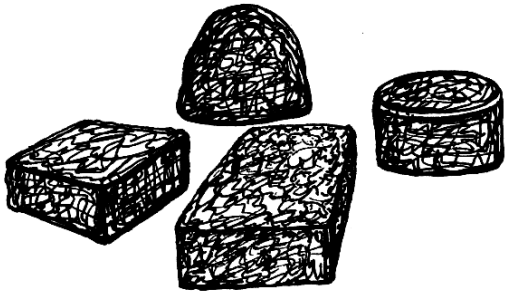

চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস বক

গ) গবাদিপশুকে অ্যালজি বা শ্যাওলা খাওয়ানো

অ্যালজি: অ্যালজি বা শ্যাওলা এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী হতে পারে। তবে এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এক কোষী অ্যালজির কথা উলেখ করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এদের মধ্যে

প্রধান হলো কোরেলা । এরা mhv‡jvK, পানিতে `exfZ অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা বাংলাদেশের মতো উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত বর্ধনশীল ।

অ্যালজির পুষ্টিমান

অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। অ্যালজি পানি ব্যবহার করে কম খরচে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. অ্যালজির বীজ

২. কৃত্রিম অগভীর পুকুর বা জলাধার

৩. পরিষ্কার স্ব"Q পানি

৪. মাসকালাই বা অন্যান্য ডালের ভুসি ও

৫. ইউরিয়া।

অ্যালজির উৎপাাদন পদ্ধতি

১। প্রথমে সমতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি করতে হবে। জলাধারটি লম্বায় ৩ মিটার, চওড়ায় ১.২ মিটার এবং গভীরতায় ০.১৫ মিটার হতে পারে। এর পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ৩.৩৫ মিটার, ১.৫২ মিটার চওড়া একটি স্ব"Q পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম জলাধারটির তলা ও পাড় ঢেঁকে দিতে হবে। তবে জলাধারটির আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতে অ্যালজি চাষ করা যায়।

২। এরপর ১০০ গ্রাম মাসকালাই বা অন্য ডালের ভুসিকে ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে।

এভাবে একই ভুসিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করে পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।

৩। এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ এ্যালজির বীজ এবং মাসকালাই ভুসি ভেজানো পানি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকালে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির পানিকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুর ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।

৫। এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এসময় অ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়। প্রতি ১০ বর্গমিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি উৎপাদন করা সম্ভব।

৬। একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মতো পানি, সার এবং মাসকালাই ভুসি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি চাষ শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

৭। যখন অ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামি রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

খাওয়ানো পদ্ধতি

১। সববয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যায়।

২। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

৩। অ্যালজি পানি দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়।

৪। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে।

৫। খামারের ৫টি গরুর জন্য ৫টি কৃত্রিম পুকুরে অ্যালজি চাষ করতে হয় যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হলে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

ঘ) বাজারে তৈরি m¤úiK **খাদ্য :** পশুপাখির উৎপাদান চলমান রাখার জন্য এদেরকে বাজারে তৈরি বিভিন্ন m¤úiK খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১. আমিষ m¤úiK খাদ্য - যেমন, প্রোটিন কনসেনট্রেট

২. খনিজ m¤úiK - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স

৩. খাদ্যপ্রাণ m¤úiK - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স।

ঙ) বাছুরের m¤úiK **খাদ্য তালিকা-**

মিল্ক রিপেসার (Milk Replacer) : বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পশুখাদ্য যাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এতে ২০% আমিষ ও ১০ এর অধিক চর্বি থাকে। এর Dcv`vbmgn‡K গরম স্কিম মিল্কে বা পানিতে মিশ্রিত করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি: বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

মিল্ক রিপেসার (Milk Replacer) তৈরির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	রেশন-১ (%)	রেশন-২ (%)
১	স্কিম মিল্ক	৬৫	-
২	স্কিম মিল্ক পাউডার	-	৬
৩	পানি	-	৬০
৪	উদ্ভিজ তেল ছানার দুধ	২০	২০
৫	ছানার দুধ	১০	৯
৬	ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স	০৫	০৫
	মোট	১০০	১০০

কাফ স্টার্টার (Calf Starter) : ইহা বাছুরের খাবার উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ ও ১০% এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য থাকে। কাফ স্টার্টারের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	তুলাবীজ	৩৮
২	ভুট্টা	৩০
৩	যব	১০
৪	ছানার গুঁড়া	১০
৫	গমের ভুসি	১০
৬	হাড়ের গুঁড়া	১
৭	খাদ্য লবণ	১
	মোট	১০০

কাজ : শিক্ষার্থীরা গবাদিপশুর বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি: বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডাল ফসলের জন্য মাটির ২টি করে বৈশিষ্ট্য লিখ।

২. কী কী কারণে f¦g¶q হয়।

৩. এ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম লিখ।

৪. মিল্ক রিপেসার ও কাফ স্টার্টার কাকে বলে।

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. ধান ফসল চাষ করতে মাটির কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত বর্ণনা কর।

২. বাংলাদেশের দোআঁশ মাটি AÂj I DcKjxq AÂ‡ল কী কী ফসল জন্মায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. বীজ সংরক্ষণ কী? বীজ সংরক্ষণের kZmgn লিখ।

৪. মাছের m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন ধরণের মাটিতে আলু উৎপাদন বেশি হয় ?

ক. দোআঁশ মাটিতে খ. বেলে দোআঁশ মাটিতে

গ. পলি মাটিতে ঘ. দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে

২। উদ্ভিদভোজী মাছ কোনটি ?

ক. রুই খ. মৃগেল

গ. তেলাপিয়া ঘ. সরপুঁটি

৩। বীজের e¯ÍvQ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মেশানো হয় –

i. নিমের পাতার গুঁড়া

ii. আপেলের বীজের গুঁড়া

iii. কমলার বীজের গুঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাসফি নদীর ধারের একটি জমিতে আলুর চাষ করে আসছিলেন। প্রথম দিকে তার জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পেলেও বর্তমানে তার জমির ফলন কমে hv‡"Q| তিনি এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে জমির ঢালু অংশে ভালোভাবে আল তৈরির পরামর্শ দেন।

৪। তাসফির জমির ফলন কমে যাওয়ার কারণ –

ii. জমির উর্বরতা হ্রাস

ii. জৈব পদার্থের অভাব

iii. মাটির অনুন্নত গঠন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। কৃষি কর্মকর্তা তাসফিকে জমিতে আল তৈরির পরামর্শ দেওয়ার কারণ কোনটি ?

ক. জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ খ. জমির fwg¶q রোধ

গ. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘ. মাটির গঠনের উন্নয়ন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সফিক ও রফিক দুই বন্ধু কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সফিক সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে ধানের চারা তৈরি করেন। বোরো ধান চাষের জন্য তিনি ২ কাঠার একটি বীজতলা তৈরি করলেন। অপরদিকে রফিক প্রতিবেশীর নিকট থেকে ধানের চারা ক্রয় করে বিলে অবস্থিত তার কর্দমাক্ত জমিতে বিনা চাষেই চারা রোপণের কাজ শেষ করলেন।

ক. মাটি কাকে বলে?

খ. দু'টি বীজতলার মাঝে নালা কাটার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. সফিকের জমিতে তৈরিকৃত বীজতলার একটি নকশা বর্ণনা কর।

ঘ. জমিতে ফসল উৎপাদনে রফিকের কার্যক্রমটি gj¨vqb কর।

২. রিতা পাল মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করলেন। তিনি m¤úiK খাদ্য c¯'Z করে পুকুরে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে সফল হন। তার সফলতা দেখে এলাকার অন্য চাষিরা নিয়মিত m¤úiK খাদ্য প্রয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

ক. m¤úiK খাদ্য কাকে বলে?

খ. মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিতা পালের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এলাকার অন্য মাছ চাষিদের গৃহীত কার্যক্রম gj¨vqb কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুZcY হলো ফসল বীজ ও বংশ¯e¯ÍviK উপকরণ। এদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন বছরের পর বছর ফসল উৎপাদন করতে পারি, তেমনি একটি দেশে নতুন ফসল আত্তীকরণ ও সংযোজন করতে পারি, একটি ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ ধরে রাখতে পারি এবং নানা জীব কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উন্নততর করে তুলতে পারি।

চিত্র : ধান বীজ

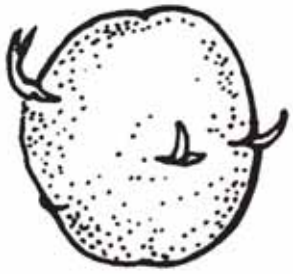

চিত্র : আলু বীজ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ফসল বীজ ও বংশ¯e¯ÍviK উপকরণ ও ধাপগুলো m¤ú‡K বর্ণনা করতে পারব।
- ফসল বীজ ও বংশ¯e¯ÍviK উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের পুকুরের স্বরূপ ও পুকুর c¯‘wZi ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- মাছের পুকুর c¯‘wZ প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুকুরের বিভিন্ন ¯Í‡ii বর্ণনা ও ev¯‘ms¯’vb ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থায়ী মৌসুমী ও আঁতুড় পুকুর বর্ণনা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছর অভয়াশ্রমের গুরুত্ব m¤ú‡K ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের আবাসস্থল রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষণ আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির আবাসন স্বরূপ এবং আবাসন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির আবাসন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পাখির খাদ্যের এবং খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুর আবাসন স্বরূপ এবং আবাসন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুর আবাসনের স্বরূপ ও ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- গবাদিপশুর খাদ্য ও খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গবাদিপশুর খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল বীজ ও বংশ we¯—vi K উপকরণ

বীজ উদ্ভিদের eskwe¯—v‡ii প্রধান মাধ্যম। সাধারণভাবে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ m¤ú‡K m¯úó ধারণা পেতে আমরা বীজকে দুভাবে বুঝতে পারি। যথা-

ক) উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে, উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বককে বীজ বলে। এ ধরনের বীজকে ফসল বীজ বা প্রকৃত বীজ বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজও বলে। যেমন:- ধান, গম, সরিষা, তিল, শিম, বরবটি, টমেটো, ফুলকপি, মরিচ, জিরা, ^aÂv, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

খ) কৃষিতত্ত্ব অনুসারে উদ্ভিদের যে কোনো অংশ (gj, পাতা, কাণ্ড, কুঁড়ি, শাখা) যা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে বংশwe¯—vi K উপকরণ বলে। এ ধরনের উপকরণকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বা অঙ্গজ বীজও বলা হয়। যেমন : আমের কলম, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ্ড, পাথরকুচি গাছের পাতা, কাকরোলের gj, গোলাপের ডাল ও কুঁড়ি, আনারসের মুকুট, কলাগাছের সাকার, আদা, হলুদ, রসুন, কচু ও সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ।

কাজেই দেখা যায় সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সকল কৃষিতাত্ত্বিক বীজ উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ধান, গম, মুলা, মরিচ ফসলের এবং আলু, আদা, গাঁদা ফুল ও মেহেদীর কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমহ :

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হলো এই যে, বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন- ধান, পাট, গম, মুলা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত avcmg‡ni বিশেষ যত্নবান হতে হয় :

১। **বীজ জমি নির্বাচন :** বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে ceeZx বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।

২। **বীজ জমি পৃথকীকরণ :** বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট `i‡Zi ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য n‡"Q Kw•¶Z শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুতcY ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

ক। জাতের নাম খ। বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর

গ। অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ। বীজের আর্দ্রতা
চ। বীজ পরীক্ষার তারিখ।

উলিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের e¯—vq বা প্যাকেটে রাখা হয়।

৪। **বীজের হার নির্ধারণ :** বীজের বিশুদ্ধতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।

৫। **নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ :** এক এক জাতের বীজের জন্য জমির c¯‘wZ এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাক্ত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।

৬। **বীজ বপন :** নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোনো বীজ কত গীভরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির উপর নির্ভর করে।

৭। **রোগিং বা বাছাইকরণ :** বীজ বপনের সময় যতই বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। AbvKw•¶Z উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিন পর্যায়ে রোগিং বা বাছাই করা হয়।

ক। ফুল আসার আগে খ। ফুল আসার সময় গ। পরিপক্ব পর্যায়ে।

৮। **পরিচর্যা :** বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যার ধরন উল্লেখ করা হলো।

ক) সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা
খ) জৈব সার প্রয়োগ
গ) প্রয়োজনমতো সেচ দেওয়া
ঘ) বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ) আগাছা পরিষ্কার করা
চ) রোগ ও পোকা দমন করা
ছ) সারের উপরি প্রয়োগ করা।

৯। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ পরিপক্ব হওয়ার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বংশবি¯—ারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমহ

বাংলাদেশে ফল ফুলের চারা অঙ্গজ পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রচলন খুব বেশি। কারণ এসব গাছের eskwe¯—vi প্রকৃত বীজের মাধ্যমে হলে ফুল ফল পেতে সময় বেশি লাগেও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এ ছাড়া অনেক ফসলের প্রকৃত বীজ দ্বারা eskwe¯—vi ঘটানোও সম্ভব নয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে gj, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখা cfwZ দ্বারা দ্রুত ও অল্পসময়ে চারা উৎপাদন সম্ভব। তাই এগুলো হলো ফসলের eskwe¯—viK উপকরণ। কিছু কিছু ফসল যেমন- আনারস, কলা, আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির বংশwe¯ÍviK উপাদান সরাসরি রোপণ করা যায়। আবার কিছু ফসল যেমন- আম, লেবু, লিচু, জামরুল, গোলাপ ইত্যাদির বংশwe¯ÍviK উপাদান বিভিন্ন ধরনের কলম তৈরির মাধ্যমে c¯‘Z করে ব্যবহার করা হয়।

নিমে eskwe¯—wiK উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজ হিসাবে বীজ আলু উৎপাদনের awcmgn উলেখ করা হলো:

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও তৈরি : বীজ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। নির্বাচিত জমি অন্যান্য আলু ফসল, মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি সোনালেসি গোত্রভুক্ত ক্ষেত থেকে অন্তত ৩০ মিটার `‡i থাকতে হয়। ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা করে আগাছা মুক্ত করতে হবে। চাষ অন্তত ১৫ সেমি গভীর হতে হবে। মাটি বেশি শুকনো হলে পাবন সেচ দিয়ে মাটিতে ‘ জো’ আসার পর আলু লাগাতে হবে।

বীজ শোধন : হিমাগারে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর c‡e বীজ আলু বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (১ লি. পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)।

বীজ প্রস্তুতি : বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে A¯— আলু বপন করা ভালো, কারণ A¯— বীজ রোপনের পর এগুলোর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। আলু কেটে লাগলে প্রতি কর্তিত অংশে অন্তত ২ টি চোখ অবশ্যই রাখতে হবে। আলু কাটার সময় বারবার সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়িভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হবে।

মাটিতে ঔষধ প্রয়োগ : ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য শেষ চাষের c‡e প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেবল বিচিং পাউডার মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া উত্তম।

সার প্রয়োগ : দুটি কারণে আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। প্রথমত: সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভালো হয়। দ্বিতীয়ত: গাছে কোনো খাদ্যোপাদনের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে আলু চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু গোবর, টিএসপি, এমপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, বরিক এসিড জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতাংশে
পচা গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম
এমপি	১০৬০ গ্রাম
বরিক এসিড	২৫ গ্রাম
জিঙ্কসালফেট	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	-

বীজ হার ও রোপণ সময় : বীজহার নির্ভর করে রোপণ `iZ ও বীজের আকারের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলুর প্রয়োজন (একরে ৬০০-৮০০ কেজি)।

রোপণ দরত্ব

`iZ	A¯Í আলুর ক্ষেত্রে	কাটা আলুর ক্ষেত্রে
লাইন থেকে লাইন `iZ	৬০ সেমি	৬০ সেমি
বীজ থেকে বীজ `iZ	২৫ সেমি	১০-১৫ সেমি

সেচ ব্যবস্থাপনা : মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ প্রদান করা উচিত। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্কুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাবে। রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে কারণ ৩০ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হতে শুরু করে। সাধারণত কেইলের ২/৩ ভাগ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন : রোপণের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। সাধারণত গাছ ছোট অবস্থায় থাকাকালীন আগাছা যথাসম্ভব দমন করে রাখতে হবে। এছাড়া বথুয়া জাতের আগাছা যা ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসাবে কাজ করে তা অবশ্যই wbgj করে ফেলতে হবে।

মাটি উঠিয়ে দেওয়া : ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে 'জো' আসলে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরও এক বার এমনভাবে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে আলু বাহিরে না যায় এবং স্টোলন ও আলু মাটির ভিতরে থাকে।

রোগিং : চারা গজানোর পর থেকে রোগিং শুরু করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ শিকড়সহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগবালাই ও পোকা দমন

(ক) আলুর রোগ : আলুর †ivMmg‡ni মধ্যে মড়ক রোগ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ, দাঁদ রোগ, কাণ্ড পচা রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, Kqvkv"Qb আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (লেইট বাইট) আক্রমন বেশি দেখা যায়। আলু ফসলকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য ¯úkK (কণ্টাক্ট) জাতীয় ছত্রাকনাশক নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

খ) কাটুই পোকা : এ পোকার কীড়া আলুর প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা গাছ কেটে দেয় এবং আলু আক্রমণ করে।

- খুব সকালে যে সব গাছ কাটা পাওয়া যায় সেগুলোর গোড়ার মাটি সরিয়ে পোকার কীড়া বের করে মারতে হবে।
- আক্রমণ তীব্র হলে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গ) জাব পোকা : জাব পোকা গাছের রস খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাব পোকা দমন অত্যন্ত জরুরি। এজন্য গাছের পাতা গজানোর পর থেকে ৭-১০দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীট নাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ এড়াতে ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা উত্তম।

ফসল সংগ্রহ এবং পরিচর্যা : আধুনিক জাতে পরিপক্বতা আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। তবে বীজ আলুতে সংগ্রহের অন্তত ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ক) হাম পুলিং : মাটির উপরে গাছের m¤úY অংশকে উপড়ে ফেলাকে হাম পুলিং বলে। আলু সংগ্রহের ৭-১০ দিন c‡e হাম পুলিং করতে হবে। এতে m¤úY শিকড়সহ গাছ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচের থেকে যাবে। হাম পুলিং এর ফলে আলুর ত্বক শক্ত হয়, রোগাক্রান্ত গাছ থেকে রোগ we¯—vi কম হয় ও আলুর সংরক্ষণগুণ বৃদ্ধি পায়। বীজ আলুতে অবশ্যই হাম পুলিং করতে হবে, তবে খাবার আলুর বেলায় হাম পুলিং জরুরি নয়।

(খ) আলু উত্তোলন : আলু উত্তোলনের পর পরই বাড়িতে নিয়ে আসা উত্তম। আলু তোলার পর কোনো অবস্থাতেই ক্ষেতে ¯Zপাকারে রাখা যাবে না, কারণ ক্ষেতে আলু খোলা রাখলে তা বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে (যেমন-সুতলি পোকা ডিম পাড়তে পারে)।

(গ) আলু সংরক্ষণ : আলু উত্তোলনের পর বাড়িতে এনে সাথে সাথে কাটা, দাগি ও পচা আলু আলাদা করে বেছে ফেলতে হবে। তারপর ৭-১০ দিন মেঝেতে আলু বিছিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর আবারও দাগি ও পচা আলু বেছে বাদ দিয়ে ভালো আলু e¯—vq ভরে হিমাগারে পাঠাতে হবে।

এছাড়া বীজ আলু উৎপাদনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন-

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি

(খ) স্প্রাউট ও টপ শুট কাটিং পদ্ধতি

(গ) বিনাচাষে বীজ আলু উৎপাদন

(ঘ) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।

ফসল বীজের গুরুত্ব : ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ খুবই গুরুতcY| যে সব ফসল কেবল বীজের মাধ্যমেই ফলানো সম্ভব সে ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বংশরক্ষার্থে ফসল বীজের বিকল্প নেই। এছাড়াও-

১। ফসল বীজ ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ।

২। ফসল বীজ মানুষসহ পশু পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। বিশুদ্ধ ফসল বীজ রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা we¯—vi রোধ করে।

৪। ফসল বীজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব।

৫। ফসল বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশধারা টিকে থাকে।

৬। কোনো কোনো বীজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭। ফসল বীজ অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বংশবি¯—iK উপকরণের গুরুত্ব : অধিকাংশ ফসলের eskwe¯—vi বীজ দ্বারা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে ফলন পাওয়া যায়। কাজেই জনবহুল কোনো দেশের জন্য ফসল দ্রুত পাওয়ার জন্য eskwe¯—viK উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজের বিকল্প নেই। এতে উদ্ভিদের gj, কাণ্ড, শাখা, পাতা, শিকড়, কুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে eskwe¯—vi করা হয় বলে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে। একই গাছে একাধিক জাতের সংযোজন ঘটানো যায়। যেমন : মিষ্টি ও টক কুল একই গাছে এবং লাল, হলুদ, কালো ও সাদা ফুল একই গোলাপ গাছে ফোটানো সম্ভব। এছাড়াও এ উপরকরণ ব্যবহার করে বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অল্প সময়ে ও কম খরচে সহজে ফুল, ফল পাওয়া যায়। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বcY|

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি উৎপাদনে ফসল বীজ সংগ্রহ করবে এবং বীজের বর্ণনা খাতায় লিখবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাছের পুকুর

পুকুর n‡"Q ছোট ও অগভীর বন্ধ জলাশয়, যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা যায় এবং প্রয়োজনে এটিকে সহজেই m¤úY f‡e শুকিয়ে ফেলা যায়। এক কথায় পুকুর n‡"Q চাষযোগ্য মাছের বাসস্থান। পুকুরে পানি স্থির অবস্থায় থাকে। তবে বাতাসের প্রভাবে এতে অল্প ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক এবং এরা অধিকতর উৎপাদনশীল হয়।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

মাছ চাষের পুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যা চাষ প্রক্রিয়াকে লাভজনক করতে যথেষ্ট fwgKv রাখে। একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

১। পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হতে হবে।

২। পুকুরের মাটি দোআঁশ, পলি- দোআঁশ বা এঁটেল- দোআঁশ হলে সবচেয়ে ভালো।

৩। সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত।

৪। পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২ মিটার সুবিধাজনক।

৫। পুকুরটি খোলামেলা স্থানে হলে ভালো হয় এবং পাড়ে বড় গাছপালা থাকবে না। এতে পুকুর প্রচুর আলো-বাতাস পাবে। ফলে পুকুরে সালোকসংশেষণ বেশি হবে ও মাছের খাদ্য বেশি তৈরি হবে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মিশবে। উত্তর-দক্ষিণমুখী পুকুর সুর্যালোক বেশি পাবে।

৬। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকা উচিত নয়। তলার কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সে.মি. এর বেশি হওয়া ঠিক নয়।

৭। চাষের পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয় । পুকুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ভালো। এতে করে জাল টেনে মাছ আহরণ করা সহজ হয়।

৮। পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ পুকুরের তলা হতে পুকুরের পাড় যতটুকু উঁচু হবে পাড় ঢালু হয়ে পুকুরের তলার দিকে দ্বিগুণ `i‡Z গিয়ে মিশবে।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ

মাছের বেঁচে থাকা, খাদ্যগ্রহণ ও আশানুরূপ বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির গুণাগুণ AbKj মাত্রায় থাকা দরকার। পুকুরে পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ভৌত গুণাগুণ ২) রাসায়নিক গুণাগুণ। মাছ চাষে এদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। ভৌত গুণাগুণ

ক) গভীরতা : পুকুর বেশি গভীর হলে m‡hi আলো পুকুরের অধিক গভীরতা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। ফলে অধিক গভীর AÂ‡j মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পাংকটন তৈরি হয় না। আবার সেখানে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

অন্যদিকে পুকুর অগভীর হলে গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। এসব কারণে মাছের ক্ষতি হতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

খ) **তাপমাত্রা:** তাপমাত্রার বৃদ্ধির উপর মাছের বৃদ্ধির নির্ভর করে। যেমন– মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। একারণে শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো হয়।

গ) **ঘোলাত্ব :** কাদা কণার কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে mhv‡jvK প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ঘ) **সর্যালোক:** যে পুকুরে mhv‡jvK বেশি পড়ে সেখানে সালোকসংশেষণ ভালো হয়। ফলে সেখানে ফাইটোপাংটন বেশি উৎপাদিত হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২। রাসায়নিক গুণাগুণ

ক) **দ্রবীভত অক্সিজেন:** পুকুরের পানিতে `exfZ অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বcY। প্রধানত ফাইটোপাংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন তৈরি করে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত হয়। বায়ুমন্ডল হতে সরাসরি পানির উপরিভাগেও কিছু অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। পুকুরে বসবাসকারী মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে mhv‡jv‡Ki অভাবে সালোকসংশেষণ হয় না বলে পানিতে কোনো অক্সিজেন তৈরি হয় না। এজন্য সকালে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও বিকেলে বেশি থাকে। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ মিলি গ্রাম/লিটার (৫ পিপিএম বা ১ মিলিয়ন ভাগের পাঁচ ভাগ) থাকা প্রয়োজন।

খ) **দ্রবীভত কার্বনডাই অক্সাইড:** পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত `exfZ কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন। তবে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ১২ মিলি গ্রাম/লিটারের (১২ পিপিএম) নিচে থাকলে তা মাছ ও চিংড়ির জন্য বিষাক্ত নয়। মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরের পানিতে ১-২ পিপিএম কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন।

গ) **পিএইচ (pH)**: মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির পিএইচ ৬.৫ হতে ৮.০ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। ৬.৫ এর নিচে পিএইচ হলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। পিএইচ ৪ এর নিচে বা ১১ এর উপরে হলে মাছ মারা যায়। পানির পিএইচ কমে গেলে পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক) প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে ক্ষারীয় অবস্থা বেশি বেড়ে গেলে এমোনিয়াম সালফেট বা তেতুঁল পানিতে গুলে পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঘ) **ফসফরাস:** প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপাংটন জন্মায়।

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প¯—Zকরণ

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা n‡"Q নতুন পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য c¯—ZKiY বা উপযোগীকরণ। নিচে এ m¤ú‡K আলোচনা করা হলো-

ক. নতুন পুকুর খনন

কোনো স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন বছরে ১.৫ থেকে ২ মিটার পানি থাকে। খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল b¨bZg ১.৫ঃ২ রাখা উচিত। তবে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে ১ঃ৩ করা নিরাপদ। অন্যথায় পুকুরের পাড় ভেঙে গিয়ে অল্প দিনে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পুকুর খননের স্থানে যদি উপরের মাটি ভালো ও উর্বর হয় তবে পুকুর খননের সময় আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। পুকুর খনন শেষ হলে পুকুরের তলায় বালু মাটির উপরে তা বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগে ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিতলের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। ঐ জায়গাটুকুকে বকচর বলে। পুকুরে তলা সমান অথচ একদিকে কিছুটা ঢালু করতে হবে। এতে পানি সেচ ও মাছ আহরণে সুবিধা হবে। নতুন পুকুর খননের পর দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে পাড়ের মাটি শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে পাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে ও বর্ষায় পাড়ের মাটি ক্ষয়ে যাবে না।

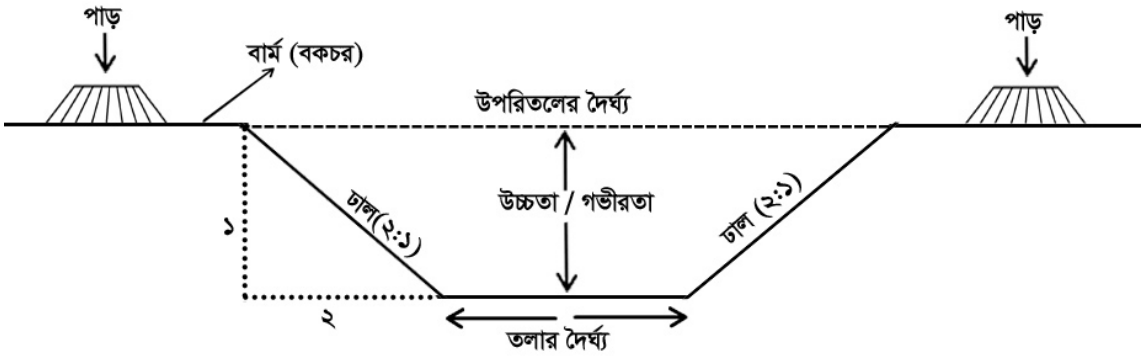

চিত্র: পুকুরের প্রস্থ‡"Q`

পুকুর প্র¯—তকরণ বা মাছ চাষের উপযোগীকরণ

পুকুর c¯‘wZ মাছ চাষের জন্য খুব গুরুত্বcY। মাছ পালনের c‡e বিদ্যমান পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে ভালোভাবে c¯‘Z করে নিলে মাছ স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের AbKj পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে ও রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছ উৎপাদন লাভজনক হয়। পুকুর c¯‘wZi প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে m¤úb করতে হয়। ধাপ গুলো নিম্নরূপ–

১. পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পাড় ভাঙা থাকলে মেরামত করতে হবে ও পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয় বা থাকলেও তা ছেটে দিতে হবে। এতে করে পুকুরে m‡hi আলো পড়তে পারবে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুর পুরানা হলে তলায় অতিরিক্ত কাঁদা জমা হয়। এ আবস্থায় ২০-২৫ সে:মি: কাদা রেখে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে সহজেই তা করা যায়। মাছ চাষের পুকুরে ৩-৪ বছর পর পর একবার শুকানো উচিত।

পুকুর শুকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুকুরে তলা থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় `i হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুকুরে তলদেশ সমান করে নিতে হবে। পুকুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে মাছ ধরতে ও জাল টানতে সুবিধা হবে।

২. জলজ আগাছা দমন

পুকুর পাড়ে ও ভিতরে বিভিন্ন আগাছা যেমন-কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, †n‡jÂv, কলমি লতা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আগাছা পুকুরে দেওয়া সার শোষণ করে নেয়, m‡hi আলো পড়তে বাধা দেয় এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন-রাক্ষুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ও মাছ ধরে খায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন-কপার সালফেট বা তুঁতে, সিমাজিন ইত্যাদি ব্যবহার করেও জলজ আগাছা দমন করা যায়। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা K‰•¶Z নয়। গ্রাসকার্প, সরপুঁটি উদ্ভিদভোগী মাছ। চাষকালীন সময়ে পুকুরে এসব মাছ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দরীকরণ

বিভিন্ন রাক্ষুসে মাছ যেমন-শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি সরাসরি চাষের মাছ খেয়ে ফেলে। এছাড়া পুটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অচাষযোগ্য মাছ। এরা চাষযোগ্য মাছের জায়গা, খাদ্য, অক্সিজেন সবকিছুতেই ভাগ বসায়। এর ফলে চাষকৃত মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিচের যে কোনো পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও আবাদযোগ্য নয় এমন মাছ `i করা যায়-

ক) পুকুর শুকিয়ে: পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুকুরের তলায় কাদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কড়া রোদে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

খ) জাল টেনে: পুকুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।

গ) মাছ মারার বিষ ব্যবহার করে: এক্ষেত্রে রোটেনন বা মহুয়ার খৈল ব্যবহার করা যায়। এদের দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায়। এসব দ্রব্য পুকুরে দিলে মাছের ফুলকার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ফলে মাছ দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সেমি গভীরতায় পানির জন্য শতক প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন অথবা ৩ কেজি মহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মোট পরিমাণকে তিন ভাগ করতে হবে। একভাগ দিয়ে কাই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে দিতে হবে। বাকি ২ ভাগ পানিতে গুলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুকুরের পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে ধরে ফেলতে হবে। বিষ দেওয়ার পর ৭-১০ দিন পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না ও নতুন মাছ ছাড়া যাবে না। রোটেনন ব্যবহারে মৃত মাছ খাওয়া যাবে। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করেও মাছ মারা যায় যেমন- ফসটক্সিন ট্যাবলেট। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা ঠিক নয়।

৪. চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকানো হলে তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলায় চাষ দেওয়া হলে চাষের দিন চুন দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গুলে ঠাণ্ডা হলে mg¯— পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১) চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় ২) পানির পিএইচ ঠিক রাখে ৩) পানির ঘোলাত্ব কমায় ও পানি পরিষ্কার রাখে ৪) মাছের রোগ-বালাই `i করে এবং ৫) সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুকুরের বয়স ও পানির পিএইচ মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন-এঁটেলমাটি, কাদামাটি ও লাল মাটির পুকুরে চুন একটু বেশি দরকার হয়। নিম্নে পিএইচ মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

পুকুর c¯—‖Zi সময় চুন প্রয়োগের মাত্রা

পানির পি এইচ মান	চুনের (পাথুরে) পরিমাণ (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫. সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার n‡"Q ফাইটোপাংকটন ও জুপাংকটন। সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-ফসফরাস, পটাশিয়াম পানিতে মিশে। এ পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপাংকটন তৈরি হয়। আর ফাইটোপাংকনের উপর নির্ভর করে জু-পাংকটন তৈরি হয়। সার দুই প্রকার। যেমন- ক) জৈব সার, যেমন-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, খ) অজৈব সার, যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়। রোদ্রোজ্জ্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার পানিতে গুলে mg¯— পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুর c¯—‖Zi সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

জৈব সার		অজৈব সার	
সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)	সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)
গোবর	৫-৭ কেজি	ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
অথবা		টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি	এমপি	২০ গ্রাম

৬. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে পোনা মজুদের c‡eB সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে এটি করা যায়।

ক) সেকিডিস্ক: ২০ সেমি ব্যাসযুক্ত টিনের একটি সাদা-কালো থালা (একে সেকিডিস্ক বলে) সুতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সে.মি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সে.মি. এর অধিক গভীরতায় সেকিডিস্ক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে খাবার অনেক কম।

খ) হাত পরীক্ষা: পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

গ) গ্লাস পরীক্ষা: একটি স্ব"Q কাচের গ্লাস দ্বারা পুকুরের পানি নিয়ে m‡hi আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সুক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে ।

পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরো ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

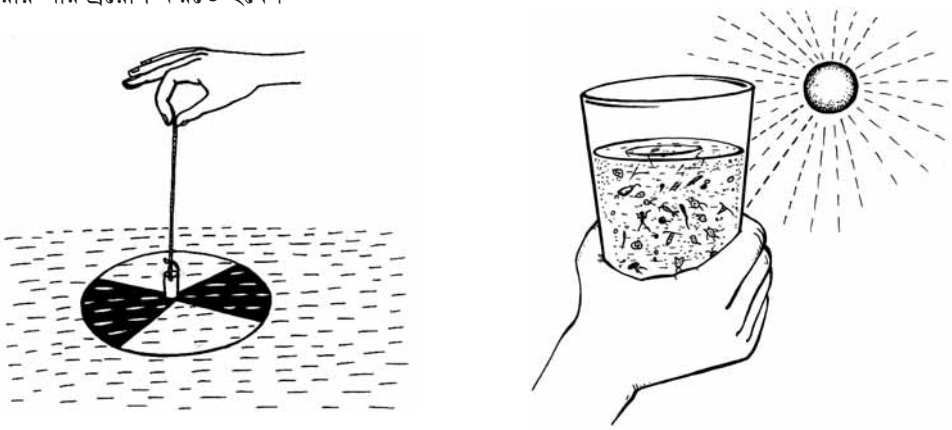

চিত্র: সেকিডিস্ক ও গ্লাস পরীক্ষা

৭. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

যে পুকুরে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে মাছ মারা হয়েছে সেখানে পোনা মজুদের ১ দিন c‡e পুকুরে হাপা স্থাপন করে অথবা বালতিতে বা পাতিলে পুকুরের পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এসময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

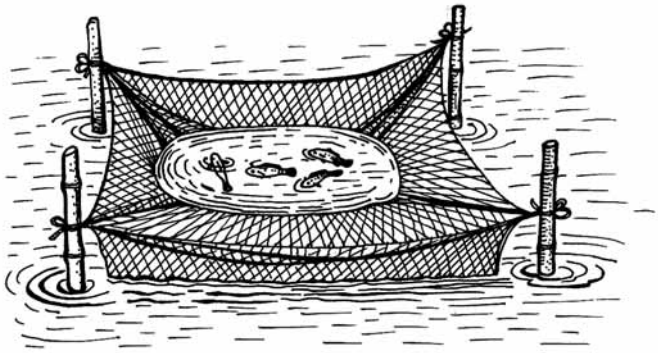

চিত্র : পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষকসহ পাশ্ববর্তী কোনো পুকুরে গিয়ে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করবে এবং খাতায় লিখে জমা দিবে।

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নার্সারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করতে পারে কাছাকাছি স্থানে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কিন্তু `ieZ স্থানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে ৩ ভাগের ১ ভাগ পানি ও ২ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার c‡e পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ জন্য পোনাভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে A¯‡— A¯‡— এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার c‡e শোধন করে নিলে পোনাগুলো কোনো ক্ষতিকারক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে মুক্ত হবে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে ও মৃত্যুর ঝুকি কমে যাবে। বালতিতে বা পাতিলে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০ টি পোনা আধা মিনিট গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে ৪-৫ বার শোধন করা যাবে। তাই পুকুরের জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।

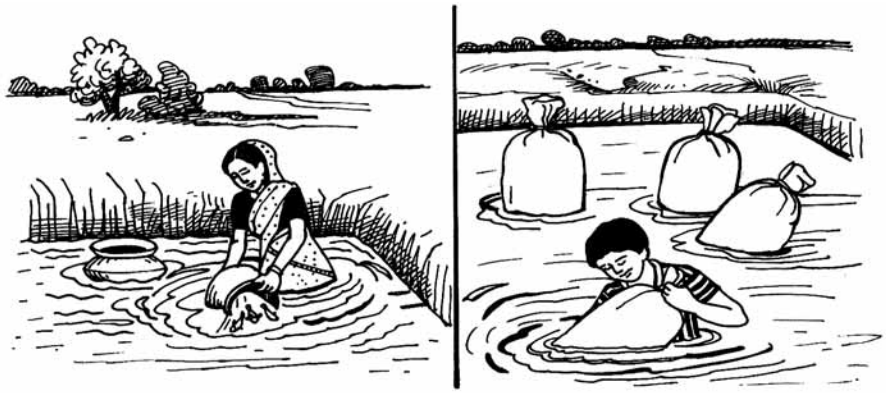

চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

নতুন শব্দ: পি.পি.এম রোটেনন, ফসটক্সিন ট্যাবলেট, সেকিডিস্ক

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাছের পুকুর/মৎস্য খামার পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুকুরের প্রকারভেদ ও এর বিভিন্ন ¯—i

পুকুরের প্রকারভেদ

পানি ধারণক্ষমতা, পুকুরে মাছের ধরন, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে পুকুরের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণিবিভাগ

ক) স্থায়ী বা বার্ষিক পুকুর: এসব পুকুরে সারা বছর পানি থাকে। এরা অধিক গভীর হয়। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে। যেমন- এঁটেল ও দোঁআশ মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদির মিশ্র চাষ, গলদা চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ করা যায়।

খ) অস্থায়ী বা মৌসুমি পুকুর: এসব পুকুরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮মাস) পানি থাকে। এগুলো বেশি গভীর হয় না। এদের মাটি বেশি সময় পানি ধরে রাখতে পারে না। যেমন- বেলে মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ যেগুলো এক বছরের কম সময়ে বাজারজাত করার উপযোগী হয় সেসব মাছ চাষ করা যায়। যেমন- সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, শিং, মাগুর ইত্যাদি।

২। চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

মাছের পোনাকে বয়স ও দৈর্ঘ্য অনুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম পোনা, রেণু পোনা, ধানী পোনা ও আঙ্গুলে বা চারা পোনা। ডিম ফুটার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে। এদের পেটের নিচে একটি থলি থাকে। থলি থাকা অবস্থায় (২-৩দিন) এরা বাইরে থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। কুসুম থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেণু পোনা বলে। রেণু পোনা আরও বড় হয়ে ধানের মতো আকার (যেমন- ২ বা ২ সে.মি. এর উপর বড়) হলে একে ধানী পোনা এবং আঙ্গুলের মতো লম্বা (৭ সে.মি. এর উপর) হলে একে আঙ্গুলে বা চারা পোনা বলে। এ বিভিন্ন আকারের পোনার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশের পুকুর প্রয়োজন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক) আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর: যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর বলে। এখানে শতক প্রতি ৫০-১০০ গ্রাম রেণু পোনা ছেড়ে ১৫-৩০ দিন চাষ করা হয়।

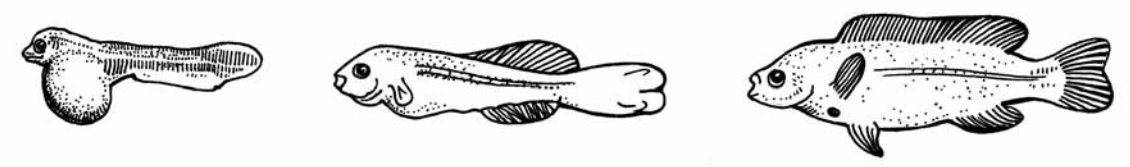

ডিম পোনা রেণু পোনা / ধানী পোনা চারা পোনা / আঙ্গুলি পোনা

চিত্র: মাছের পোনার বিভিন্ন পর্যায়

খ) লালন পুকুর: যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা বা আঙ্গুলে পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। লালন পুকুরের আয়তন ২০ থেকে ১০০ শতক ও গভীরতা ১.৫-২ মিটার হতে পারে। এ পুকুরে শতক প্রতি ২৫০০-৪০০০ টি ধানী পোনা ছেড়ে ২-৩ মাস চাষ করা হয়।

গ) মজুদ পুকুর: এটিই মাছ চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এর আয়তন ৩০ শতকের উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। এখানে সাধারণত এখানে ১ বছরের উপরে মাছ লালন না করাই ভালো। কারণ খাদ্য দিলেও এ সময়ের পর মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।

এছাড়া আয়তনের উপর ভিত্তি করেও পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর (১-৫ শতক), মাঝারি পুকুর (১০-৩০ শতক) এবং বড় পুকুর (৩০ শতকের উপর)।

পুকুরের বিভিন্ন ¯—i

পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে তাপমাত্রা, অক্সিজেন, ও পাংকটনের তারতম্য ঘটে। পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন মাছও বিভিন্ন গভীরতায় থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে। এই সব তারতম্য অনুযায়ী পুকুরকে ৩টি ¯—‡i ভাগ করা যায়। যথা- (১) উপরের ¯—i (২) ga¨¯—i এবং (৩) নিচের ¯—i

১) **উপরের ¯—i বা উপরিভাগ:** পুকুরের উপরের ¯—i যেহেতু বাতাসের ms¯ú‡k থাকে তাই এই ¯—‡i অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পুকুরের উপরের ¯—‡i ফাইটোপাংকটন বেশি থাকে যা মাছের খাদ্য। এই ¯—‡i সরপুঁটি, কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

২) **মধ্য¯—র বা মধ্যভাগ:** এই ¯—‡i পানির তাপমাত্রা ও `exfZ অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের ¯—‡ii চেয়ে কম থাকে। এই ¯—‡i ফাইটোপাংকটন ও জু-পাংকটন উভয়ই থাকতে পারে। রুই মাছ এই ¯—‡i থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

৩) **নিচের ¯—i বা তলদেশ:** এই ¯—‡i `exfZ অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। পুকুরের তলদেশে জু-পাংকটন, কীটপতঙ্গ, পচা-আবর্জনা, কেঁচো, শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়। মৃগেল, কালবাউশ, কার্পিও বা কমন কার্প, চিংড়ি, পাঙ্গাশ, শিং, মাগুর এই ¯—‡i বাস করে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল ¯—‡iB বিচরণ করে যেমন- তেলাপিয়া। অন্যদিকে গ্রাস কার্প পুকুরের উপরে, পাড়ে বা তলদেশে জন্মানো বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

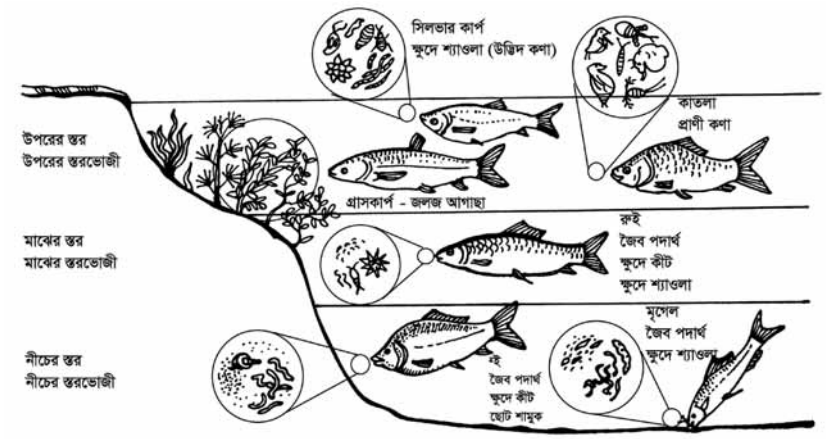

চিত্র: পুকুরের বিভিন্ন ¯—i

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুকুরে ¯Íi ভিত্তিক মাছের অবস্থান ও তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর, মজুদ পুকুর, বার্ষিক ও মৌসুমি পুকুর।

পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা RxeKj‡K চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) **পাংকটন:** পাংকটন n‡"Q পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান অণুবীক্ষণিক জীব। এরা দুই প্রকার যথা- ফাইটোপাংকটন বা উদ্ভিদকণা ও জু-পাংকটন বা প্রাণীকণা। পুকুরের পানির রং সবুজ বা সবুজাভ থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটোপাংকটন আছে। ফাইটোপাংকটনকে এককোষী শেওলাও বলে। কয়েকটি ফাইটোপাংকটনের উদাহরণ n‡"Q- ক্লোরেলা, এনাবেনা, মাইক্রোসিস্টিস ইত্যাদি। আর কয়েকটি উলেখযোগ্য জু-পাংকটন n‡"Q ড্যাফনিয়া, কপিপোড, রটিফার। পানির রং বাদামি সবুজ, লালচে-সবুজ বা হলদেটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটোপাংকটনের পাশাপাশি পুকুরে জু-পাংকটনের উপাদানও ভালো। পুকুরে পাংকটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয়। সার হিসাবে জৈব ও অজৈব এ দুধরনের সারই ব্যবহার করা যায়।

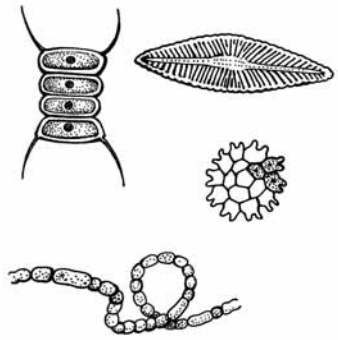

চিত্র: কয়েকটি ফাইটোপাংকটন

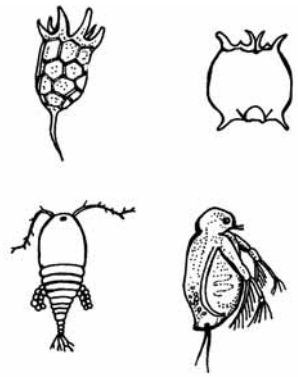

চিত্র: কয়েকটি জু-পাংকটন

২) **সাঁতারু বা নেকটন** : এরা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এরা mg¯— পানিতে চরে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে খায় যেমন- মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি। অবশ্য এদের ডিম ও লার্ভার বৈশিষ্ট্য পাংকটনের মতো।

৩) **তলবাসী বা বেনথোস**: পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যে সব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেনথোস বলে। যেমন- পচনকারী ব্যাকটেরিয়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। তলবাসী প্রাণী পুকুরের তলা থেকে পাংকনের পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে। ফলে পানিতে পাংকটনের পুষ্টি উপাদান বাড়ে যা মাছ চাষের জন্য ভালো।

৪) **জলজ উদ্ভিদ**: পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন-

ক) **শেওলা :** অগভীর পুকুরের তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে। যেমন- ¯úvB‡ivMvBiv, চারা ইত্যাদি।

খ) **ভাসমান উদ্ভিদ**: এ সকল উদ্ভিদ পানিতে ভেসে থাকে। এদের gj মাটিতে আটকানো থাকে না। যেমন- কচুরিপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

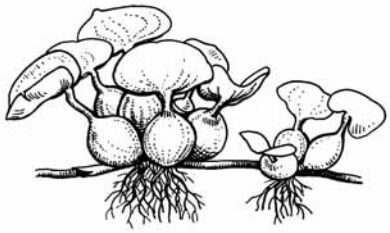

কচুরি পানা

ক্ষুদি পানা

চিত্র: কতিপয় জলজ ভাসমান উদ্ভিদ

গ) **নির্গমশীল উদ্ভিদ**: এ সব উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে। যেমন– শাপলা, পানিফল, শুসনি শাক, আড়াইল।

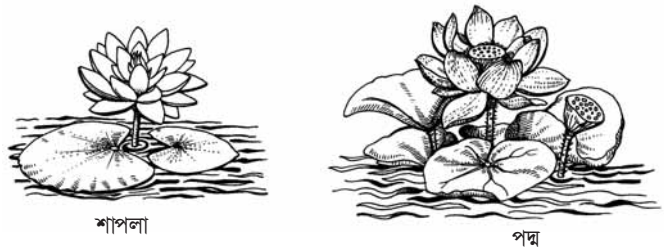

চিত্র: কতিপয় জলজ নির্গমশীল উদ্ভিদ

ঘ) **নিমজ্জিত বা ডুবন্ত উদ্ভিদ**: এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এদেও শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা ও ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন- ঝাঁঝি, কাঁটা শেওলা, নাজাস।

চিত্র: কতিপয় ডুবন্ত উদ্ভিদ

ঙ) **লতানো উদ্ভিদ**: এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এবং কাণ্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন- †n‡jÂv, KjwgjZv, gvjÂ|

চিত্র: কতিপয় লতানো উদ্ভিদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট, বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয় যার মোট আয়তন n‡"Q প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং আরও রয়েছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কি.মি. এর সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই n‡"Q মুক্ত জলাশয় যেমন- নদ-নদী, বিল, সুন্দরবনের Rjvfwg, কাপ্তাই লেক, হাওর ও cwebfwg| যার মোট আয়তন n‡"Q ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র শতকরা প্রায় ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চিংড়ি খামার। এদের মোট আয়তন n‡"Q ৬.৭৮ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

m`i অতীতে প্রাকৃতিকভাবে এদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়mg‡n বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ষাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের h‡_"Q ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি `lY, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন বর্তমানে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্ন বন্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। মুক্ত জলাশয়ে শুধু উৎপাদনই নয় সে সাথে মাছের জীববৈচিত্র্যও দিনে দিনে হ্রাস cv‡"Q| ইতিমধ্যে বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপণ্ন, ২৮টি বিপণ্ন ও ১৪টি SwKcY প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি (যেমন- সরপুঁটি, মহাশোল, বাঘাইর), আর যে প্রজাতি A`i ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। অন্যদিকে যে প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে তাকে SwKcY প্রজাতি বলে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির মাছের উদাহরণ n‡"Q- রানি, পাবদা, টেংরা ইত্যাদি। আর SwKcY প্রজাতি n‡"Q ফলি, গুলশা, কাজলি, মেনি ইত্যাদি। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মৎস্য অভয়াশ্রম n‡"Q কোনো জলাশয় বা এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন- কোনো হাওর, বিল বা নদীর কোনো অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক সময় উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে মাছ আহরণ যেন না করা যায় এজন্য গাছের ডালপালা, বাঁশ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে করে সেখানে মাছ নিরাপদ আশ্রয় পায়, মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে ও অবাধ প্রজনন ঘটাতে পারে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টির মতো অভয়াশ্রম পরিচালনা করা n‡"Q|

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের বা ঘোষণার মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।

২. মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং m¤cmviY করা যায় ।

৩. মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায় ।

৪. মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।

৫. প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধি ঘটানো যায়।

৬. জলজ পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।

৭. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তায় fwgKv রাখে ।

চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব m¤ú‡K প্রতিবেদন তৈরি করবে।

নতুন শব্দ : চরম বিপন্ন প্রজাতি, বিপন্ন প্রজাতি, SwKcY প্রজাতি, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

cÂg পরিচ্ছেদ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

দিনে দিনে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সে সাথে বাড়ছে মাছের চাহিদাও। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জেলেরা দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে প্রায় ছোট বড় সব মাছই ধরে ফেলছে। এ থেকে রেহাই cv‡"Q না পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছও। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ক্রমান্বয়ে মাছ উৎপাদন কমে hv‡"Q| এমনকি কিছু প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র্য যেন কমে না যায় বরং বৃদ্ধি পায় বা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে এজন্য সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে "মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন- ১৯৫০" প্রণয়ন করে। এটি সাধারণভাবে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ev¯—e প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এই আইনের উলেখযোগ্য wewamgn হলো-

১। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক : ক) প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ BwÂ) নিচের আকৃতির কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া; খ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ BwÂ) নিচের আকৃতির ইলিশ (যা "জাটকা" নামে পরিচিত); গ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ BwÂ) নিচের আকৃতির পাঙ্গাশ; ঘ) প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটারের (১২ BwÂ) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

৩। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সংযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা `¤úwË মাছ ধরা ও ধবংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৪। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

৫। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৬। অভ্যন্তরীণ Rjvfwg‡Z বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ `lY, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধবংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৭। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল (প্রচলিত নাম- কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৮। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ: সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার, ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর i¯‘g পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা এবং প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকায় কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৯। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ: ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী/হাইতকান্দি পয়েন্ট, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তুজমুদ্দিন/পশ্চিক সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর কুতুবদিয়া/গন্ডামারা পয়েন্ট বং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালি c‡q›Umg‡ni অন্তর্গত প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

১০। kw¯—: (ক) প্রথমবার আইন f•NKvixi kw¯— হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে m‡ev”P ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ m‡ev”P ১০০০/- টাকা জরিমানা। (খ) পরবর্তীতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে m‡ev”P ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ m‡ev”P ২০০০/- টাকা জরিমানা।

নতুন শব্দ : জাটকা, কারেন্ট জাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির আবাসন

হাঁস-মুরগির আবাসন

পারিবারিকভাবে ১০-১৫ হাঁস-মুরগি পালনের জন্য শুধু রাতে আশ্রয়ের জন্য ছোট খোঁয়াড় বা বাসস্থান তৈরি করা হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে এদের জন্য আবাসন বা বাসস্থান প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে পাখির বাসস্থান করা হয়ে থাকে। যথা-

১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য।
৩। নিবিড়ভাবে যত্ন নেয়া যায়।
৪। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা।
৭। টিকা দেওয়া সহজ হয়।
৮। বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
৯। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা।
১০। ডিম সংগ্রহ করা সহজ হয়।

৫। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক সহজ হয়

৬। হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

১১। লিটার সহজে পরিষ্কার করা য়ায়।

১২। শ্রমিক কম লাগে।

হাঁসমুরগির আবাসন তৈরির ধাপসমহ

কাজ
শিক্ষার্থীরা, হাঁস-মুরগি আবাসন তৈরির ধাপগুলো লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

১। হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা।

২। ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা।

৩। হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা।

৪। হাঁস-মুরগির ঘর তৈরিকরণ

৫। হাঁস-মুরগিকে প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া।

হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা : হাঁস-মুরগির বাসস্থান বা ঘর এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। যথা-

১। উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা হতে হবে।

২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে `‡i হবে।

৩। ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।

৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকবে।

৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকবে।

৬। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা m¤úb স্থান হতে হবে।

৭। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে।

ঘরের ডিজাইন

হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘর সবচেয়ে ভালো। হাঁসমুরগির সংখ্যার উপর ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটারের মধ্যে হতে হবে। হাঁস-মুরগির ঘর ce পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং `w¶YgLx হতে হবে। ছাদের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের মুরগির ঘর বেশি দেখা যায়। যেমন-

১। শেড টাইপ

২। গ্যাবল টাইপ

শেড টাইপ : শেড টাইপ বা একচালা ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। খোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থায় হাঁস-মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।

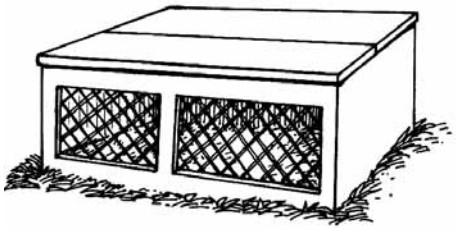

চিত্র : শেড টাইপ ঘর

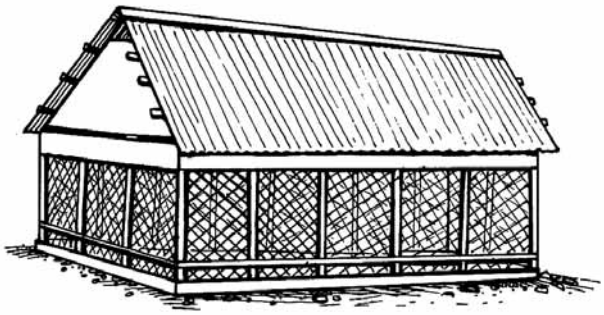

চিত্র : গ্যাবল টাইপ ঘর

গ্যাবল টাইপ : গ্যাবল টাইপ বা দোচালা ঘর তৈরিতে খরচ বেশি হয়। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু থাকে। সাধারণত যেসব AÂ‡j বেশি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী।

ঘরের ডিজাইন যে প্রকারের হোক না কেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মুরগির খামারে নিম্নলিখিত Nimgn থাকবে। যথা-

১। **বাচ্চার ঘর বা ব্রুডার ঘর -**এখানে সদ্য ফোটা ev"Pv‡`i জন্ম থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান, টিকা, লিটার, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়।

২। **বাড়ন্ত হাঁস-মুরগির ঘর বা গ্রোয়ার ঘর** - এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগির ev"Pv‡K ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

৩। **ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির ঘর -**এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগি ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

হ্যাচারি ঘর : যে খামারে বীজ ডিম থেকে ইনকিউবেটরের সাহায্যে ev"Pv ফোটানো হয়, তাকে হাঁস-মুরগির হ্যাচারি খামার বলে এবং যে ঘরে ev"Pv ফোটে তাকে হ্যাচারি ঘর বলা হয়।

ব্রয়লার ঘর : যে খামারে মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগি পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার খামার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার ঘর বলা হয়। ব্রয়লার ঘরে মুরগিকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঘর তৈরিকরণ

ছাদ বা চালা : টিন, অ্যাসবেস্টাস এবং করুগেটেড শিট দিয়ে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটের তৈরি ছাদ সবচেয়ে ভালো। গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামারে শন ও উপযুক্ত গাছের পাতা ব্যবহার করা যাবে।

মেঝে : ঘরের মেঝে শুষ্ক রাখার জন্য পাখিকে ইটের মেঝে বা মাচার উপর রাখা উত্তম।

দেয়াল : মুরগির ঘরের দেয়াল মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইট, তারের নেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। দেয়ালের D"PZv ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ০.৩ মিটার (১ ফুট) ও লেয়ারের ক্ষেত্রে ০.৬ মিটার (২ ফুট) পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। আর

দেয়ালের উপরের অংশে তারের নেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে শীতের দিনে উপরের নেটের অংশটুকু চটের e¯—¦ বা ত্রিপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা: হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের দরজা আকারে বড় হওয়া উচিত।

জানালা: ঘরের লম্বালম্বি পাশে নেট খাকায় জানালা থাকে না। তবে, প্রস্থ পাশ দেয়াল দ্বারা বন্ধ থাকলে জানালা দিতে হবে।

হাঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গা: ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নিম্নে উলেখ করা হলো।

বয়স (মাস)	প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)		
	লিটার পদ্ধতি	খাঁচা পদ্ধতি	মাচা পদ্ধতি
০-১	০.০৫	০.০২	০.০২
১-২	০.১৪	০.০৩	০.০৩
২-৩	০.১৯	০.০৫	০.০৫
৩-৪	০.২৩	০.০৫	০.১০
বয়স্ক পাখি	০.২৮	০.০৭	০.১৯

নতুন শব্দ : আবাসন, শেড টাইপ ঘর, গ্যাবল টাইপ ও হ্যাচারি ঘর ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির খাদ্য

দেহের বৃদ্ধি, ভরণপোষণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দানা শস্য ও এদের DcR¦Zmgn গৃহপালিত পাখির খাদ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় খাতে। নিম্নে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

১। দানাশস্য ও এদের DcR¦Zmgn তাজা ও মানসম্মত হতে হবে।

২। খাদ্যে পাখির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে।

৩। খাদ্য জীবাণু, ছত্রাক ও পরজীবী মুক্ত হতে হবে।

৪। অনেক উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য c¯‘Z করতে হবে।

৫। খাদ্য হজমযোগ্য ও সহজপাচ্য হবে।

৬। খাদ্য খুব সুস্বাদু হতে হবে।

৭। খাদ্যের উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।

৮। খাদ্যকে যে কোনো প্রকার `MÜg³ হতে হবে।

৯। খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।

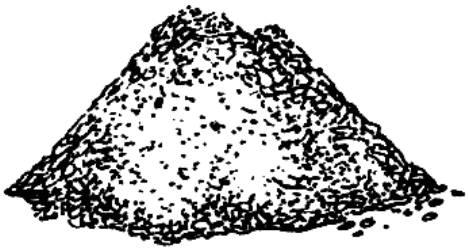

চিত্র : ফিস মিল

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে পাখির রেশন তৈরি করা হয়। রেশন n‡"Q ২৪ ঘণ্টায় কোনো পশু বা পাখি দ্বারা গৃহীত খাদ্য। রেশন অবশ্যই পুষ্টি উপাদানে সুষম হতে হবে। যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন উপস্থিত থাকে তাকে সুষম রেশন বলে। সুষম খাদ্য বা রেশনের কাজ নিম্নে দেওয়া হলো।

১। খাদ্য বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

২। খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়।

৩। খাদ্য দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪। দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।

৫। দেহ কোষের ¶qciY ও বৃদ্ধি সাধন করে।

৬। দেহের পানির সমতা রক্ষা করে।

৭। দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

৮। দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।

৯। ডিম ও মাংস উৎপাদনে সাহায্য করে।

চিত্র : ঝিনুক শামুকের গুঁড়া

মুরগির খাদ্য

যেহেতু মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাই ডিমপাড়া মুরগি ও ব্রয়লার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক রেশন তৈরি করা হয়। ডিমপাড়া মুরগি বা লেয়ার মুরগির ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। লেয়ার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। বাড়ন্ত মুরগির রেশন : ৯-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ডিমপাড়া বা লেয়ার মুরগির রেশন: ২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত

ব্রয়লার মুরগিকে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়:

১। ব্রয়লার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন: ০-২ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। ব্রয়লার গ্রোয়ার বা বাড়ন্ত ev"Pvi রেশন: ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ব্রয়লার ফিনিশার রেশন: ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত

খাদ্য উপকরণ: পাখির খাদ্য তৈরিকে প্রধানত দানাশস্য ও এদের উপজাত ব্যবহার করা হয়। রেশন তৈরির জন্য দানাশস্য হিসাবে প্রধানত গম, ভুট্টা ও fim ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বসতবাড়িতে পারিবারিক মুরগি পালনে যে কোনো শস্যদানা যেমন, ধান, চাল, খুদ, ডাল, সরিষা ইত্যাদি পাখিকে খেতে দেওয়া হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও বাজারদর বিবেচনা করে রেশন তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে পুষ্টি উপাদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
শর্করা	গম, ভুট্টা, ধান, চাল, চালের কুড়াঁ, গমের ভুসি ইত্যাদি।
আমিষ	শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল, রক্তের গুঁড়া ইত্যাদি।
স্নেহ	বিভিন্ন উদ্ভিজ তৈল যেমন: পাম তৈল, তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, ঝিনুক খোসা চূর্ণ, হাঁড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুদ্ধ জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

মুরগির খাদ্য গ্রহণ: লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মুরগির জাত, পাখির বয়স, তাপমাত্রা, খাদ্যের মান, বাসস্থান, খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	মুরগি (গ্রাম/দিন)	ব্রয়লার (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১০	২৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২০	৬৫
তৃতীয় সপ্তাহ	২৫	১০০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩০	১৩০
পঞ্চম সপ্তাহ	৩৫	১৬০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৩৭	১৬৫
সপ্তম সপ্তাহ	৪০	----
অষ্টম সপ্তাহ	৪৫	----
বাড়ন্ত	৭০	----
বয়স্ক	১১৫	----

কাজ

১০০টি বাড়ন্ত লেয়ার মুরগি ৭দিনে কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

গম বা ভুট্টাকে প্রথমে মিলে ভেঙে নিতে হবে। খৈলকেও ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। খাদ্য উপকরণ মাপার পালা-ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য তৈরির জায়গা পরিষ্কার cwi"Qb হতে হবে। প্রথমে গম বা ভুট্টা মেপে মেঝেতে ঢালতে হবে। তারপর চালের মিহিকুঁড়া ও গমের ভুসি, ভুসির উপর শুঁটকি মাছের গুঁড়া, তার উপর খৈল ও সয়াবিন মিল ঢালতে হবে। এভাবে সবগুলো উপকরণ ঢালার পর খাদ্যের ¯ÍcwU‡K একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার ঝিনুকের গুঁড়া, হাঁড়ের গুঁড়া ও লবণ ঐ পিরামিডের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এবার আধা কেজি খাদ্য আলাদা করে নিয়ে তার মধ্যে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। এরপর মিশ্রিত ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পিরামিডের উপর mg¯— খাদ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। সয়াবিন তৈল দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার খাদ্যে ¯—cwUi wভতরে বার বার হাত ঢুকিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালো ভাবে মিশিয়ে করে নিতে হবে। মিশ্রিত এ খাদ্য বাদামি রঙের দেখাবে।

হাঁস-মুরগির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাধুনিক ফিড মিলে তৈরি করা হয়। পাখির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে বাজারে ম্যাশ (পাউডার), ক্র্যাম্বল (দানা) ও পিলেট (বড়ি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বয়সের লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকা:

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন (%)	বৃদ্ধি রেশন (%)	লেয়ার রেশন(%)
গম/ভুট্টা ভাঙা	৫২.০	৪৮.০	৫০.০
গমের ভুসি	৮.০	৮.০	৬.০
চালের মিহিকুঁড়া	১১.০	১৫.০	১৫.০
তিলের খৈল	১২.০	১১.০	৮.০
শুটকি মাছের গুঁড়া	১৩.০	১২.০	১২.০
হাঁড়ের গুঁড়া	১.৫	৩.০	২.৫
ঝিনুক চূর্ণ	২.০	২.৫	৬.০
লবণ	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

বিশেষ দ্রষ্টাব্য:

১। ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার মুরগির খাদ্য তালিকা:

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন (%)	বৃদ্ধি রেশন (%)
গম/ভুট্টা ভাঙা	৫০	৫২
চালের মিহি কুঁড়া	১৫	১২
তিলের খৈল	১২	১০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১৪	১২
সয়াবিন মিল	৮	৯
সয়াবিন তৈল	-	২
হাঁড়ের গুঁড়া	১.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০

কাজ :

শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০০টি ব্রয়লার মুরগির ১৪ দিনের প্রারম্ভিক রেশন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিশেষ দ্রষ্টাব্য:

১। **ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ :** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। **জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি :** পর্যাপ্ত পরিমাণ

নতুন শব্দ : ভরণপোষণ স্টার্টার রেশন, গ্রোয়ার রেশন, ফিনিশার রেশন, লেয়ার রেশন। ম্যাশ, ক্র্যাম্বলও পিলেট খাদ্য।

হাঁসের খাদ্য

হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। এরা খাল, বিল, পুকুর, হাওর ও নদীর ছোট জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। হাঁস তৃণলতা এবং খাবারের Dw"Qóvsk খেয়ে ভালো উৎপাদন দিতে পারে। হাঁসের খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। হাঁসকে শুষ্ক খাদ্যের চেয়ে ভেজা খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। তাই এদেরকে সবসময় গুঁড়া ও ভেজা খাদ্য দেওয়া উচিত। প্রথম ৮ সপ্তাহ হাঁসকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে দুবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। হাঁসের ev"Pv‡K জন্মানো পর প্রথম কয়েক দিন হাতে তুলে খাওয়াতে হয় যাতে করে ev"Pviv খাবার খাওয়া শিখতে পারে।

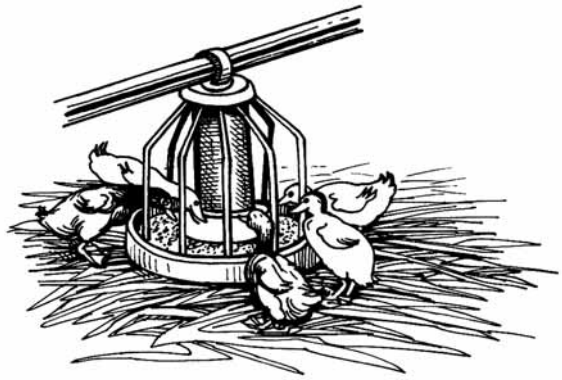

wPÎ : nv‡mi ev"Pv Lv`¨ Lv‡"Q

wPÎ : nvm‡K Lv`¨ †`Iqv n‡"Q

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসের রেশন তৈরি করা হয়। হাঁসের ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

১। হাঁসের ev"Pvi বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। বাড়ন্ত হাঁসের রেশন : ৫-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ডিমপাড়া হাঁসের রেশন : ২০ সপ্তাহ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত

হাঁসের খাদ্য গ্রহণ : হাঁসকে বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান ও খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	হাঁস (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৫
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩৫
পঞ্চম সপ্তাহ	৪০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৪৫
সপ্তম সপ্তাহ	৫০
অষ্টম সপ্তাহ	৫৫
বাড়ন্ত	৮৫
বয়স্ক	১২৫

কাজ :

একটি বয়স্ক হাঁস ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত মোট কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রেশন

খাদ্যদ্রবের নাম	প্রারম্ভিক রেশন (%)	বৃদ্ধি রেশন (%)	লেয়ার রেশন (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৫০	৪৫	৪০
ধানের কুঁড়া	১৮	২০	২০
খৈল	১৬	১৭	১৮
সয়াবিন মিল	৬	৭	৭
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮	৮	৮
শামুকের খোসা PY	১.৫	২.৫	৬.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশুর আবাসন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুকে আশ্রয় প্রদানকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলা হয়। পশুকে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাসস্থান বা গোয়াল ঘর বলে। পশুর বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। গোয়াল ঘরে পশুকে সব সময় পশুকে আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে আলো বাইরে ঘুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

আবাসনের উদ্দেশ্য

১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২। পশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য।
৩। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা।
৪। পোকা-মাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা।
৫। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা।
৬। পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেয়া।
৭। পশুকে শান্ত করা।
৮। গর্ভবর্তী, cmwZ ও ev"Pvi সঠিক পরিচর্যার জন্য।
৯। পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা।
১০। দক্ষতার সাথে দুগ্ধ গহণ করা।
১১। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা।
১২। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
১৩। সময়মতো চিকিৎসা সেবা দেওয়া।
১৪। সহজে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা।
১৫। গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা।
১৬। উৎপাদন খরচ কমানো।

পশুর আবাসনের স্থান নির্বাচন করা

পশুর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বcY বিষয়। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে খামার লাভজনক করা যায় না। পশুর আবাসন gjab ও পশুর সংখ্যার সাথে m¤úKh³| গৃহপালিত পশুর আবাসন বা বাসস্থান এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকে।

১। উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা হতে হবে।
২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে একটু `‡i হবে।
৩। দুধ ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।
৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকবে।
৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকবে।
৬। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন হতে হবে।
৭। গোয়াল ঘরে যেন mhv‡jvK পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৮। গোয়াল ঘরের চার পাশ পরিষ্কার হবে।

৯। পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

১০। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে।

গরুর আবাসন

গুরুর আবাসনের জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো গোশালা বা গোয়াল ঘরে বেঁধে পশু পালন করা। গোয়াল ঘরের আকার পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পশুর সংখ্যা ১০ এর কম হলে ১ সারি বিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।

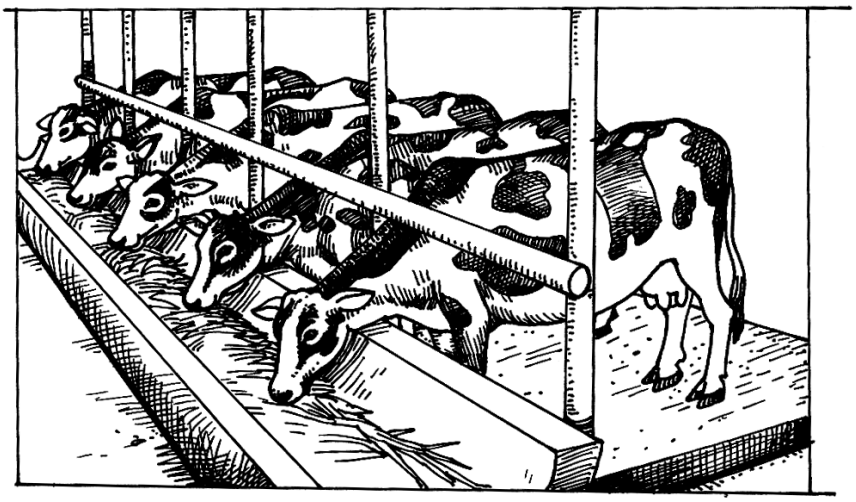

গুরুর আবাসন

ভেড়ার আবাসন

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বcY নয়। কারণ এরা খাবারের জন্য সরাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবুও অধিক পশম ও মাংস উৎপাদনের জন্য এদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। ভেড়া পালনের জন্য তিন ধরনের বাসস্থান ব্যবহার করা হয়। যথা,

ক. উন্মুক্ত খ. আধা উন্মুক্ত ও গ. আবদ্ধ ঘর।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করে ঘরের মেঝে ভূমি সমতলে বা মাচার তৈরি হয়ে থাকে।

ক. উন্মুক্ত ঘর ঃ যেসব AÂ‡j বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে উন্মুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন চরে খাওয়ার পর রাতে ভেড়ার পাল এখানে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঝেতে খড় ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা-উন্মুক্ত ঘর ঃ উন্মুক্ত ঘরের নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ছাদসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আধা-উন্মুক্ত ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় সেখানে আধা-উন্মুক্ত ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. আবদ্ধ ঘরঃ যেসব AÂ‡j প্রচুর ঝড়, বৃষ্টি হয় সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবদ্ধ ঘরের পুরো অংশেই ছাদ থাকে। ঘরের পাশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ ঘরের মেঝে পাকা ও আধা পাকা হয়ে থাকে।

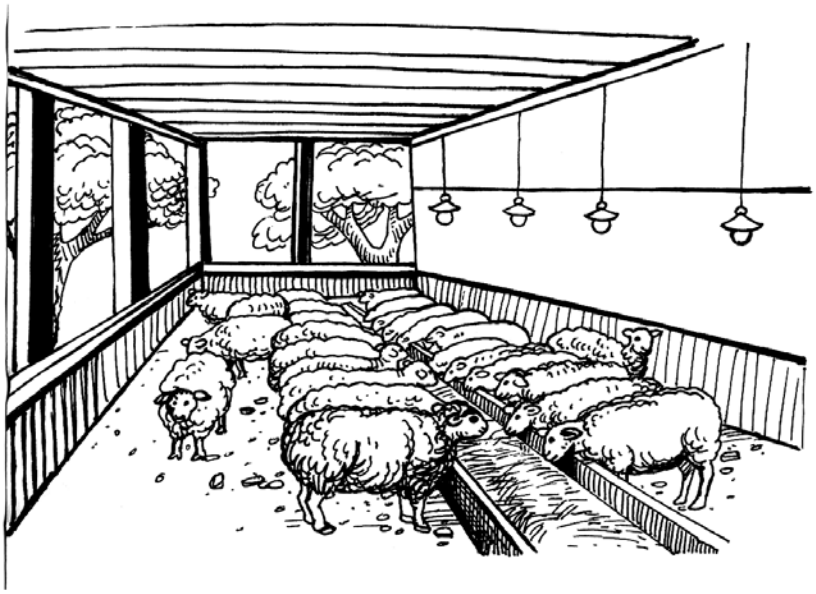

চিত্র : ভেড়ার আবদ্ধ ঘর

নতুন শব্দ : ভেজা খাদ্য, Dw"Qóvsk, শস্যদানা ও গ্রিট মিশ্রণ।

নবম পরিচ্ছেদ

গবাদিপশুর খাদ্য

প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আবশ্যক। যা কিছু দেহে আহার্যরূপে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন- গম, ভুট্টা, ঘাস, খৈল, ভুসি ইত্যাদি।

প্রচলিতভাবে গবাদি পশুর খাদ্যকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আঁশ জাতীয় খাদ্য (Roughage feed)

২। দানাদার খাদ্য (Concentrate feed)

আঁশ জাতীয় খাদ্য :

রাফেজজাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আঁশ (Fiber) এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। যেমন- যে কোনো খড়, প্রাকৃতিক বা চাষ করা সবুজ ঘাস, হে, সাইলেজ প্রভৃতি।

রাফেজ জাতীয় ঘাস গবাদিপশু PviYfwg থেকে পেয়ে থাকে বা ঘাস কেটে পশুকে সরবরাহ করা হয়। ZjbvgjK বিচারে লিগিউম জাতীয় ঘাস যেমন-আলফা-আলফা, কাউপি, খেসারি, মাসকলাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সাধারণ ঘাসের চেয়ে বেশি থাকে। সাধারণ ঘাসের মধ্যে ভুট্টা,

নেপিয়ার, পারা, জার্মান প্রভৃতি প্রধান। এ জাতীয় ঘাসের সুবিধা হলো হেক্টর প্রতি এর ফলন অন্যান্য ঘাসের চেয়ে বেশি থাকে।

দানাজাতীয় খাদ্য :

যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাকে দানাদার খাদ্য বলা হয়। দুধাল বা মাংস উৎপাদনকারী গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শুধু আঁশজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করলে Kw•¶Z ফল পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

দানাজাতীয় খাদ্যকে নিম্নোক্ত উপায়ে ভাগ করা যায়-

ক) প্রাণিজ উৎস-ফিসমিল, বাড্‌মিল, ফেদার মিল প্রভৃতি।

খ) উদ্ভিজ উৎস-গম, ভুট্টা, বার্লি, সরগাম, খুদ, খৈল, কুঁড়া, fwm প্রভৃতি।

এ ছাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যে খনিজ উপাদান হিসাবে কিছু ঝিনুকের গুঁড়া, ডিমের খোসার গুঁড়া, হাঁড়ের গুঁড়া প্রভৃতি, ভিটামিন হিসাবে পাতাজাতীয় সবজি, ভিটামিন- মিনারেল প্রিমিক্স এবং খাদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে কিছু এন্টিবায়োটিক, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রাপ্যতা ঋতু ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । সবুজ ঘাস বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় এবং এগুলো যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে সারা বছর সবুজ ঘাসের অপর্যাপ্ততা থাকবে না।

দুই পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ক। সাইলেজ

খ। হে

সাইলেজ :

রসাল অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে। বাণিজ্যিকভাবে সাইলোপিটে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয়। ভুট্টা, সরগাম, আলফা আলফা থেকে c¯—ZKZ সাইলেজে বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়।

সাইলেজ ব্যবহারের সুবিধা :

১। দীর্ঘ দিন পুষ্টিমান অক্ষুন্ন থাকে।

২। সঠিক সময়ে ঘাস কেটে সেগুলো কার্যকরী খাবার হিসাবে গবাদিপশুকে সরবরাহ করা যায়।

৩। এতে হে-এর তুলনায় কম পুষ্টিমান অপচয় হয়।

৪। সাইলেজ তৈরির ফলে ঘাসের জমির m‡e©vPP ব্যবহার করা যায়।

৫। সাইলেজ ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়াতেও তৈরি করা যায়।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি :

বিভিন্ন ধরনের ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরি করা গেলেও ভুট্টা ও আলফা-আলফা দিয়ে তৈরি সাইলেজ অত্যন্ত উন্নত মানের হয়। ভুট্টার সাইলেজ গবাদি পশু বিশেষ করে দুধাল গাভীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভুট্টার সাইলেজে বেশি পরিমাণে শক্তি উপাদান থাকে।

ভুট্টার দানার গোড়ায় কালো দাগ আসার সাথে সাথে সাইলেজ c¯—‡Zi জন্য ভুট্টা কাটার উপযোগী হয়। এ সময়ে ভুট্টা গাছের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৩০-৩৫% হয়। ভুট্টা গাছগুলোকে fwg থেকে ১০-১২ সে.মি. উঁচুতে কাটা হয়। এরপর এগুলোকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। টুকরা করা ঘাস গর্তে বায়ুরোধী অবস্থায় রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে গর্তের পরিবর্তে পলিথিন দিয়ে তৈরি বড় আকারের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। টুকরা করা গাছগুলো ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে বায়ু মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে বাতাস চলাচল করতে না পারে। এভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো পুষ্টি উপাদান না হারিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময়ে পশুকে সরবরাহ করা যায়।

সাইলেজ তৈরির সময় গাছ টুকরা করা ও বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্য :

১। গাঁজনের জন্য বেশি পরিমাণে গাছের সুগার অবমুক্ত হতে পারে।

২। বায়ুরোধী হলে সুষ্ঠুভাবে গাঁজন m¤úw`‡bi জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়।

কোন খাদ্য উপাদানের অপচয় ব্যতিরেকে ঘাস সংরক্ষণের জন্য এটা একটা কার্যকর ব্যবস্থা। সাইলেজ বায়ুরোধী পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অক্ষুন্ন রেখে ক্ষতিকর ইস্ট, মোল্ড, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

হে :

হে অতি পরিচিত এবং গুরুত্বcY সংরক্ষিত খাদ্য যা সারা বছর গবাদিপশুকে সরবরাহ করা যায়। সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে এর আদ্রর্তা ২০% বা তার নিচে নামিয়ে এনে হে c¯‘Z করা হয়। হে তৈরির জন্য এক বা একাদিক লিগিউম জাতীয় ঘাস চাষ করা যায়। লিগিউম ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে। লিগিউম গাছের g‡j রাইজোবিয়া নামক ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ধরে রাখে যা প্রোটিন গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে লিগিউম ছাড়াও সাধারণ ঘাস দিয়ে হে তৈরি করা যেতে পারে।

গুণগত মানের হে-এর বৈশিষ্ট্য:

হে এর খাদ্যমান ঘাসের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। হে-এর গুণগতমান ঘাসের cÖতাপ্রাপ্তি, পাতার পরিমাণ, ঘাসের রং প্রভৃতি দ্বারা gj¨vqb করা হয়ে থাকে।

১। হে এর জন্য ব্যবহৃত ঘাস পাতা সমৃদ্ধ হতে হবে। হে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুষ্ক হতে হবে। পাতার পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে থাকে।

২। হে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ বিদ্যমান থাকে। বেশি আর্দ্রতা থাকার কারণে বা অত্যধিক তাপের কারণে হে বাদামি বর্ণের হতে পারে যেটা পুষ্টি উপাদান কমে যাওয়ার নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩। হে আগাছামুক্ত হতে হবে।

৪। হে মোল্ড ও ধুলা বালিমুক্ত হতে হবে।

৫। এতে খাওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্যcY গন্ধ থাকতে হবে।

হে তৈরির পদ্ধতি :

গাছ কাটার সময় : হে তৈরির জন্য সঠিক cYZv প্রাপ্তির সময়ে গাছ কাটতে হবে। যত কম বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত বেশি হবে। যত বেশি বয়সে গাছ কাটা হবে, হে এর গুণগতমান তত কমে যাবে। তবে ফুল আসার সময় কাটাই উত্তম।

সঠিকভাবে শুকানো : হে তৈরির সময় গাছকে সঠিকভাবে শুকাতে হবে যাতে করে মোল্ড মুক্ত ও অতিরিক্ত তাপমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। গাছগুলোকে দ্রুত শুকাতে হবে এবং অতিরিক্ত m‡hi আলো পরিহার করতে হবে যাতে করে ভালো মানের হে এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা যায়। গাছ কেটে রৌদ্রে উল্টাপাল্টা করে এমনভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে অতিমাত্রায় পাতা ঝরে না যায়। সবুজ ঘাসে সাধারণত ৭৫-৮০ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। যেখানে ভালো মানের হে তে m‡ev"P ২০-২৫ ভাগ আর্দ্রতা থাকে। রোদে শুকানোর সময় বৃষ্টির পানিতে ভেজানো যাবে না।

হে সংরক্ষণ: হে অবশ্যই শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজ

১. শিক্ষার্থীরা আঁশজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে শুধু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে গবাদি পশু পালন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

২. শিক্ষার্থীরা সাইলেজ তৈরি করবে এবং এর ধাপগুলো লিখে জমা দিবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপmgn কী কী?

২. মালচিং কী?

৩. পাংকটন কী? উহা কত প্রকার ও কী কী?

৪. হাঁস-মুরগির খাদ্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

৫. মাছের অভয়াশ্রম বলতে কী বোঝ?

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. বীজ আলু উৎপাদনের a\cmgn বর্ণনা কর ?

২. চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে পুকুরকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক প্রকার পুকুরের বর্ণনা দাও।

৩. মৎস্য সংরক্ষণ আইনের \\e\\amgn বর্ণনা কর।

৪. হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির a\cmgn বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আলুর কোন রোগ ব্যাপক ক্ষতি করে ?

ক. আলুর মড়ক রোগ খ. ঢলে পড়া রোগ

গ. কাণ্ডপচা রোগ ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ

২। পুকুরের পানিতে `ex\fZ অক্সিজেন কমপক্ষে কত ভাগ হওয়া প্রয়োজন ?

ক. ২ মি.গ্রাম/লিটার খ. ৩ মি.গ্রাম/লিটার

গ. ৫ মি.গ্রাম/লিটার ঘ. ৭ মি.গ্রাম/লিটার

৩। গোল আলুর মড়ক রোগ দেখা দেয় –

i. নিম্ন তাপমাত্রায়

ii. ঘন কুয়াশায়

iii. অতিরিক্ত বৃষ্টির সময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফরিদা বেগম তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের ১৫ শতকের একটি পুকুর মাছ চাষের জন্য c¯‘Z করেন। তিনি তার পুকুরে উপযুক্ত মাত্রায় সার ও চুন প্রয়োগ করেন। পোনা ছাড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ পোনাই মারা গিয়েছে।

৪। ফরিদা বেগমের পুকুরের জন্য কত কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে?

ক. ২০ কেজি খ. ২৫ কেজি

গ. ৩০ কেজি ঘ. ৩৫ কেজি

৫। পুকুরের পোনা মারা যাওয়ার কারণ–

i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য

ii. তিকারক পরজীবীর আক্রমণ

iii. অক্সিজেনের ভিন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কনক বড়ুয়া পশু পালনের জন্য চারণ fwg তৈরি করেছেন। বর্ষা মৌসুমে তার চারণ fwg‡Z ব্যাপক হারে ঘাস উৎপাদন হলেও শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের চাহিদা মেটাতে পারেন না। এজন্য তার পশুগুলোর সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যর জন্য কাঁচা ঘাসের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। এরপর কনক বড়ুয়া তার প্রতিবেশী অনেককেই উক্ত পদ্ধতিতে গো-খাদ্য সংরক্ষণের উদ্বুদ্ধ করলেন।

ক. গো- খাদ্য কাকে বলে?

খ. দানাজাতীয় খাদ্য কীভাবে পশুর উৎপাদন বাড়ায় ব্যাখ্যা কর।

গ. কনক বড়ুয়ার গৃহীত পদ্ধতিটির তৈরি কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কনক বড়ুয়ার কার্যক্রমটি gj¨vqb কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে cÖZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব m¤ú‡K বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

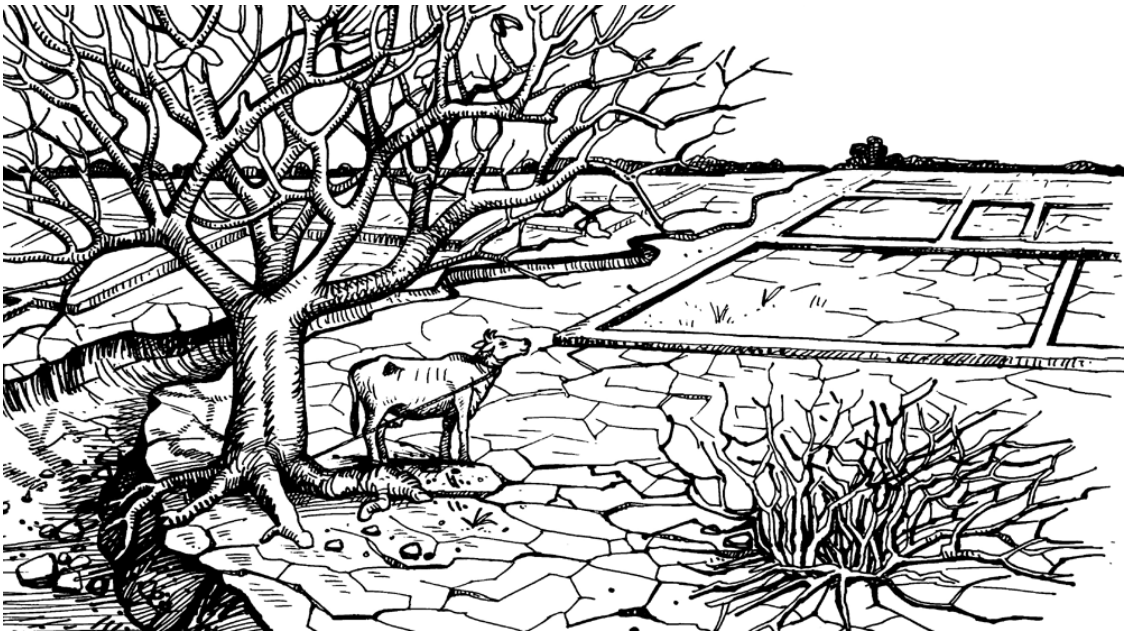

এ অধ্যায় পড়া শেষে আমরা–

- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রের (ফসল, মৎস্য ও পশুপাখি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব gj¨vqb করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশুপাখির অভিযোজনের উপযোগিতা gj¨vqb করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা cwZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া m¤ú‡K জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের cwZKj বা বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়া, গ্রীষ্মকালে অতি D"P তাপমাত্রা, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলো বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে cwZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া। cec¯'wZ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের cwZKj পরিবেশ বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিরূপ আবহাওয়া বা cwZKj পরিবেশে ফসল উৎপাদনের ce শর্ত হলো উপযোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন। বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া বা cwZKj পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের cwZKj পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত বের করেছেন এবং আরও জাত বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে hw‡"Qb| আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের cwZKj আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শৈত্য সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের চরম সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে m‡ev"P তাপমাত্রার গড় ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়লে এবং শৈত্যতা দীর্ঘস্থায়ী হলে শীতকালীন ফসল, যেমন–গোলআলু ও গমের ফলন ভালো হয়। তবে রোপা আমন ও বোরো ধানের পরাগায়ণ ও দানা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়লে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে চিটা হয়ে ফলন কমে যায়। এ সময় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে এবং কয়েকদিন এ অবস্থা স্থায়ী হলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ করতে হবে। নিচে শৈত্য-সহিষ্ণু ধানের দুটি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ক) ব্রিধান ৩৬ : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ঠাণ্ডাপ্রবণ এলাকার জন্য এ জাতটি বের করে। ১৯৯৮ সালে জাতটি ব্রি ধান ৩৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বোরো মৌসুমের আগাম এ জাতটির গাছের উ"চতা ৯০-৯৫ সেমি, জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ৫.০-৫.৫ টন। বীজ বপনের সময় যে সব এলাকায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় সেসব এলাকার জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

খ) ব্রিধান ৫৫ : এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগাম ও D"Pdjbkxj এ জাতের গাছের D"PZv ১০০ সেমি, বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭ টন এবং আউশ মৌসুমে ৪.৫ টন। বোরো মৌসুমে জাতটি মাঝারি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। তাছাড়া জাতটি মাঝারি লবণাক্ততা এবং খরাও সহ্য করতে পারে। জাতটির জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১০০ দিন।

খরা সহিষ্ণু ফসল

আমরা জানি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে জমিতে মৃত্তিকা পানির ঘাটতি দেখা যায়। ফলে উদ্ভিদ দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি

দেখা দেয়। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। প্রতিবছর দেশে রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় খরার সম্মুখীন হয়। এতে করে খরার তীব্রতা অনুযায়ী ১৫-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল চাষের কলাকৌশল m¤ú‡K আমরা অষ্টম শ্রেণিতে we¯—wiZ জেনেছি। সেসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো খরা প্রবণ এলাকায় খরা সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত চাষ করা। সাধারণত খরা সহিষ্ণু ফসলের gj খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং Mfxigjx হয়। এ সব ফসলের পাতা ছোট, সরু, পুরু বা পেঁচানো হয়ে থাকে। খেজুর, কুল, অড়হর, তরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরা সহিষ্ণু ফসল। এখন আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি খরা সহিষ্ণু ফসলের জাত m¤ú‡K আলোচনা করবো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খরা-সহিষ্ণু শৈত্য-সহিষ্ণু ফসলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে এবং খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খরা সহিষ্ণু ধানের জাত :

ব্রিধান ৫৬ : রোপা আমন ধানের এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। গাছের D"PZv ১১৫ সেমি, জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। প্রজনন পর্যায়ে m‡ev"P ১০-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেক্টরপ্রতি ৩.৫-৪.০ টন এবং খরা না হলে ৪.৫-৫.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রিধান ৫৭ : এ জাতটিও রোপা আমন। গাছের D"PZv ১১০-১১৫ সেমি, জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। প্রজনন পর্যায়ে m‡ev"P ৮-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেক্টরপ্রতি ৩.০-৩.৫ টন এবং খরা না হলে ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম বলে এরা খরা সহ্যের পাশাপাশি খরা এড়াতেও পারে।

খরা সহিষ্ণু গমের জাত :

বারি গম ২০ (গৌরব) : গমের এ জাতটি মধ্যম খাটো, স্বল্পময়াদি ও D"P ফলনশীল। জাতটির পাতা সরু, মধ্যম খাড়া ও গাঢ় সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১০৮ দিন এবং ফলন ৩.৫-৪.৬ টন/হেক্টর। জাতটি তার জীবনকালের শেষের দিকে D"P তাপমাত্রা ও খরা সহ্য করতে পারে।

চিত্র : বারি গম ২০

বারি গম ২৪ (প্রদীপ) : এ জাতটি মধ্যম খাটো, D"P ফলনশীল এবং খরা সহিষ্ণু। এ জাতের পাতা চওড়া, বাঁকানো ও হালকা সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১১০ দিন এবং ফলন ৪.৩-৫.১ টন/হেক্টর।

খরা সহিষ্ণু আখের জাত :

ঈশ্বরদী ৩৩ : খরা সহিষ্ণু এ জাতে D"Pমাত্রায় চিনি বিদ্যমান। জাতটি আগাম পরিপক্ব এবং ফলন গড়ে ১০০ টন/হেক্টর।

ঈশ্বরদী ৩৫ : এ জাতটিও ঈশ্বরদী ৩৩ এর মতো এবং ফলন ৯৪ টন/হেক্টর। আখের অন্যান্য খরা সহিষ্ণু জাতের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯, ঈশ্বরদী ৪০ ইত্যাদি।

খরা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত :

বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) : হালকা সবুজ রঙের এ জাতের গাছের D"PZv ৫০ সেমি, বীজ ছোট, মসৃণ ও ami বাদামি রঙের, জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিনের এবং ফলন ২.৪ টন/হেক্টর হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ জাতের ছোলা বপন করতে হয়। খরা সহিষ্ণু অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে বারি বার্লি-৬, বারি বেগুন-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও ৪, সবজি †g¯—v ইত্যাদি।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল

লবণাক্ত মাটি থেকে ফসলের পানি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে ফসল জন্মাতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের `w¶YvÂ‡ji DcKjxq এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি cv‡"Q| এ জন্য DcKjxq এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। নিচের ছকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও লবণাক্ততায় সংবেদনশীল কিছু ফসলের তালিকা দেওয়া হলো :

উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	মধ্যম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	লবণাক্ততা সংবেদনশীল
নারিকেল	মিষ্টি আলু	শিম
সুপারি	গোল আলু	লেবু
তাল	মরিচ	কমলা
বার্লি	বরবটি	গাজর
খেজুর	মুগ	পিয়াজ
সুগারবিট	খেসারি	স্ট্রবেরি
শালগম	মটর	মসুর
তুলা	যব	আম
ধৈঞ্চা	ভুট্টা	ডালিম
পালংশাক	টমেটো	
	আমড়া	
	পেয়ারা	

DcKjxq লবণাক্ততা এলাকায় ধান প্রধান ফসল। ধানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে-যাতা, রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গরচা, গাবুরা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ধান বের করেছে। এ সব জাতের প্রধান বৈশিষ্টগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

ব্রিধান ৪০ ও ব্রিধান ৪১ : ২০০৩ সালে এ জাত দুটি আমন মৌসুমের জন্য অনুমোদিত হয়। এ জাতগুলো চারা ও থোড় অবস্থায় মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে, গাছের D"PZv ১১৫ সেমি, জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.০-৪.৫ টন। DcKjxq যেসব এলাকায় রাজাশাইল, কাজলশাইল ইত্যাদি স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষ করা n‡"Q সেসব জমিতে এ জাত দুটো চাষ করলে দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যায়। জাত দুটো আলোক সংবেদনশীল বলে প্রয়োজনে ৩০-৫০ দিনের চারা ২৫-৩০ সেমি পানিতে সহজেই রোপণ করা যায়।

ব্রিধান ৪৭ : ২০০৬ সালে এ জাতটি লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এ জাত চারা অবস্থায় বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটির গাছের D"PZ¥ ১০৫ সেমি, জীবনকাল ১৫২ দিন এবং লবণাক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৬ টন ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রিধান ৫৩ : DcKjxq লবণাক্তপ্রবণ এলাকা, বিশেষ করে চিংড়িঘের এলাকা এবং মাঝারি নিচু জমিতে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য এ জাতটি ২০১০ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগাম এ জাতটির গাছের D"PZ¥ ১০৬ সেমি, জীবনকাল ১২৫ দিন এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫.০ টন। বর্ধনশীল ও প্রজনন পর্যায়ে এ জাতটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

ব্রিধান ৫৪ : এ জাতটিও লবণাক্ত AÂj এবং মাঝারি নিচু AÂ‡j আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। আগাম এ জাতটির গাছের D"PZ¥ ১১৫ সেমি, জীবনকাল ১৩৫ দিন এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৫.৫ টন। বর্ধনশীল ও প্রজনন পর্যায়ে এ জাতটিও মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

বিনা ধান ৮ : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ২০১০ সালে লবণাক্ততা সহনশীল এ জাতটি বের হয়। বোরো মৌসুমের এ জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। লবণাক্ত এলাকায় হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.৫ টন। জাতটির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা সমুদ্র উপKলবর্তী এলাকায় চাষ উপযোগী লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত :

বারি আলু ২২ (সৈকত) : ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এ জাতের আলু বের হয়। এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোল এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

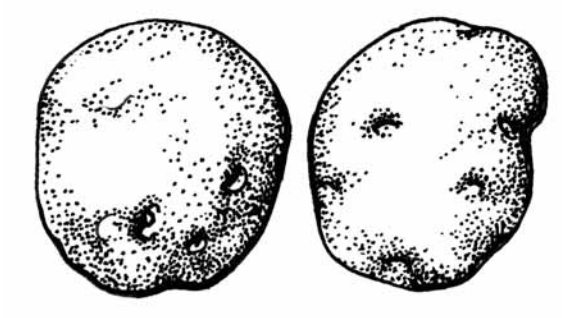

চিত্র : বারি আলু ২২

বারি মিষ্টি আলু-৬ ও ৭ : এ জাত দুটোর আলুর খোসার রং গাঢ় কমলা রঙের, ভিতরটা হালকা কমলা রঙের। আলুতে মধ্যম মাত্রায় ক্যারোটিন এবং শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসল সংগ্রহ করতে ১২০-১৩৫ দিন সময় লাগে। জাত দুটি সাধারণ পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন এবং লবণাক্ত পরিবেশে ১৮-২০ টন ফলন দিতে পারে।

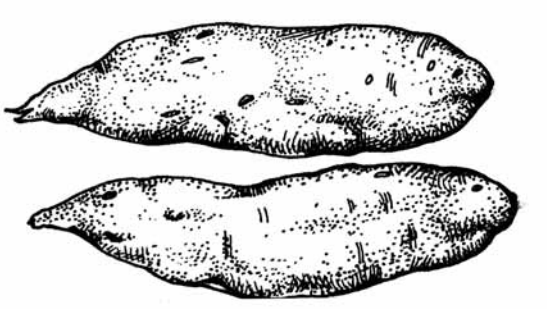

চিত্র : বারি মিষ্টি আলু ৬

বারি সরিষা-১০ : এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, D"PZv ৮০-১০০ সেমি, জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু আখের জাত :

ঈশ্বরদী ৩৯ : D"P ফলনশীল এ জাতটিতে D"P মাত্রায় চিনি পাওয়া যায়। AÂj ভেদে ফলন ৮০-৯০ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি বন্যা ও খরা সহ্য করতে পারে। গুড় উৎপাদনের জন্য জাতটি ভালো।

ঈশ্বরদী ৪০ : ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের মতো এ জাতটিতেও D"Pমাত্রায় চিনি পাওয়া যায়। D"P ফলনশীল এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা ¸Ymxúb Ges AÂj ভেদে ফলন ৮৫-৯৫ টন/হেক্টর। এ জাতটিও লবণাক্ততার পাশাপাশি বন্যা ও খরা সহ্য করতে পারে।

চিত্র : ঈশ্বরদী ৪০

বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কম-বেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদীবাহিত বন্যা ও অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় দেশের ga¨vÂj, Xj eb¨vq †`‡ki DËi-cevÂj Ges R‡jv"Qvmজনিত বন্যায় দেশের DcKjxq AÂj বিভিন্ন মাত্রায় পাবিত হয়। দেশের ফসলি জমির প্রায় ১২.৩০ লাখ হেক্টর তীব্র বন্যা প্রবণ এবং ৫০.৫০ লাখ হেক্টর মাঝারি বন্যা প্রবণ জমি। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের ২৬ লাখ হেক্টর জমি পাবিত হয়। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু AÂ‡j স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন–খুলনা ও যশোর জেলার ভবদহ এলাকা। বন্যার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, জলজ উদ্ভিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে না।

দেশের we¯—Z বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানের মধ্যে রয়েছে– বাজাইল ও ফুলকড়ি। বন্যার পানির D"PZv বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান গাছের D"PZvl বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে। উঁচু জাতের আমন ধানের মধ্যে আছে ব্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জোয়ার-ভাটা AÂ‡j ৫০ সেমি D"PZvi পাবন সহ্য করতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নাবী জাতের আমন ধান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। নাবী জাতের মধ্যে রয়েছে–বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারী)। কিরণ এবং নাইজারশাইল চালের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে এবং ফলন নাইজারশাইলের চেয়ে দ্বিগুণ হয়। কিরণ ও দিশারী জাত দুটো দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা AÂ‡j ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। ফলে উঁচু জোয়ার থেকে ফসল বাঁচে। দিশারী জাতটি কিছুটা লবণাক্ততাও সহ্য করতে পারে। এ কারণে জাতটি খুলনা ও বাগেরহাট AÂ‡j রোপা আমনে খুবই জনপ্রিয়। দেশের DËi-cevÂ‡ji ঢল বন্যা প্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে ধান পাকার সময় বন্যার আশঙ্কা থাকে। এ জন্য এখানে সঠিক সময়ে আগাম পাকে এমন জাতের D"P ফলনশীল বোরো ধান যেমন– ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৫ চাষ করতে হবে। আমন মৌসুমে এ এলাকায় চাষাবাদের জন্য সম্প্রতি বের হওয়া জাত দুটি হলো–

ব্রিধান ৫১ : ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১০ সালে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের গাছের D"PZ¨ ৯০ সেমি, পাকা ধানের রং সাদাটে। এ জাতটির চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১০-১৫ দিন পানির নিচে ডুবে থাকলেও চারা মরে না বিধায় ফলন কমে না। বন্যামুক্ত পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যাকবলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফলন ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

ব্রিধান ৫২ : এ জাতটিও ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১০ সালে অনুমোদন লাভ করে। জাতটির গাছের D"PZ¨ ১১৬ সেমি, চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর ১২-১৪ দিন পানির নিচে ডুবে থাকতে পারে। বন্যামুক্ত পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যা কবলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফলন ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

জলাবদ্ধতা বা বন্যা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত :

আখের জাত:

ঈশ্বরদী ৩২ : বন্যা বা জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এ জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ১০৪ টন।

ঈশ্বরদী ৩৮ : এ জাতের আখে D"Pমাত্রায় চিনি থাকে। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণ m¤úb| জাতটির ফলন ১১৩ টন/হেক্টর এবং D"Pমাত্রায় বন্যা সহিষ্ণু। এ জাতগুলো ছাড়াও ঈশ্বরদী ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০ জাত উঁচু মাত্রায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

কেনাফের জাত :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কেনাফ পাটের মতো একধরনের আঁশ ফসল। এ জাতের কেনাফের পাতা অখণ্ড ও বট পাতার ন্যায় এবং ফলন ৩.৫ টন/হেক্টর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : শৈত্য সহিষ্ণু ফসল, বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস উপযোগী হয়ে ওঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অত্যন্ত ধীর গতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিগত এক শতকে পৃথিবীর অনেক দেশে জলবায়ুর উলেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা h¨‡"Q| বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। নগরায়ণ, যান্ত্রিক সভ্যতা, কলকারখানার প্রসার, জ্বালানি তেল ও কয়লার h‡_"Q ব্যবহার, বৃক্ষনিধন ইত্যাদির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ

বাড়ছে। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ¶wZM¯— ও বিপদাপন্ন দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (২০০৭-০৮) বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ ¶wZM¯— হবে। ভৌগলিক অবস্থান এবং f-cvKwZK বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। IPCC (Inter Governmental Pannel on Climate Change) সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে–

১. বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৯৮৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে মে মাসে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. বাংলাদেশের ৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে।

৩. বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে অর্থাৎ ভয়াবহ বন্যার সংখ্যা বেড়েছে।

৪. বঙ্গোপসাগরে NwYS‡oi সংখ্যা বেড়েছে।

৫. গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

দেশের পরিবেশ ও উৎপাদন †c¶vcUmgn বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ¶wZM¯— ও SwKcY খাত n‡"Q কৃষি খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি n‡"Q; যেমন–

১. গ্রীষ্মকালে অতি D"P তাপমাত্রা

২. অনিয়মিত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত

৩. অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি এবং তার ফলে জলাবদ্ধতা ও fwgam

৪. শুষ্ক মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত

৫. বন্যার ভয়াবহতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি

৬. আকস্মিক বন্যা ও খরার ফলে ফসলহানি

৭. অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও গরম

৮. উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও fwg¶q

৯. So-R‡jv"Qv‡mi তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি

১০. কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে।

ফসল উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি cv‡"Q| পাশাপাশি গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা hv‡"Q| কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে অতি D"P তাপমাত্রা এবং শীতকালে অত্যাধিক শীত পড়তে দেখা hv‡"Q| তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমে রোগের আক্রমণ বেড়ে যাবে। এখনকার চেয়ে দেশের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসল উৎপাদনে ধস নামবে। ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ধানগাছ সবচেয়ে বেশি কাতর। এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে বোরো ধানের ফলন বাড়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু পানির অভাবের ফলে তা সম্ভব হবে না। নিম্ন তাপমাত্রার কারণে ধানগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধানগাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়। আগাম রোপণ করা বোরো ধান এবং দেরিতে রোপণ করা আমন ধানের ফুল আসা ও পরাগায়ণের সময় তাপমাত্রা হ্রাস পেলে ফলন কমে যায়। ফলে ধানে অতিরিক্ত চিটা দেখা যায়। এ অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে, সঠিক সময়ে চারা রোপণ, তাপমাত্রা সহনশীল ফসল বা ফসলের জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে।

ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে খরা অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ে গড় বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি kb¨Zv সৃষ্টি হয়। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক হারে মাটি থেকে পানি ev®úxfZ হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খরার প্রভাব দেখা দেয়। দেশে প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় কবলিত হয়ে থাকে। ১৯৯৯ সালে বিগত ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খরায় কবলিত হয়। এ সময় একটানা ৪ মাস বৃষ্টিহীন ছিল। ১৯৯৫ সালের পর ২০১০ সালে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়। খরার ফলে সামগ্রীকভাবে ফসলের বৃদ্ধি কমে যায়। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসলের ফলন নির্ভর করে খরার তীব্রতা, খরার স্থিতিকাল এবং ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের উপর। ফসলে ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন–

১. তীব্র খরা (৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

২. মাঝারি খরা (৪০-৭০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

৩. সাধারণ খরা (১৫-৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব m¤ú‡K প্রতিবেদন তৈরি করবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে খরাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন– রবি খরা, খরিপ-১ খরা ও খরিপ-২ খরা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের `¶Y-cðgÂ‡j খরার তীব্রতা বৃদ্ধি c‡"Q| রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশে তীব্র খরা প্রবণ এলাকা। রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা। Z¯—, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার পলল ভূমি এলাকা সাধারণ খরাপ্রবণ এলাকা। তবে বর্তমানে Z¯— নদীতে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে Z¯— অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে ৮৩ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমির শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে আমন ধান চাষ করা হয়। এ আমন ধান বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে চাষ করা হয়। এ মৌসুমে চাষিদের সেচ দেওয়ার কোনো cec¯'Z থাকে না। কিন্তু বর্তমানে এ মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে আমন ধান খরায় কবলিত n‡"Q| বিশেষ করে ধানের ফুলধারণ পর্যায় ও দানা গঠনের সময় খরার ফলে D"P ফলনশীল রোপা আমনের ৪৩-৫০% ফলন ঘাটতি হয়। ধানের ফলন কম হওয়ায় কৃষকেরা ক্ষতিগ্র¯— n‡"Q| এছাড়া খরা আউশ ধান ও বোরো ধান, পাট, ডাল ও তেল ফসল, আলু, শীতকালীন শাক-সবজি এবং আখ চাষকে ক্ষতিগ¯— করে। মার্চ-এপ্রিলের খরা জমি তৈরিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে বোনা আমন, আউশ এবং পাট চাষ যথাসময়ে করা যায় না। মে-জুন মাসের খরা মাঠে দণ্ডায়মান বোনা আমন, আউশ ও পাট ফসলের ক্ষতি করে। আগস্ট মাসের অপরিমিত বৃষ্টিপাত রোপা আমন চাষকে evaM¯— করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কম বৃষ্টিপাত বোনা ও রোপা আমন ধানের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং ডাল ও আলু ফসলের চাষকে দেরি করিয়ে দেয়। শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়, পানির ¯—i নিচে নেমে যায়। অনেক সময় সেচ ও খাবারের পানির অভাব দেখা যায়।

খরাতে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, কম পানি লাগে এমন ফসলের চাষ, জাবড়া প্রয়োগ ইত্যাদি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে। খরা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। খরার কারণে ধান লাগাতে বেশি দেরি হলে নাবি ও খরা সহিষ্ণু জাতের ধান চাষ করতে হবে। আমন ধান কাটার পর খরা সহনশীল ফসল যেমন– ছোলা চাষ, তেল ফসল হিসাবে তিলের চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততার প্রভাব

বাংলাদেশের DcKjxq AÂ‡ji মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব দেখা যায়। ঝড়, R‡jv"Qvm এবং প্রবল জোয়ারের ফলে সৃষ্ট বন্যায় সরাসরি লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ডুবে যাওয়ায় মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির ev®úxfe‡bi মাধ্যমে মাটির নিচের লবণ উপরে উঠে আসে। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ১৯৭৩ সনে ৮.৩৩ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত ছিল। ২০০০ সালে তা বেড়ে দাড়িয়ে হয় ১০.২০ লাখ হেক্টরে। বর্তমানে এর পরিমাণ ১০.৫৬ লাখ হেক্টর। অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮৯ লাখ হেক্টর DcKjxq জমির ৬২.৫২% বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার মাত্রার উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১) খুব সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
২) সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
৩) মধ্যম লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
৪) তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
৫) অতি তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রবণতা মানচিত্রে প্রদর্শন করবে।

১৯৭৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে DcKjxq এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৪৫% এবং ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিগত ৯ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৫%। সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার অনেক নতুন এলাকা লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এ সব এলাকায় কৃষি উৎপাদন উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ধারা আরও বাড়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের D"PZv বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে অনেক এলাকায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এমনিতেই DcKjxq এলাকার প্রায় ৫০% জমি বিভিন্ন মাত্রায় পাবিত হওয়ায় সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। তদুপরি DcKjxq এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল চাষ আরও হুমকির মুখে পড়বে।

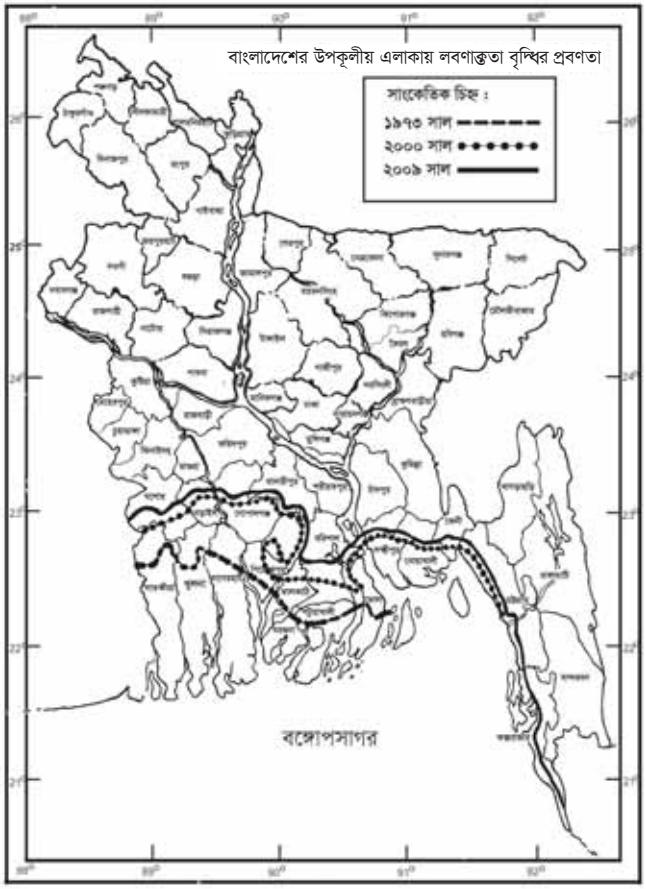

এমতাবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল ফসল এবং ফসলের জাতের চাষ DcKjxq এলাকায় জনপ্রিয় করতে হবে। লবণাক্ত সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমন মৌসুমে বিআর ২৩, ব্রিধান ৪০, ব্রিধান ৪১ এবং বোরো মৌসুমে ব্রিধান ৪৭, বিনা ধান ৮ জাতের চাষ করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে জলাবদ্ধতা বা বন্যার প্রভাব

প্রতি বছর দেশের প্রায় ২৫% জমি বন্যার কারণে বিভিন্ন মাত্রায় পাবিত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদিত দানা শস্যের ৬০ভাগের বেশি এ সময় উৎপাদন হয়। ঘন ঘন বন্যার কারণে কৃষকেরা স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষে বাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ এসব জাত গভীর পানিতে জন্মাতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমালয়ের বরফ গলা পানি, অতিবৃষ্টি এবং সেই সাথে নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি cv‡"Q| ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যার প্রভাব m¤ú‡K জেনেছি। নদীবাহিত ও বৃষ্টিজনিত বন্যা DcKjxq এলাকায় তেমন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু দেশের ga¨vÂ‡ji বন্যাপ্রবণ এলাকায় এর প্রভাব খুব বেশি। ফসল ছাড়াও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করে।

So-R‡jv"QvmRwbZ বন্যা DcKjxq এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করে। জমিতে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে ফসল চাষের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, নীলফামারী ইত্যাদি জেলা ঢল বন্যার শিকার হয়। প্রায় প্রতিবছর এ সব AÂ‡ji হাজার হাজার একর জমির পাকা বোরো ধান কর্তনের আগেই ঢল বন্যায় ¶wZM¯— হয়। দেশের DËi-cevÂ‡ji প্রায় চার হাজার

বর্গকিলোমিটার ও `¶Y-ceÂ‡ji এক হাজার চারশত বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের ঢল বন্যা প্রবণ। ২০০২ সালে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার ১২ টি উপজেলায় ঢল বন্যার কারণে অসংখ্য ঘরবাড়ি এবং প্রায় ৩১৫০০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্র¯— হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বন্যা প্রবণ এলাকা ৬% বাড়বে। এর ফলে গাঙ্গেয় বেসিনে ১১%, মেঘনা বেসিনে ৭% এবং ব্রহ্মপুত্র বেসিনে ২% ফসলহানি হবে এবং ৬৪০০ কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ঝুকির মুখে পড়বে।

বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও বেশি বাঁধ, সুইস গেট নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিবে। এগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। কোনো রকম ভুল হলে দীর্ঘদিন তার মাশুল দিতে হবে। যশোর ও খুলনা জেলার ভবদহ এলাকায় নদী দিয়ে সাগরের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ১৯৬৩ সালে সুইস গেট নির্মাণ করা হয়। গ্রীষ্মকালে যাতে সাগরের লবণাক্ত পানি নদী দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সুইস গেট বন্ধ রাখা হতো। ফলে গ্রীষ্মকালে জোয়ারের লবণাক্ত ঘোলা পানি সুইস গেটে বাঁধা পেয়ে পলি জমা শুরু করে। এভাবে এক সময় পলি জমে নদী ভরাট হওয়ায় সুইস গেট দিয়ে পানি সাগরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ১৯৮৩ সালে ভবদহ এলাকায় প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমিতে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ২০০৩ ও ২০০৪ সালে তা প্রকট আকার ধারণ করে। ফসলি জমি ছাড়াও বাড়ি-ঘর, i¯—v-NvU পানিতে ডুবে যায়। কিছুদিন আগে যে সব কৃষকের ছিল গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু এখন তার হাতে জাল।

খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচলিত ফসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফসল চাষ করতে হবে। ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ৪৫ চাষ করলে ব্রিধান ২৯ এর থেকে আগে পাকে। দেশের ga¨vÂ‡j বন্যা পরবর্তী সময়ে নাবী জাতের ধান, যেমন– নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩ এবং ব্রিধান ৪৬ চাষ করতে হবে। বন্যার কারণে বীজতলা তৈরির জমি না পেলে দাপোগ পদ্ধতির বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী সময় দ্রুত শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল চাষের জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : তীব্র খরা, সাধারণ খরা, রবি খরা, খরিপ-১ খরা, খরিপ-২ খরা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কলাকৌশল

ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

আমরা জানি cwZKj পরিবেশে উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় ও জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেয়। এ খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। ফসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা cwZKj পরিবেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন। এ cwi‡"Q‡` আমরা খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা বা বন্যা ইত্যাদি cwZKj বা বিরূপ পরিবেশে ফসলের অভিযোজন কৌশল m¤ú‡K আলোচনা করব।

ফসলের খরা অভিযোজন কৌশল

খরা m¤ú‡K আমরা আগেই জেনেছি। খরা অবস্থায় ফসলের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি থাকে, বাতাসে জলীয় ev‡®úi পরিমাণ কম থাকে, তাপমাত্রা বেশি ও mhv‡jvK প্রখর থাকে। এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

১. খরা এড়ানো :

খরা অবস্থায় ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরাবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া ও Livevi শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জীবনচক্র শেষ করে খরাকবলিত না হওয়ার কৌশলকে খরা এড়ানো বলে। মরুভূমি AÂ‡j এ ধরনের ক্ষণজীবী কিছু উদ্ভিদ আছে। বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে এ সব উদ্ভিদের বীজ গজায় এবং ১-২ মাসের মধ্যে জীবন চক্র m¤úb করে।

আবাদকৃত ফসলের মধ্যে কিছু কিছু জাতের ফসল রয়েছে যাদের জীবনকাল স্বল্প। মিলেট জাতীয় ফসলের কিছু কিছু জাত অঙ্কুরোদগমের ৬০ দিনের মধ্যেই পরিপক্ব হয়। কোনো কোনো ফসলের আগাম জাত অল্প সময়ে পরিপক্বতার কারণে দু-একটি খরা এড়াতে পারে। ফসলের ফুল, ফল ধারণ ও পরিপক্বতার কাল স্বল্প হলে খরা এড়াতে পারে। যেমন– গো-মটরের ফুল ফোটা হতে দানা পরিপক্ব হতে ১৭-২০ দিন সময় লাগে। ফলে খরাপ্রবণ এলাকায় গো-মটর চাষ করে খরা শুরু হওয়ার c‡eB ফসল তোলা সম্ভব।

২. খরা প্রতিরোধ :

খরাকবলিত অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। ফসলের খরা প্রতিরোধ কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক) খরা সহ্যকরণও খ) খরা পরিহারকরণ। আমরা এখন খরা সহ্যকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

ক) ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল :

ফসল খরায় পতিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরে স্বল্প পানি সাম্যতা নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। এ সব ফসল খরাবস্থা চলে গেলে পুনরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ করে। ফসলের খরাসহ্যকরণ কৌশলগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **কোষের পানিশন্যতা রোধকরণ :** এ ধরনের ফসল খরাবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাব জমিয়ে রাখে। ফলে কোষাভ্যন্তরে D"PZi অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে। কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যায় না এবং কোষ চুপসে যায় না। খরার সময় তুলা ফসলে এটা লক্ষ করা যায়।

২. **মোটা কোষ প্রাচীর :** অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতিয়ে পড়ে না।

৩. **উপোসকরণ :** কিছু কিছু উদ্ভিদ খরা কবলিত অবস্থায় সালোকসংশেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় পাতার কোষ নেতিয়ে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশেষণ বজায় রাখে। এভাবে খরাকালীন অবস্থায় উদ্ভিদ কোনো রকম বেঁচে থাকে।

৪. **প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ :** খরার প্রভাবে উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। এ জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে যা এ বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহ্যশীল করে তোলে।

৫. **কোষ গহ্বর শন্যতা :** উদ্ভিদের অঙ্গ ভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে কোনো কোষ গহ্বর থাকে না, সে সব অঙ্গ খরা সহ্যশীল হয়। যেমন– খরার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না। পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৬. **সুপ্তাবস্থা :** অনেক বহুবর্ষী উদ্ভিদের খরাবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায় কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থায় বেঁচে থাকে। AbKj পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।

খ) ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল :

আমরা আগেই জেনেছি ফসলের খরা প্রতিরোধের কৌশল দুটি, যথা– খরা সহ্যকরণ ও খরা পরিহারকরণ। নিচে ফসলের প্রধান প্রধান খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. **পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরাবস্থা মোকাবেলা করে। যেমন–যব ও লম্বা জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ রাখে। আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্ররন্ধ্রের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে। আবার অনেক ফসলের পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম থাকে, পত্ররন্ধ্র পাতার ছোট ছোট ভাঁজ বা গর্তের মধ্যে থাকে। ফলে প্রস্বেদন কম হয়, পানি সংরক্ষিত থাকে।

২. **প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণ :** অনেক ফসল খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিড জমা করে প্রস্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়; যেমন– সয়াবিন ফসল। আবার অনেক ফসল পাতার উপরে মোম বা ঘন রোমের A\"Q\`b সৃষ্টি করে প্রস্বেদন হ্রাস করে।

৩. **পাতার আকার হ্রাসকরণ :** অনেক ফসল খরাকবলিত অবস্থায় পাতার আকার হ্রাস করে প্রস্বেদন কমিয়ে দেয়; যেমন– গো-মটর। পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

৪. **পাতা ঝরানো :** খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক ফসল নিচ থেকে পুরাতন পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও গো-মটরে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কাণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়। খরার ফলে ইথিলিন এনজাইম উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

৫. **সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ :** কিছু ফসল পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রস্বেদন কমালেও পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ফসলে এটা দেখা যায়।

৬. **দক্ষ মলতন্ত্র :** কিছু কিছু উদ্ভিদ g‡ji দৈর্ঘ্য, সংখ্যা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে অধিক পরিমাণ পানি আহরণের মাধ্যমে খরাবস্থা মোকাবেলা করে; যেমন– ভুট্টা, তুলা ও গমের অনেক জাতে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। g‡ji অধিক গভীরতা ও ঘনত্ব একই ফসলে বিরাজমান থাকলে সে ফসল অধিক খরা প্রতিরোধী হয়; যেমন– জোয়ার ও বাজরা। আবার চিনাবাদাম, অড়হর গভীরgjx হওয়ায় খরা প্রতিরোধী হয়।

৭. **পাতা মোড়ানো ও পাতা** KwÂZKiY **:** অনেক দানা ফসল; যেমন– জোয়ার, কাউন পাতার আকার হ্রাসকরণ ছাড়াও খরা পরিবেশে পাতা KwÂZ করে। আবার অনেক ফসল পাতা মুড়িয়ে mhv‡jvK প্রাপ্তির আয়তন কমিয়ে দেয়। ফলে এদের প্রস্বেদন কমে যাওয়ার কারণে পানির অপচয় হ্রাস পায় এবং খরা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।

৮. **পাতার দিক পরিবর্তন :** অনেক উদ্ভিদে খরাবস্থায় mhv‡jv‡Ki সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। চিনাবাদাম, তুলা ও গো-মটরসহ আরও অনেক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফসলের খরা অভিযোজন কৌশলগুলো খাতায় লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা অভিযোজন কলাকৌশল

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা লবণাক্ত পরিবেশ লবণাক্ত পরিবেশে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল m¤ú‡K জেনেছি। লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের উপর ভিত্তি করে ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ক) হ্যালোফাইটস– গোলপাতা, কেওড়া ও খ) গাইকোফাইটস– সুগারবিট, শিম, তুলা। হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে সেখানেই জীবনচক্র m¤úb করতে পারে যা গাইকোফাইটস পারে না।

লবণাক্ত এলাকার মৃত্তিকা পানিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্যালসিয়াম ও সালফেট লবণ `exfZ থাকায় পানির ঘনত্ব বেশি থাকে। এ পরিবেশে উদ্ভিদকে টিকে থাকতে হলে উদ্ভিদের কোষ রসের ঘনত্ব মৃত্তিকা পানির ঘনত্ব থেকে বেশি হতে হয়। বেশি না হলে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি বা খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে না, উল্টা পানি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উদ্ভিদ কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য মাটি হতে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (K+, Na+) আহরণ করে লবণাক্ততার এ বাধা অতিক্রম করে। এতে করে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে আয়নের আধিক্য ঘটে। কিন্তু লবণ সহ্যকারী উদ্ভিদ আয়নের আহরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো প্রজাতির পাতায় একধরনের লবণ জালিকা থাকে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন বের করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি পাতার আয়তন বাড়িয়ে শরীরে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে নেয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে পাতার কোষে অতিরিক্ত আয়ন জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত পরিবেশে আয়ন আহরণ না করে অন্য উপায় অবলম্বন করে। এ সব উদ্ভিদের g‡ji কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য কোষ গহ্বরে বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাব জমা করে রাখে। এ ধরনের উদ্ভিদের কোষ গহ্বরের আয়তন কোষের মোট আয়তনের ৯৫% হয়ে থাকে। কোষ গহ্বরে জমা করা জৈব দ্রাবর মধ্যে সালোক-সংশেষণজাত দ্রব্যই বেশি থাকে।

জলাবদ্ধ অবস্থায় বা বন্যায় ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

জলজ উদ্ভিদ ছাড়া অধিকাংশ ফসল বন্যা বা জলাবদ্ধ বা মৃত্তিকা পানির m¤ú³ অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থায় মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের gj শ্বসনকাজ চালাতে পারে না। যত দ্রুত মাটি বা পানিস্থ `exfZ অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় এ সব উদ্ভিদ তত দ্রুত মারা যায়। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ। ধান গাছে এ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে। এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঠুরি থাকে। বায়ু কুঠুরিতে অক্সিজেন জমা থাকে। ফলে ধানগাছ ডুবে না গেলে বন্যা বা জলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং ভালো ফলন দেয়। তবে অনেক দিন ডুবে থাকলে মারা যায়। গভীর পানির আমন ধান বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে সাথে D"PZvq বাড়তে থাকে। এ সব জাতের ধানগাছের পর্ব মধ্যে এক ধরনের ভাজক কলা থাকে যা বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে দ্রুত বিভাজিত হয়ে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে বন্যা মোকাবেলা করে। আবার লম্বা জাতের ধান D"PZvi কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

D"P **তাপমাত্রা অভিযোজন কৌশল**

D"P তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশেষণের হার বেশি কমে। এ অবস্থায় ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায়, পানির অপচয় হয়। তাপ সহ্যশীল উদ্ভিদে D"P তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয়। তাপ সহ্যশীল উদ্ভিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং D"P তাপমাত্রায় ফসলের অভিযোজন কৌশল m¤ú‡K খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : খরা এড়ানো, খরা প্রতিরোধ, খরা সহ্যকরণ, প্রোলিন, হ্যালোফাইটস, এ্যারেনকাইমা টিস্যু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পুষ্টির চাহিদা ciY, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বcY fwgKv পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান cÂg| এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, পুকুর, দিঘি, পাবন fwg ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের মোট পরিমাণ n‡"Q প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর। সেসাথে আরও রয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। দেশের এই সকল জলভাগ থেকে বর্তমানে যে মৎস্য উৎপাদন হয় তা এদের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ থেকে আরও অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে (২০১০-১১) দেশে যেখানে মাছের উৎপাদন প্রায় ৩০.৬০ মেট্রিক টন সেখানে ২০১২-১৩ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে ৩৪.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও দেশে মাছের উৎপাদন বিগত বছরগুলোতে ক্রমন্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু ত্রুটি বেড়েছে মাছ চাষ বৃদ্ধির ফলে। অথচ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেমন-নদী, খাল, বিল, হাওর cvebfwg‡Z প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে কমে hv‡"Q মাছের জীববৈচিত্র্যও। আর এর অন্যতম কারণ n‡"Q জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি cv‡"Q, সমুদ্রপৃষ্ঠের D"PZv বেড়ে hv‡"Q, লবণাক্ততা বৃদ্ধি cv‡"Q, অনাবৃষ্টি বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টি n‡"Q| বেড়ে hv‡"Q সাইক্লোন ও R‡jv"Qv‡mi তীব্রতা ও সংখ্যা। এ mg¯— কারণে মাছ চাষ, মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ব্যাহত n‡"Q| wনচে মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

ক) মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

১) আমাদের দেশে মৌসুমি পুকুরগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির পানি জমলে চাষিরা মাছ ছাড়ে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অথবা বৃষ্টিপাত শুরু হতে দেরি n‡"Q| এতে করে পোনা ছাড়তে দেরি n‡"Q| আবার দেরিতে পোনা ছাড়ার পর পুকুর শুকিয়েও hv‡"Q তাড়াতাড়ি। ফলে চাষের সময় কমে hv‡"Q এবং মাছ বড় হওয়ার আগেই ছোট মাছ বাজারজাত করতে হ"Q। এতে করে চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হ"Q।

২) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে হ্যাচারিতে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন evaM¯Í হ"Q। প্রজননের AbKj পরিবেশ না পাওয়া ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে হ্যাচারিতে মাছ কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দি"Q না। পেটে ডিম আসলেও ডিম ছাড়ছে না। ডিম শরীরে শোষিত হয়ে যা"Q। আবার মাছ ডিম ছাড়লেও তা নিষিক্ত হ"Q না বা কম হ"Q। আবার নিষিক্ত হওয়ার ডিম ফুটার হারও কম হ"Q। জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন ব্যাহত করছে।

৩) স্বল্প গভীর পুকুরে অধিক তাপমাত্রায় মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হ"Q এবং মৃত্যুহার বেড়ে যা"Q। ফলে উৎপাদন কম হ"Q ও চাষিদের আয় কমে যা"Q।

৪) কম বৃষ্টির কারণে চাষের পুকুরে কম পানি পাওয়া যা"Q। ফলে পুকুরে বা খামারে পানি সরবরাহে চাষিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হ"Q।

৫) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, সাইক্লোন, R‡jv"Qv‡mi তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যা"Q। ফলে মৎস্য সেক্টরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে চাষিদের দুর্ভোগ বাড়ছে। পুকুর থেকে মাছ বেরিয়ে যা"Q।

৬) সমুদ্র পৃষ্ঠের D"PZv বৃদ্ধির ফলে DcKjxq AÂ‡ji চাষের পুকুরগুলো ডুবে যেতে পারে।

খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে প্রভাব

১) কম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে কম পানি হ"Q ফলে অল্প পানিতে সহজেই মাছ ধরা সম্ভব হ"Q। এতে করে ছোট-বড়, প্রজননক্ষম সব মাছ ধরা পড়ছে। ফলে নদীতে মাছের জীববৈচিত্র ও স্থায়ী উৎপাদন ব্যাহত হ"Q।

২) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের D"PZv বেড়ে যা"Q ফলে লবণাক্ততা ঢুকে পড়ছে gj f-খণ্ডের দিকে। এতে করে DcKjxq এলাকার স্বাদুপানির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র কমে যা"Q। সে সাথে কমে যা"Q উৎপাদনও।

৩) আমাদের দেশে বিল, বাঁওড়, পাবন fwg‡Z এপ্রিল-মে মাস হ"Q দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বা কম হওয়ার কারণে জুলাই মাস পর্যন্তও এসব জলাশয়ে পানি হ"Q না। ফলে এসব মাছের প্রজনন চরমভাবে ¶wZM¯— হ"Q। ফলে এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র মৎস্য উৎপাদনে এবং যারা মাছ আহরণ করে তাদের পুষ্টি ও জীবীকার ক্ষেত্রে।

৪) আমাদের দেশে একমাত্র হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে রুই জাতীয় মাছ ডিম ছাড়ে। বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরমের পর ভারী বৃষ্টি শুরু হলে এরা ডিম ছাড়ে। তখন নদী থেকে জেলেরা নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এবং এই ডিম

ফুটিয়ে পোনা উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে ব্রুডমাছের ডিমের পরিপক্বতা এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যা"Q। এতে করে মাছের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সাথে বৃষ্টিপাতের সময়ের অমিল হ"Q। ফলে ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রভাব

১) বায়ুমণ্ডলে দিন দিন কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে ফলে বেড়ে যা"Q বাতাসের ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ফলে বাতাসের গতি প্রকৃতি বদলে যা"Q, বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হ"Q। ফলে এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ ও উৎপাদশীলতায় প্রভাব পড়ছে। ফলে সমুদ্রের কোনো অংশে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার মাছের নিরাপদ বিচরণক্ষেত্রে বলে খ্যাত কিছু এলাকা gwQkb¨ হয়ে যেতে পারে।

২) বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছ উষ্ণ মণ্ডলীয় AÂj থেকে মেরু AÂ‡ji সাগরের দিকে সরে যা"Q। অনেক মাছ তার অভিপ্রায়ন (migration) পথ, প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলছে। ফলে জেলেরা m`i অতীত থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রের যে সব সামুদ্রিক এলাকায় মাছ আহরণ করতে যেত সেগুলোর পরিবর্তন হলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।

৩) কোরাল রীফ বা প্রবাল সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঢেউয়ের তারতম্য, mg‡`i অম্লত্ব বৃদ্ধি, `IY, স্রোতের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রবাল ধ্বংস হয়ে যা"Q। এর ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র তথা মৎস্য বৈচিত্র্যের উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাব m¤ú‡K প্রতিবেদন লিখবে।

cÂg cwi‡"Q`

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা কাটিয়ে উঠা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে অন্যদিকে আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশন অবলম্বন করা যেতে পারে-

১) জলবায়ু পরিবর্তনে যেহেতু DcKjxq AÂ‡j লবণাক্ততা বেড়ে যা"Q তাই লবণাক্ততা সহনশীল মাছের চাষ এবং পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-ভেটকি, বাটা, পরশে ইত্যাদি।

২) লবণাক্ততা বেড়ে চলছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ করা যেতে পারে।

৩) খরা প্রবণ এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য

এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলাপিয়া বেশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা AÂ‡j কই ও দেশি মাগুরের চাষও করা যেতে পারে।

৪) বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে বা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে বা পুকুর ভেসে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

৫) বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঐ এলাকায় যে সময়ে বন্যা হয় না সে সময়ে ঐ পোনা পুকুরে মজুদ করা যায়।

৬) বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার সময়টাতে খাঁচায় মাছ চাষ করা যেতে পারে।

৭) DcKjxq AÂ‡j বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়।

৮) দিন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা সহনশীল মাছ চাষ ও এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া যায়। যেমন- মাগুর, রুই, শিং।

৯) তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুকুরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তাতে টোপাপানা রাখা যেতে পারে। এতে করে মাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নিচে অবস্থান নিতে পারবে। একই উদ্দেশ্যে পুকুরের পাড়ে পানির উপর কিছু লতানো উদ্ভিদ জন্মানোর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু পানি সেচ দেওয়া যেতে পারে।

১০) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হ"Q।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির উপর প্রভাব

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও মানুষ কর্তৃক পরিবেশ ধ্বংসই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশ নিয়মিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হ"Q। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশে দেশে প্রতি নিয়ত আঘাত করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-জলো"Qাস, সামুদ্রিক NwYSo , প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা প্রভৃতি কারণে পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে খামার মালিক বা কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় না। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুষিয়ে নেবার জন্য দুর্যোগকালীন ও দুযোর্গ পরবর্তী সময়ে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ev¯ÍeZv মেনে নিয়েই সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা mZKZvgjK ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতিমধ্যে DËivÂ‡ji বরেন্দ্র fwgi শালবন, রাজশাহী AÂ‡ji পত্নীতলা ও নজীপুরের জঙ্গল m¤úY বিলুপ্ত হয়েছে। যার ফলে এ AÂ‡j প্রচন্ড খরা হয়। এসব ebvÂ‡ji পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও DcKjxq বনায়ন পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামের A‡kwYf³ ebvÂ‡ji বনায়ন সম্প্রসারণ, দেশের নদ-নদী খাল উদ্ধার ও পুনঃখনন এবং ছোট বড় পাহাড় রক্ষার পরিবেশ আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

দেশের সামাজিক বনায়ন m¤úmwiYmn ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে। এগুলো হ"Q দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ব্যবস্থা। এসব e¯Íewq‡bi পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ তথা পশুপাখি রক্ষা করা যাবে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির সমস্যা gj¨wq‡bi বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

খরাজনিত সমস্যাঃ খরায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো n‡"Q-

১. কাঁচা ঘাসের অভাব হয়।

২. পানি `wIZ হয়।

৩. গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।

৪. গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেওয়া।

৫. মাঠ-ঘাটের ঘাস শুকিয়ে যায়।

৬. পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।

৭. অধিক তাপ পশুপাখির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে।

৮. গবাদিপশুর স্বাস্থ্যের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়।

৯. তাপপীড়নে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়।

বন্যাজনিত সমস্যাঃ বন্যা পরিস্থিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হ"Q-

১. জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

২. দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়।

৩. রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৪. গো-খাদ্য পাওয়া যায় না।

৫. পানি `wIZ হয়।

৬. পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৭. গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।

৮. বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

৯. ঘাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।

১০. পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, অনেক পশুর মৃত্যু হয়।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা : জলো"Q্বাসের সময় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হ"Q-

১. জলো"Q্বাসকবলিত এলাকার পানি `wIZ হয়।

২. জলো"Q্বাস ও ঝড়ের ফলে বহু গাবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিক মারা যায়।

৩. সৎকারের অভাবে মৃত পশুপাখি পরিবেশ `wIZ করে।

৪. পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

৫. জীবিত গাবাদিপশু উদরাময়, পেটের পীড়া ও পেটফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

কোনো প্রজাতি তার পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে পরিবেশ ও জীবের দেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া m¤úb হয়ে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের D"PZv এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবেলা করেই জীব তার অবস্থানে টিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হলে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পশুপাখি সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না। কারণ পশুপাখি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো AÂ‡j জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরে ধীরে হলে অনেক পশুপাখি পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম অনেক প্রজাতির অবলুপ্তিও ঘটে। প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে পশুপাখির অভিযোজনের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খরা, বন্যা ও জলো"Q্যাসজনিত সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে পশুপাখি অনেকাংশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

খরায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল :

১। কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল,বাবলাসহ বিভিন্ন গাছ-পাতার চাষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খরার সময় এসব গাছের পাতা পশুকে খাওয়াতে হবে।

২। খরার সময় পশুকে ভাতের ফেন, তরিতরকারির উ"Qষ্ট অংশ, কুঁড়া, গমের ভুসি, ডালের ভুসি, খৈল, ঝেলাগুড় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

৩। গবাদিপশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

৪। পশুকে কাঁচা ঘাসের m¤úiK খাদ্য (যেমন - সবুজ অ্যলজি) খাওয়াতে হবে।

৫। খরা মৌসুম আসার c‡eB ঘাস দ্বারা সাইলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে। যা খরা মৌসুমে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে।

চিত্র : খরার সময় পশু ইপিল, ইপিল পাতা খা"Q

৬। গবাদিপশুকে শুষ্ক খড় না খাইয়ে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত খড় ও ইউরিয়া মোলালেস বক খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। গবাদির পশুকে পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

৮। পশুকে বেশি করে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।

৯। পশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

১০। পশুর শরীর সব সময় পরিষ্কার-cwi"Qb রাখতে এবং পরজীবীর চিকিৎসা করাতে হবে।

১১। পশুকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং প্রখর রোদে নেওয়া যাবে না।

১২। গবাদিপশু অসুস্থ হলে পশু ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে।

বন্যাজনিত সমস্যায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল :

১। গবাদিপশুকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

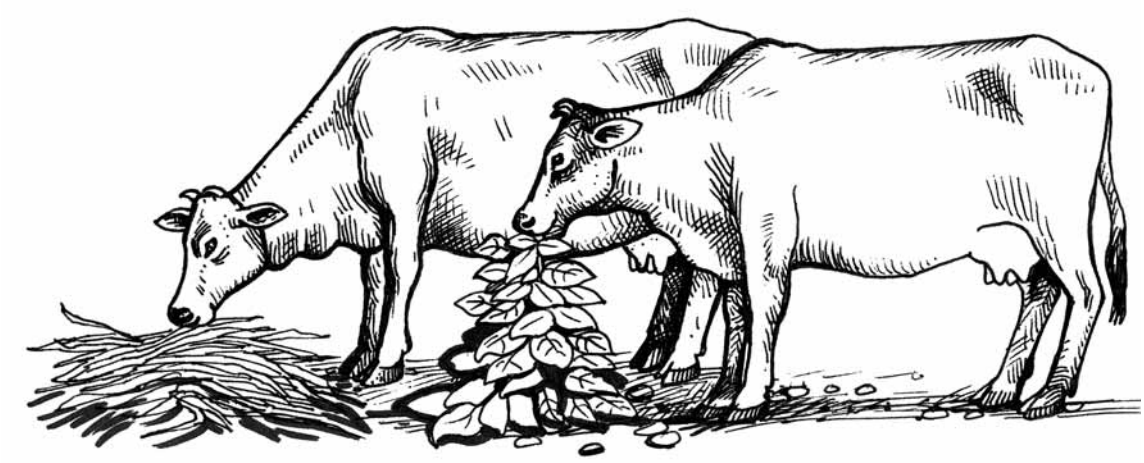

চিত্র ঃ বন্যায় পশুকে খড় ও গাছের পাতা খাওয়ানো হ"Q

২। গবাদিপশুকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে, বন্যার `wIZ পানি খাওয়ানো যাবে না।

৩। গবাদিপশুর মৃতদেহ গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

৪। বন্যার সময় গবাদিপশুকে খাদ্য হিসাবে খড়, চালের কুঁড়া, ভুসি ও খৈল বেশি করে খাওয়াতে হবে।

৫। এ সময় কচুরিপানা, দলঘাস, লতাগুল্ম এমনকি কলাগাছও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

৬। কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসাবে হে ও সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে।

৭। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।

৮। গবাদিপশুকে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

৯। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক আক্রান্ত পশুকে চিকিৎসা করাতে হবে।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশলঃ

DcKjxq এলাকায় সামুদ্রিক R‡jv"Qvm একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বছরের যে কোনো সময় জলো"Qাস mg`-DcKjxq এলাকায় আঘাত হেনে গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। আমাদের দেশের we¯ÍY mg`-DcKjxq AÂj ও দ্বীপগুলো জলো"Qাসের কবলে পড়ে। তাই জলো"Qাসের কবল থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে।

১। উঁচুস্থানে পশুপাখির বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। জলো"Qাস বা ঝড়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে গবাদিপশুকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

৩। জলো"Qাসের পর মৃত পশুকে মাটির নিচে চাপা দিতে হবে।

৪। এ সময় পশুর জন্য ভাতের মাড় ও ঝাউ, শুকনো খড় এবং দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। গবাদিপশুকে দানাদার খাদ্য যেমন-ভুসি, কুঁড়া, খৈল ও প্রয়োজন মতো লবণ খাওয়াতে হবে।

৬। গবাদিপশুকে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গাছ-পাতা খাওয়াতে হবে।

৭। জলো"Qাস কবলিত এলাকায় টিম গঠন করে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। গবাদিপশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

৯। গবাদিপশুকে যাতে পচা `wIZ পানি খেয়ে রোগাক্রান্ত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের কী কী প্রভাব পরিলক্ষিত n‡"Q ?

২. শৈত্য, খরা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাতের একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. ফসলের অভিযোজন বলতে কী বোঝ?

৪. জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির উপর বন্যাজনিত কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয় ?

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলeq পরিবর্তনের কারণে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে? ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব বর্ণনা কর।

২. ফসলের খরা অভিযোজনের কলা কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে কী কী অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে বর্ণনা কর।

৫. cwZKj ও বিরূপ পরিবেশে কীভাবে পশুপাখির অভিযোজন করা হয়? বর্ণনা কর।

১. বিরূপ পরিবেশে ফসল উৎপাদনের cekZ কোনটি ?

ক. উপযোগী ফসল নির্বাচন।

খ. সঠিক জমি নির্বাচন।

গ. যথাযথ পরিচর্যা করা।

ঘ. অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ।

২. খুলনা ও বাগেরহাট AÂ‡j রোপা আমনের জনপ্রিয় জাত কোনটি?

ক. বালাম খ. দিশারী

গ. চান্দিনা ঘ. মুক্তা

৩. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনে-

i. রোগবালাই বৃদ্ধি পাবে।

ii. জেব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

iii. fwgi উর্বরতা হ্রাস পাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ কোনটি?

ক. শিম খ. তুলা

গ. কেওড়া ঘ. বাইন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তাহের মিয়ার বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। আমন মৌসুমে ধানের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৫ দিন পানির নিচে থাকায় আশানুরূপ ফলন পাননা। আবার পাহাড়ি ঢলে প্রায় সময়ই পাকা বোরো ধান তলিয়ে যায়।

৫. তাহের মিয়া আমন মৌসুমে কোন জাতের ধানের চাষ করলে আশানুরূপ ফলন পাবেন?

ক. কিরন (বি-আর ২২) খ. ব্রি-ধান ৫১

গ. ব্রি-ধান ৪৫ ঘ. ব্রি-ধান ৩৬

৬. বোরো মৌসুমে পাকা ধান নষ্ট না হওয়ার জন্য তাহের মিয়ার উচিত-

i. সঠিক সময়ে চারা রোপণ করা

ii. ব্রি-ধান ২৮ ও ব্রি-ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

iii. ব্রি-ধান ৫১ ও ব্রি-ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সুজিত বাবুর বাড়ি সমুদ্র DcKjeZx সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি আবাদি জমিতে স্থানীয় জাতের ধান চাষ করে উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এরপর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে বিনা ধান-৮ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য চিত্র দেখে সুজিত বাবু লবণাক্ততা সহায়ক বিভিন্ন ফসলের চাষ m¤ú‡K অনেক তথ্যই জানতে পারলেন।

ক. লবণাক্ত mvnÂ ফসল কাকে বলে?

খ. তাপমাত্রা কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুজিত বাবুর এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম gj¨vqb কর।

২। চিত্রার বাবা নিয়মিত চট্রগামে হালদা নদী থেকে মাছের ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু এ বছর চিত্রার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন নির্দিষ্ট সময়ে কাপ জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ফলে আয়- রোজগার কমে যাবে। তিনি এলাকায় মৎস্য সপ্তাহ চলাকালে শোভাযাত্রায় ও তথ্য চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য m¤ú` কমে যাওয়ার কারণ জানতে পারেন।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রার বাবার ডিম সংগ্রহ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উলিখিত শোভাযাত্রাটি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিরূপ প্রভাব ফেলবে বিশেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালন প্রভৃতির উৎপাদনকে বোঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশে পতিত ও অব্যবহৃত জায়গাতেও পরিকল্পিতভাবে ফুলফল ও শাকসবজি চাষ করা যায়। এছাড়া শস্য পর্যায় অবলম্বন করে দানা জাতীয় ফসলের পরে সরিষা বা মাস কলাই চাষ, আঁশ জাতীয় ফসলের পরে দানা জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে বাঁশ, বেত, পাটকাঠি, খর, নারিকেলের ছোবড়া ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কাজেই কৃষিজ উৎপাদন m¤ú‡K জানা খুবই জরুরি।

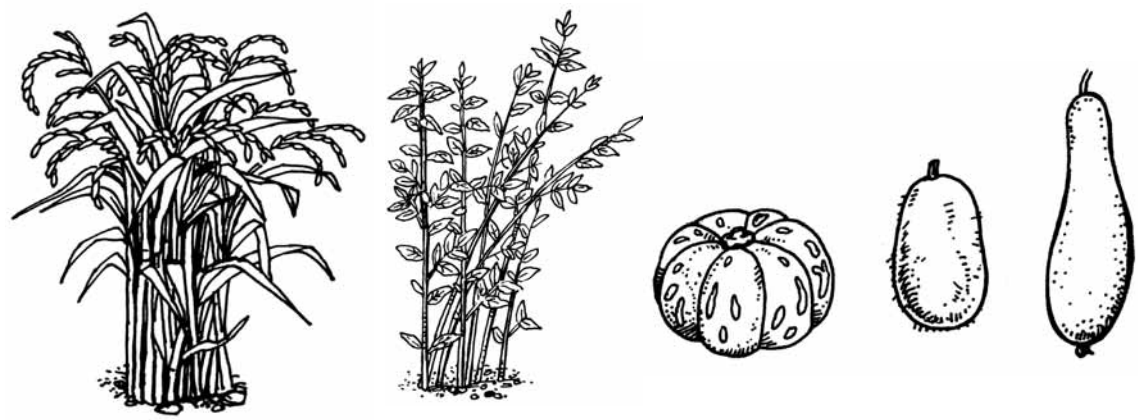

চিত্র: ধানের গোছা চিত্র: পাট গাছ চিত্র :সবজি(মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লাউ)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- চাষ উপযোগী বিভিন্ন জাতের ফসলের নাম, উৎপাদন পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শাকসবজি চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই ও দমন পদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফুল চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ও দমন পদ্ধতি এবং ফুল-ফল চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছ পালন পদ্ধতি, মাছের রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুপাখির পালন পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমন্বিত চাষ m¤ú‡K ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমন্বিত চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K বর্ণনা করতে পারব।
- সমন্বিষ চাষ পদ্ধতির মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা m¤ú‡K বর্ণনা করতে পারব এবং সমন্বিত চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পে ব্যবহৃত হয় এরূপ কৃষিজ দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং ঔষধি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল চাষ পদ্ধতি

আমরা অষ্টম শ্রেণিতে চাষ উপযোগী ফসলের মধ্যে কেবল গম ফসল চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K জেনেছি। এ cwi‡"Q` আমরা ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই এর জাত ও পদ্ধতি m¤ú‡K জানব।

ধান চাষ

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে ধানের চাষ ও উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ভাত। আর এ ধানের ফলন সব জমিতে ভালো হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন বেশি ভালো হয় না। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এঁটেল ও পলি দোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাতসমুহ : বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে।

যথা : ক) স্থানীয় জাত : টেপি, গিরবি, দুধসর, রতিশাইল

খ) স্থানীয় উন্নতজাত : কটকতারা, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, রতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

গ) উচ্চফলশীল (উফশী) জাত : বাংলাদেশে অনেক জমিতে উফশী (D"P ফলনশীল) ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। উফশী ধানের জাতগুলোর সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন :

১) গাছ মজবুত এবং পাতা খাড়া।

২) শীষের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।

৩) গাছ খাটো ও হেলে পড়ে না।

৪) খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি।

৫) পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।

৬) অধিক কুশি গজায়।

৭) সার গ্রহণক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি।

উফশী ধানে যখন প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাগুণ, যেমন- রোগবালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, চিকন চাল, খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি সংযোজিত হয়, তখন তাকে আধুনিক ধান বলে। তাই সকল উফশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উফশী গুণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এ পর্যন্ত ধানের উফশী ৫৬টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ধানের মৌসুম তিনটি। যথা- আউশ, আমন ও বোরো। ধানের কতকগুলো ব্রি অনুমোদিত জাত আছে যেগুলো আউশ ও বোরো দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। যেমন- বিআর ১ (চান্দিনা), বি আর ২(মালা), বিআর ৯(সুফলা),

বিআর ১৪(গাজী)। আবার বিআর ১, বিআর ২ জাতগুলো আমন মৌসুমেও চাষ করা হয়। নিম্নে তিন মৌসুমের অনুমোদিত জাতগুলোর সংখ্যা ও কিছু জাতের নাম উলেখ করা হলো :

ক) **আউশ মৌসুমের জাত :** শুধু আউশ মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ৮টি। এদের মধ্যে কয়টি বিআর ২০ (নিজামী), বিআর ২১ (নিয়ামত) ইত্যাদি। এ জাতগুলো আউশ মৌসুমে বপন ও রোপণ দু'ভাবেই আবাদ করা যায়। এ মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ চৈত্র এবং চারা রোপনের জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।

খ) **আমন মৌসুমের জাত :** শুধু আমন মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ২৫টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ৫(দুলাভোগ), বিআর ১১(মুক্তা), বিআর ২২(কিরণ), ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭ ইত্যাদি।

সবগুলো জাতই রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ২৫-৩০ দিন।

গ) **বোরো মৌসুমের জাত :** শুধু বোরো মৌসুমেই চাষ করা যায় এরূপ জাত হলো ১৩টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ১৮(শাহজালাল), ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৩৬, ব্রি ধান ৪৫, ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি), ব্রি হাইব্রিড ১, ব্রি হাইব্রিড ২ এবং ব্রি হাইব্রিড ৩ ইত্যাদি। রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ৩৫-৪৫ দিন।

এ ছাড়া ধান ফসলের আরও কিছু জাত আছে। যেমন : বৃষ্টিবহুল, খরা-সহিষ্ণু, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু, হাওর , ঠাণ্ডা-সহিষ্ণু জাত ইত্যাদি।

বীজ বাছাই : কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজায় এরূপ পরিষ্কার, সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বপনের জন্য বাছাই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বাছাই করা হয়।

প্রথমে দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে প্রাপ্ত দ্রবণে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট ও হালকা বীজগুলো পানির উপর ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে নিলেই পানির নিচ থেকে ভালো বীজ পাওয়া যাবে। এ বীজগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ধুয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া মেশানো পানি বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া : বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জিএন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ঔষধ দ্বারাও শোধন করা যায়।

শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২-৩ ¯—i শুকানো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের ব্যাগ রেখে আর ২-৩ ¯—i শুকানো খড় দিয়ে বা কচুপাতা দিয়ে ঢেকে ভালোভাবে চেপে তার উপর কোনো ভারী জিনিস দিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং সেগুলো বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি : ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথা-

ক) শুকনো বীজতলা খ) ভেজা বীজতলা গ) ভাসমান বীজতলা ঘ) দাপোগ বীজতলা, উঁচু ও দোআঁশ মাটিmaúb

জমিতে শুকনো বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি m¤úb জমিতে ভেজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো বাতাস থাকে এবং বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে শুকনো ও ভেজা বীজতলা m¤ú‡K আলোচনা করা হলো :

ক) শুকনো বীজতলা : বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি যদি অনুর্বর হয় জমিতে জৈব সার দিতে হবে। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজতলার মাপ: এক শতক জমিতে দুই খন্ডের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০ মিটার x ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নালা বাদ দিয়ে ৯.৫মিটার x ১.৫মিটার হবে। বীজ তলার চারদিকে ২৫সেমি. জায়গা বাদ দিতে হবে এবং দুই খন্ডের মাঝখানে ৫০সেমি. জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে। বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজ জাগ দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়কাল দরকার। যেমন- আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাণ বীজ উলিখিত নিয়মে জাগ দিয়ে অঙ্কুরিত করতে হবে। এরুপ অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।

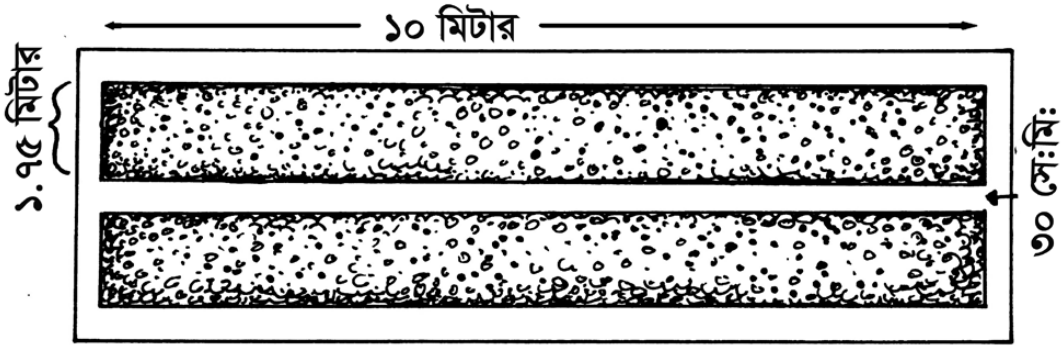

চিত্র: এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝের জায়গা থেকে মাটি উঠিয়ে দুই বেডে সমানভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। এতে বেডগুলো উঁচু হয়। এরপর প্রতিবর্গমিটার বেডে ৬০-৮০ গ্রাম বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুই বেডের মাঝে সৃষ্ট নালা সেচ, নিকাশ ও সার বা ঔষধ প্রয়োগের জন্য খুবই দরকার হয়।

খ) ভেজা বীজতলা : এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর জমি আরও ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে বোনা ভালো। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনো বীজতলার মতোই।

বীজতলার পরিচর্যা : ১) পাখি যাতে বীজতলার বীজ খেতে না পারে সেজন্য বপনের সময় থেকে ৪-৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ২) বেড যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য দুই বেডের মাঝের নালায় পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ৩) এরপর নালা থেকে প্রয়োজনীয় পানি বেডে সেচ দিতে হয়। ৪) বীজ তলায় আগাছা জন্মিলে তা তুলে ফেলতে হয়। ৫) রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে তা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ৬) বীজ তলার চারাগুলো হলদে হয়ে গেলে প্রতিবর্গমিটারে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ৭) ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারাগুলো সবুজ না হলে গন্ধকের (সালফার) অভাব হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৮) অতিরিক্ত ঠান্ডায় বীজতলায় চারাগুলো ক্ষতি হতে পারে। তাই রাতে পলিথিন দ্বারা চারাগুলো ঢেকে দিনের বেলায় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চারার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

চারা উঠানো :

১) চারা তোলার c‡e বীজতলায় পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উত্তম। এতে বীজতলার মাটি নরম হয়। ফলে চারা তুলতে সুবিধা হয়।

২) ধানের চারা পোকায় আক্রান্ত থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৩) চারার গোড়া বা কান্ড যাতে না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪) চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

চিত্র : বীজতলা থেকে চারা তুলছে

চারা বহন ও সংরক্ষণ : সরাসরি রোপণের ক্ষেত্রে-

১) বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কান্ড মোড়ানো যাবে না।

২) ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করতে হয়।

৩) e¯—we›`x করে কখনো ধানের চারা বহন করা যাবে না।

৪) চারা সরাসরি রোপণ সম্ভব না হলে চারার আঁটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি : ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে জমির চারদিক ছেঁটে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া D"P ফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএসপি,

এমপি, জিপসাম, `¯Ív প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণ করার পর ইউরিয়া সার ৩ wKw¯Í‡Z ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১ম wKw¯— চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর, ২য় wKw¯Í ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ চারার গোছায় ৪-৫টি কুশি আসা অবস্থায় এবং শেষ wKw¯Í ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচ থোর আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।

নিচে শতক প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এম পি, জিপসাম ও `¯Ív সারের পরিমাণ (গ্রাম) জাত ও মৌসুম ভেদে দেওয়া হলো :

জাত	মৌসুম	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	`¯Ív
নিজামী, নিয়ামত	বোনা আউশ	৫০	৩০০	১৬০	২৪০	৪০
Pw›`bv, cevPx, MvRx, weevjvg	রোপা আউশ	৫৪০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম		৬০০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
বিপ্লব, প্রগতি, মুক্ত, ব্রিশাইল	রোপা আমন	৬০০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
কিরণ, দিশারী (নাবী)		৩৬০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম	বোরো	৮৪০	৫০০	২৮০	২৮০	৪০
হাসি, শাহজালাল, মজ্জাল (হাওর এলাকার জন্য)		৫৪০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০

শতকপ্রতি ২০ কেজি পচা গোবর সার বা Kg‡cv÷ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা : জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন: পাহাড়ের cv`fwgi মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।

১) গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচপ্রকল্প এলাকার মাটিতে `¯Ív সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।

২) হাওর এলাকার মাটিতে প্রত্যেক সার কম পরিমাণে দিতে হবে।

৩) স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে।

৪) হেক্টরপ্রতি ৪-৫ টন শুকনো পচা জৈব সার বা Kg‡cv÷ ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া যায়। জৈবসার প্রথম চাষের সময়ই জমিতে দিতে হবে।

৫) ceeZx ফসলে টিএসপি, এমপি ও জিপসাম অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে প্রতিটি সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলবে।

৬) বেলে মাটিতে এমপি সার দুই wKw¯Í‡Z প্রয়োগ করতে হয়।

৭) `¯Ív সার/জিঙ্ক সালফেট যেকোনো একটি ফসলে প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে পরবর্তী দুটি ফসলে প্রয়োগ না করলেও চলবে।

৮) কোনো জমিতে যে বছর সবুজসার ফসল চাষ করা হয়েছে ঐ জমিতে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়ার পরিমাণ অর্ধেক দিলেই চলবে।

চারা রোপণ : সমান করা সমতল জমিতে জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। জমিতে ছিপছিপে পানি রেখে দড়ির সাহায্যে সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির `iZ ২০-২৫ সে.মি. এবং সারিতে এক গোছা থেকে অন্য গোছার `iZ ১৫-২০ সে.মি. হওয়া দরকার। প্রতি গোছায় ২-৩ টি চারা রোপণ করতে হবে। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা : ক) সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত পাবন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে আল বন্ধ মুক্ত পাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। বোরো ধান m¤úY f‡e সেচের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ৫-৭ সেমি. এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সেমি. এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সেমি সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সেমি এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি. পরিমাণ পানি সেচ দেওয়া উত্তম। থোর আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুতcY। দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আগাছা দমন : কমপক্ষে তিন বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়। যেমন :

১) চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে

২) প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে

৩) থোড় বের হওয়ার আগ পর্যন্ত ।

ধানক্ষেতে সাধারণত আরাইল, গইচা, শ্যামা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়। এগুলো সরাসরি হাত/নিড়ানি দ্বারা ও ঔষধ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

গ) পোকা দমন : ধানক্ষেতে অনেক পোকার উপদ্রব হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সাধারণত ধান ফসলে মাজরা পোকা, পামরিপোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, গল মাছি, শীষকাটা লেদা পোকা প্রভৃতি দেখা যায়।

নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

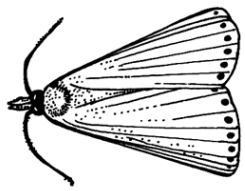

চিত্র: মাজরাপোকা মথ

চিত্র : পামরিপোকা

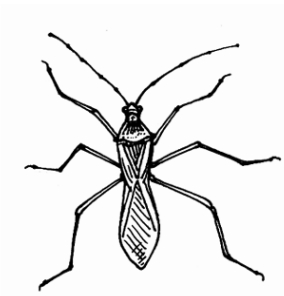

চিত্র : গান্ধি পোকা

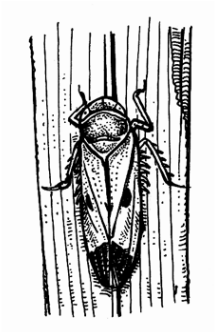

চিত্র: সবুজ পাতা ফড়িং

নিম্নলিখিত তালিকায় পোকার আক্রমণের লক্ষণসমূহ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করা যায়।

তালিকা ১ :

পোকার নাম	আক্রমণেi j¶Ymgn
১. মাজরাপোকা	১) ধান গাছের মাঝডগা ও শীষের ক্ষতি করে, ২) কুশি অবস্থায় আক্রমণ করলে মাঝ ডগা সাদা হয়ে যায়, ৩) ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীষে সাদা চিটা হয়, ৪) সব ঋতুতেই কমবেশি আক্রমণ করে।
২. পামরিপোকা	১) পামরি পোকার কীড়া পাতার ভিতরে ছিদ্র করে সবুজ অংশ খায়। ২) cY বয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ খুঁড়ে খুঁড়ে খায় বলে পাতা সাদা হয়ে যায়।
৩. গলমাছি	১) গল মাছির কীড়া ধানগাছের বাড়ন্ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পিয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ২) কুশিতে শীষ হয় না।
৪. গান্ধি পোকা	১) গান্ধিপোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। ২) বয়স্ক পোকার গা থেকে গন্ধ বের হয়।
৫. বাদামি গাছ ফড়িং	১) ধানের গোড়ায় বসে রস চুষে খায়, ২) গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায়, একে হপার বাণ বলে।

তালিকা ২ :

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গান্ধিপোকা, পামরিপোকা, মাজরা পোকা, গলমাছি, ছাতরা পোকা, চুঙ্গীপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা,	সুমিথিয়ন ৫০ বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ বা এমএলটি ৫৭ বা ডায়াজিনন ৬০
বাদামি গাছ ফড়িং	বাসুডিন ১০ বা ফুরাডান ৩ বা ডারাজিনন ১৪ বা
শীষকাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০

রোগ দমন : ধানগাছের অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ। নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো

রোগের নাম	কারণ	j¶Ymgn	দমনপদ্ধতি
১. বাস্ট রোগ	ছত্রাক	১) পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে ২) দাগের চারদিকে গাঢ় বাদামি এবং মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণের হয়। ৩) অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে m¤úY পাতা মরে যায়।	১) নীরোগ বীজ ব্যবহার করা। ২) পটাশ জাতীয় সার উপরি প্রয়োগ করা। ৩) বীজ শোধন করে বোনা ৪) জমিতে পানি ধরে রাখা ৫) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা ৬) রোগ প্রতিরোধ জাত বিআর ৩, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিধান ১৬, বিআর ২৪, ব্রিআর ২৮ রোপণ করা
২. টুংরো রোগ	ভাইরাস	১) চারা রোপণের এক মাসের মধ্যে টুংরো রোগ দেখা দিতে পারে। ২) আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ, পরে Av‡¯Í Av‡¯Í হলদে হয়ে যায়। ৩) গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। ৪) কুশি হয় না। ৫) প্রথমে দু'একটি গোছায় এ রোগটি দেখা যায়, পরে ধীরে ধীরে আশেপাশের গোছায় ছড়িয়ে পড়ে।	১) পাতা ফড়িং এ রোগ ছাড়ায়, তাই পাতা ফড়িং দমন করতে হবে। ২) রোগ প্রতিরোধীজাত যেমন- চান্দিনা, দুলাভোগ, ব্রিশাইল, গাজী, ব্রিধান ১৬, ব্রিধান ২২, ব্রিধান ৩৭, ব্রিধান ৩৯, ব্রিধান ৪১, ব্রিধান ৪২ চাষ করা ৩) আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলা। ৪) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা ৭) ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি স্প্রে করা।

এছাড়া ধান ফসলে পাতা পোড়া রোগ, উফরা রোগ, খোল পোড়ারোগ, বাকানি রোগ, বাদামি দাম রোগ, খোলপচা রোগ, স্মাট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে ধান ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ :

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়, শীষকাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শীষের উপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্ব"Q এবং নিচের অংশের ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্ব"Q হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা দরকার। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াইয়ের পর ধান ৩-৪ দিন cY রোদে শুকাতে হবে। এবার ভালোভাবে কুলাদিয়ে ঝেড়ে সংরক্ষণ করতে হবে। যে পাত্রে ধান রাখা হবে তা cwicY করে রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় নিম/নিশিন্দা/বিষকাটালীর পাতা (গুঁড়া) মিশিয়ে দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। তারপর পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না ঢুকে।

ফলন :

আউশের চেয়ে আমনের, আবার আমনের চেয়ে বোরোর ফলন বেশি হয়ে থাকে। উলেখ্য স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি হয়ে থাকে। উফশী জাতের ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন এবং শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ২০-২৪ কেজি।

কাজ : শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধান ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

পাট চাষ

বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল fwg‡Z প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও পাট জন্মে। পাটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে উঠেছে।

জমি নির্বাচন : উর্বর দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বর্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশি পাট উঁচু ও নিচু দু'ধরনের জমিতেই চাষ করা যায়।

চাষ উপযোগী পাটের জাতসমহ : প্রত্যেকটি ফসলের এমন অনেক জাত আছে যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পুষ্টিমান, খাদ্যগুণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গুণাবলি বিদ্যমান। তবে একই জাতে সব বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) ১৭টি দেশি, ১৬টি তোষা বা বগী পাট, ২টি কেনাফ এবং ১টি †g¯Íw জাতের পাট উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করেছে।

দেশি পাটের জাতসমুহ : সিভিএল-১ (সবুজপাট), সিভিই-৩ (আশু পাট), সি সি-৪৫ (জো পাট), ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮ ইত্যাদি দেশি পাটের জাত।

তোষা বা বগী পাটের জাতসমহ : ও-৪, ও-৯৮৯৭ (ফাল্গুনি তোষা), সিজি (চিন সুরা গ্রিন) ইত্যাদি তোষা বা বগী পাটের জাত।

কেনাফ জাতসমুহ : এইচ সি-২ (জলি কেনাফ), এই সি-৯৫

†g¯—wRwZ **:** এইচ সি-২৪ (টানী †g¯—w)

জমিচাষ : ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। রবি ফসল তোলার পর পরই জমি চাষ করা উচিত। ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। পাটের বীজ ছোট বলে মাটির দলা ভেঙে মিহি করতে হবে এবং আগাছা থাকলে বা ceeZx ফসলের শিকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নতুবা বীজ আশানুরূপ গজাবে না।

সার প্রয়োগ : পাটের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাণমতো সার ব্যবহার করে পাটের ফলন সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। পাটের জমিতে সঠিক নিয়মে সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার পরিমাণে কম লাগবে। তবে মাটিতে `¯—¦ ও গন্ধকের অভাব AbfZ না হলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পর সার প্রয়োগ : জমি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ও-৯৮-৯৭ জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় হেক্টরপ্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং ও-৯৮-৯৭ জাতের বেলায় হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া কিছু পরিমাণ শুকনো মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে 'হো' বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের কচি পাতা ও ডগায় প্রয়োগকৃত সার না লাগে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে।

বীজ শোধন : বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে ২০ গ্রাম এগ্রোসান জি এন বা ক্যাপটান ৭৫% ঔষধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত।

বীজ বপনের সময় : সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুনলে গাছে অসময়ে ফুল আসে এবং ফলন কম হয়, পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাতভেদে ১৫ ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি ও বীজ হার : জমিতে পাট বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে এ দুই উপায়ে বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক সারি থেকে অন্য সারির `iZ ২৫-৩০ সেমি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের `iZ হবে ৭-১০ সেমি. আবার ছিটানো পদ্ধতিতে বুনলে বীজ বেশি লাগবে। বীজ যেন মাটির খুব গভীরে বোনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে জো আসলে বীজ বুনতে হবে।

বীজ বপনের পর পরিচর্যা :

চারা পাতলা করণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ঘন চারা থেকে দুর্বল চারাগুলো উঠিয়ে এবং সাথে সাথে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয় বার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে এবং শেষবার ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা : পাটের জমিতে খরা দেখা দিলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে তাকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড় দমন : পাট ক্ষেতে বিছা পোকা, উড়চুঙ্গা, চেলে পোকা, ঘোড়া পোকা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি পোকার নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) বিছাপোকা : লক্ষণ : কচি ও বয়স্ক সব পাতাই খেয়ে ফেলে। ¯¿x মথ পাটের পাতার উল্টা পিঠে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে e¦"Pv বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত e¦"Pv¸‡jv পাতার উল্টা দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে। পরে এরা সব গাছে ছড়িয়ে পড়ে। দল বদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মতো করে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতাগুলো `i থেকেই সহজে দৃশ্যমান হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি ডগাও খেয়ে ঢেলে।

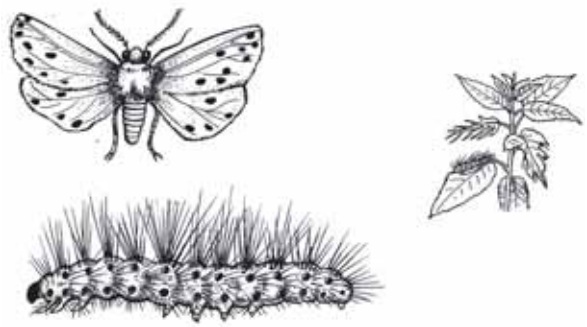

চিত্র : বিছাপোকা ও পাটগাছ।

দমন পদ্ধতি :

১) পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে ডিমের গাদাসহ পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।

২) আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন ডিম থেকে বের হওয়া কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে, তখন পোকাসহ পাতাটি তুলে পায়ে পেষে, গর্তে চাপা দিয়ে অথবা অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।

৩) পাট কাটার পর শুকনো জমি চাষ করলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা পুত্তলি গুলো বের হয়ে আসে যা পোকাখাদক পাখি খেয়ে ফেলে।

৪) বিছা পোকা যাতে আক্রান্ত ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়াতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত ক্ষেতের চারদিকে প্রতিবন্ধক নালা তৈরি করে অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানি নালায় রাখতে হবে।

৫) কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

উড়চুঙ্গা

খ) উড়চুঙ্গা : লক্ষণ: জমিতে গর্ত করে দিনের বেলায় গর্তে বসবাস করে এবং সন্ধ্যা বেলায় গর্ত থেকে বের হয়ে চারা পাটগাছের গোড়া কেটে গর্তে নিয়ে যায়। এতে পাট ক্ষেত মাঝে মাঝে MvQkb¨ হয়ে. যায়। অনাবৃষ্টির সময় আক্রমণ বেশি হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর আক্রমণ কমে যায়। cY বয়স্ক পোকা পাট গাছের শিকড় ও কাণ্ডের গোড়ার অংশ খায়।

দমন পদ্ধতি :

১) প্রতিবছর যেসব জমিতে উড়চুঙ্গার আক্রমণ দেখা যায় সেখানে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি করে বীজ বপন করতে হবে।

২) আক্রান্ত জমিতে চারা ৮-৯ সে.মি. হওয়ার পর ঘন গাছ বাছাই করে পাতলা করতে হবে।

৩) সম্ভব হলে নিকটস্থ জলাশয় থেকে আক্রান্ত জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে জমি চাষের সময় রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) গর্তে কীটনাশক প্রয়োগ করে।

৬) কীটনাশক ঔষধের বিষটোপ প্রয়োগ করে।

গ) ঘোড়া পোকা : লক্ষণ: ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমণ করে। ফলে কচি ডগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। ফলে পাটের ফলন ও আঁশের মান কমে যায়।

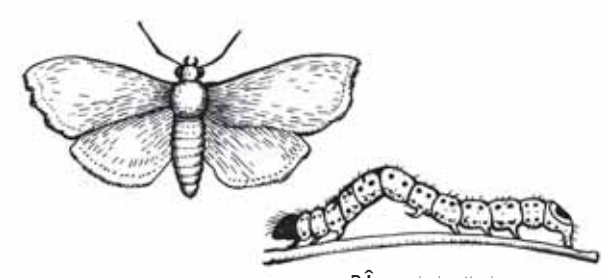

wPÎ : ঘোড়া পোকা

দমন পদ্ধতি :

১) পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন ভেজা দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

২) শালিক বা ময়না পাখি ঘোড়া পোকা খেতে পছন্দ করে। তাই এসব পাখি বসার জন্য পাট ক্ষেতে বাঁশের KwÂ এবং গাছের ডাল পুঁতে দিতে হবে।

৩) কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে রাসায়নিক ঔষধ ছিটাতে হবে।

ঘ) চেলে পোকা : লক্ষণ: ¯¿x পোকা চারা গাছের ডগায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ev"Pv গাছের ভিতরে চলে যায় এবং সেখানে বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মরে যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়। গাছ বড় হলে পাতার গোড়ায় কান্ডের উপর ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ফলে ঐ জায়গায় গিটের সৃষ্টি হয়। পাট পচানোর সময়

wPÎ : †P‡j †cvKv

ঐ গিটগুলো পচেনা। আঁশের উপর কালো দাগ থেকে যায়। এতে আঁশের মান ও দাম কমে যায়।

দমন পদ্ধতি :

১) বীজ বপনের আগে ও পাট কাটার পরে ক্ষেতের আশে পাশে যে সব আগাছা থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

২) আক্রান্ত পাট গাছ গুলো তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

৩) গাছের D"PZv ৫-৬ সেমি লম্বা হওয়ার পর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) মাকড় : পাটক্ষেতে দুই ধরনের মাকড় দেখা যায়। যথা- হলদে ও লাল মাকড়।

লক্ষণ : হলদে মাকড় কচি পাতায় আক্রমণ করে পাতার রস চুষে খায়। এতে কচি পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং পাতার রং তামাটে হয়ে যায়। হলদে মাকড় ফুলের কুঁড়িকেও আক্রমণ করে। ফলে কুঁড়ি ফুটতে পারে না। ফুলের পাপড়ির রং হলদে থেকে কালচে রঙের হয়ে যায় ও ঝরে পড়ে। এতে বীজের ফলনও কমে যায়। একটানা খরা বা অনাবৃষ্টির সময় এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। লাল মাকড় একটু নিচের পাতা আক্রমণ করে।

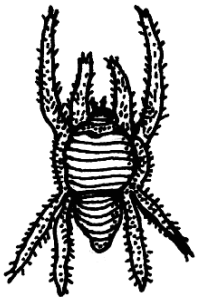

wPÎ : লাল মাকড়

দমন পদ্ধতি :

১) চুন ও গন্ধক ১ঃ২ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত পাট ক্ষেতে ছিটাতে হবে।

২) কাঁচা নিমপাতার রস ২:৫ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৩) কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে রাসায়নিক ঔষধ ছিটাতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

রোগ দমন : পাটে কাণ্ড পচা, কালোপট্টি, গোড়া পচা, শুকনো ক্ষত, ঢলে পড়া, ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) **কাণ্ডপচা রোগ : লক্ষণ :** পাতা ও কাণ্ডে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোনো অংশে দেখা দিতে পারে। দাগগুলোতে অসংখ্য কালো বিন্দু দেখা যায়। এ কালো বিন্দুগুলোতে ছত্রাক জীবাণু থাকে। কখনো কখনো আক্রান্ত স্থানে গোটা গাছই ভেঙে পড়ে। কেনাফ ও †g¯Í¡ পাটে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

খ) **কালো পট্টিরোগ:** এ রোগের লক্ষণ প্রায় কাণ্ড পচা রোগের মতোই। তবে এতে কাণ্ডে কালো রঙের বেষ্টনীর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থানে ঘষলে হাতে কালো গুঁড়ার মতো দাগ লাগে। এ রোগে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

গ) **শুকনো ক্ষত :** এ রোগটি শুধু দেশি জাতের পাটেই দেখা যায়। চারা অবস্থায় আক্রমণ করলে চারা মারা যায়। বড় গাছের কাণ্ডে কালচে দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় এবং ক্ষতস্থানে জীবাণু সৃষ্টি হয়। এ জীবাণু গুলো বাতাসে উড়ে ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফল কালো ও আকারে ছোট হয়। এ রোগে গাছ মরে না, তবে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়। তাই পাট পচানোর পরেও আক্রান্ত স্থানের ছাল পাট কাঠির সাথে লেগে থাকে। এর আঁশ নিম্নমানের হয়।

প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা : কাণ্ড পচা, কালো পট্টি ও শুকনো ক্ষত এ তিনটি রোগই বীজ, মাটি ও বায়ুবাহী। এদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও একই রকমের। যেমন :

১) পাট কাটার পর জমির আগাছা, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত গাছের গোড়া উপড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২) বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হবে।

৩) নীরোগ পাট গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৪) জমি থেকে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬) রাসায়নিক ঔষধ ছিটাতে হবে।

পাট-কাটা ও আঁটি বাঁধা : সঠিক সময়ে পাট না কাটলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তোষা পাট কাটতে হয়। গাছে ফুল আসলে বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। তাই পাট গাছ কাটার পরই এ mg¯Í গাছকে আলাদা করে প্রায় ১০ কেজি ওজনের আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার পর সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমিতেই ¯—c করে রাখলে গাছের পাতাগুলো ঝরে যাবে। পাতাগুলো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাটের পাতা ভালো সার।

চিত্র : পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা।

পাট জাগ দেওয়া :

প্রথমে ১০-১৫ টি আঁটি একদিকে গোড়া রেখে তারপর উল্টা দিকে গোড়া রেখে আরও আঁটি পানির উপর সাজাতে হবে একেই পাটের জাগ বলে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপর ৩০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০টি আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পচে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়। পাট জাগ দেবার জন্য বিল, খাল বা নদীর মৃদু স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানি সর্বাপেক্ষা উত্তম।

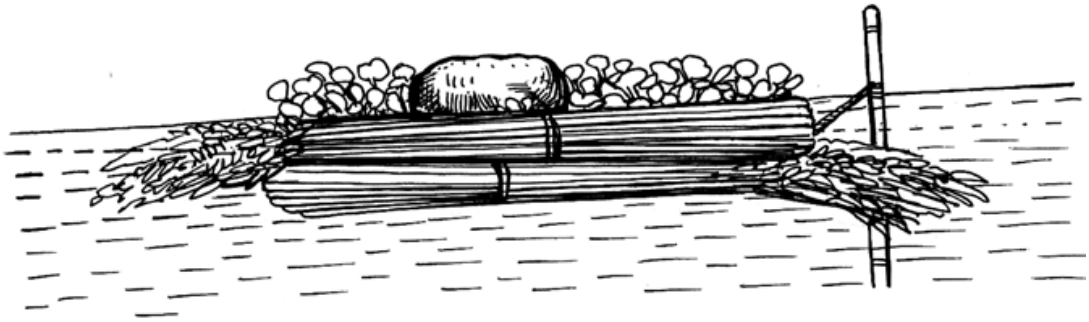

চিত্র : পাট জাগ দেওয়া।

জাগ ডুবানোর জন্য মাটির ঢেলা, কলাগাছ, আমগাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে আঁশের রং কালো হয়। বাঁশের খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে, কিংবা পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে জাগ ডুবানো যায়। জাগ ঢাকার জন্য কচুরিপানা, ধানের খড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাট পচনের সময় নির্ধারণ :

পাট গাছের আঁটি পানিতে ডুবানোর ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে যদি সহজে ছাল তথা আঁশ পৃথক করা যায় তবে বুঝতে হবে পাট গাছের পচন শেষ হয়েছে। গরম আবহাওয়ায় ১২-১৪ দিন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় ২০-২৫ দিনের মধ্যেই পাট পচে যায়।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ: পচার পর গাছ থেকে দু'ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়। যথা-

১) পানি থেকে প্রতিটি আঁটি উঠিয়ে এবং শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি গাছ থেকে আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেয়ার পর কতকগুলো পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে নেওয়া হয়।

২) হাটু বা কোমড় পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুগুর দ্বারা পিটানো হয়। পরে গোড়ার অংশ হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সমানে পিছনে ঠেলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে a‡q নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ : প্রখর mhv‡jv‡K বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেয়ার পর সুন্দর করে আঁটি বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন : জাত ভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশি পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়।

বাংলাদেশের পাট ফসলের গুরুত্ব : পাট একটি আঁশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে সোনালি আঁশ বলে অভিহিত করা হয়। পাট ফসলটি যে সময়ে জন্মায় সে সময় বৃষ্টি থাকে। তাই সেচের দরকার হয় না। পাট ফসলটি খরা ও জলাবদ্ধতা দু'টোই সহ্য করতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের যে সব এলাকায় সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং যেখানে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জমিতে পানি জমে থাকে, সেখানে ধানের চেয়ে পাট চাষ বেশি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার হেক্টর জমি আছে যেখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল চাষ সম্ভব নয়। খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে পাট অন্যান্য ফসলের চেয়ে কম ¶wZM¯Í হয়।

বাংলাদেশে দেশি ও তোষা এ দু'জাতের পাটের চাষ হয়। তবে দেশি জাতের তুলনায় তোষা জাতের পাটের চাষ বর্তমানে বেশি n‡"Q| এর কারণ হলো c‡e যে সব এলাকায় দেশি পাটের চাষ হতো, তা ছিল নিচু এলাকা। বর্তমানে খাদ্য শস্যের চাহিদার জন্য ঐ mg¯— এলাকা ধান চাষের আওতায় চলে গেছে। পাট চলে গেছে ZjbvgjKfv‡e উঁচু fwg এলাকায় যেখানে বৃষ্টি নির্ভরতা বেশি। যাহোক পাট ফসল শুধু আঁশ হিসাবেই নয়, কৃষিজাত শিল্পে, ঔষধি শিল্পে, পরিবেশ সংরক্ষণে ও সবজি হিসাবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধান ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সরিষার চাষ

বাংলাদেশে তেল ফসল হিসাবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, mhgLx প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এ দেশের মানুষ সরিষাকেই প্রধান ভোজ্য তৈল বীজ ফসল হিসাবে বেশি চাষ করে থাকে।

নিম্নে সরিষা চাষ m¤ú‡K আলোচনা করা হলো :

জমি নির্বাচন : সরিষা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ অথবা পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতএব, সহজে পানি নিকাশ করা যায় এরূপ বেলে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

চিত্র : ফুলসহ সরিষা গাছ ও সরিষা বীজ।

জাত নির্বাচন : অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিম্নে সরিষার অনুমোদিত কতকগুলো জাতের নাম, যেমন-

টরি-৭, কল্যাণীয়া (টিএস-৭২), সোনালি সরিষা (এসএস-৭৫), m¤ú` (এম-১২), রাই সরিষা, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬।

বপনের সময় : বাংলাদেশে সরিষা শীতকালীন ফসল। বিভিন্ন AÂ‡ji তারতম্য এবং জমির জো অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস (অক্টোবর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৬ এর বীজ আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

জমি তৈরি : জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী মাটির 'জো' অবস্থায় ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে জমি তৈরি করতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিধায় ঢেলা ভেঙে মই দিয়ে মাটি সমান ও মিহি করতে হবে। জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রয়োজনে সেচ এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :

জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সরিষার জমিতে Kg‡cv÷mvi, ইউরিয়া, টিএসপি, এম পি, জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট, বোরাক্স/বোরিক, এসিড ইত্যাদি সার সঠিক নিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি c¯‘Z করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজেরহার : সরিষার জাত টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর জন্য প্রতি হেক্টরে ৮-১০ কেজি বীজ লাগে।

বপন পদ্ধতি : সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছোট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো

কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোনো একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোনো জায়গায় গাছ ঘন এবং কোনো জায়গায় পাতলা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সারি করে সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির `iZ সাধারণত ২৫-৩০ সেমি. রাখা হয় ও প্রতি সারিতে ৪-৫ সেমি. `i‡Z এবং ২-৪ সেমি. গভীরতায় বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সরিষা ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং সরিষা ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা : সরিষার জমিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিচর্যা করা হয়।

১) **পানিসেচ :** মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত থাকলে সরিষার জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতা বুঝে ২-৩ টি সেচ দিলে বেশ ভালো ফলন হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ গাছে ফল হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের c‡e যদি মাটি শুষ্ক থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত হয়।

২) **গাছ পাতলা করণ :** চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। জমির কোথাও একদম চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।

৩) **আগাছা দমন :** সরিষার জমিতে আগাছা দেখা মাত্র নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আগাছা দমন করা যায়। যে সব জমিতে অরোবাংকির আক্রমণ দেখা যায় সে সব জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাষ না করাই ভালো।

৪) **রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন :** সরিষা ফসলের প্রধান রোগ অল্টারনারিয়া বাইট বা পাতায় দাগ পড়া রোগ অন্যতম। এ রোগ দেখা দিলে গাছের পাতায় প্রথমে বাদামি পরে গাঢ় রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে প্রতিরোধ হিসাবে সঠিক নিয়মে বপন করা দরকার।

৫) **পোকা মাকড় দমন :** সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাবপোকা। ev"Pv ও পরিণত জাবপোকা সরিষার কাণ্ড, পাতা, c®úgÄwi, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ evaM¯Í হয়। ফল কুঁচকে ছোট হয়ে যায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি মাসে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে wmÂb যন্ত্রের সাহায্যে সরিষার ক্ষেতে ছিটাতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ সরিষার ফল খড়ের রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা হলদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উত্তম। gjmn গাছ টেনে তুলে অথবা কাঁচির দ্বারা কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে টেনে তোলাই ভালো।

ফসল মাড়াই : ফসল সংগ্রহের পর ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। কিছু কিছু অপুষ্ট বীজ থাকতে পারে। অপুষ্ট বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ : মাড়াই করার পর বীজ ঝেড়ে রোদে ভালোভাবে ৩-৪ দিন শুকিয়ে নেবার পর শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়। রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিক পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে।

ফলন : বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮১০ কেজি

সরিষা ফসলের গুরুত্ব :

বাংলাদেশের ৩ প্রকার সরিষার চাষ হয়, যথা- টরি, শ্বেত ও রাই। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৪০% আমিষ এবং ৬৪% নাইট্রোজেন থাকে। সরিষার খৈল গরু, মহিষের জন্য খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট জৈব সার। এছাড়া রান্নার কাজে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে বেশ মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদও বলা হয়। কাজেই অর্থনৈতিক, ঔষধশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সরিষা ফসল খুবই গুরুত্বcY|

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরিষা ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

মাসকলাই চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশ মোট উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর cwðgwÂj, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকলাই একটি শক্ত ও খরা-সহিষ্ণু ফসল যা D"P তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ডাল হিসাবে ছাড়াও এটি কাঁচাগাছ অবস্থায় পশুখাদ্য ও সবুজ সার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কাজেই ডাল ফসল হিসাবে মাসকলাই খুবই গুরুত্বcY। এবার আমরা মাসকলাই এর চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K জানব।

জমি নির্বাচন : সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। উঁচু থেকে নিচু সব ধরনের জমিতে মাসকলাই চাষ করা যায় যদি পানি জমে থাকার আশঙ্কা না থাকে। মাসকলাই উষ্ণ ও শুকনো জলবায়ুর ফসল।

চিত্র : মাসকলাই

জাতmgn : বাংলাদেশে চাষকৃত মাসকলাইয়ের বেশ কিছু উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। নিচে মাসকলাই এর কয়েকটি জাতের নাম দেওয়া হলো :

ক) উফশী জাত : বারি-১ (পান্থ), বারি-২ (শরৎ), বারি-৩ (হেমন্ত), বিনামাস-১, বিনা মাস-২
খ) স্থানীয় জাত : রাজশাহী, সাধুহাটি,

জমি তৈরি : মাসকলাই চাষের জন্যে খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময় : মাসকলাই বীজ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

বীজ হার: নিচে মাসকলাই চাষের জন্য বীজ হার দেওয়া হলো :

উদ্দেশ্য	বপন পদ্ধতি	বীজহার (কেজি/হেক্টর
বীজের জন্য	ছিটিয়ে	৩৫-৪০
	সারিতে	২৫-৩০
পশুখাদ্য বা সবুজ সারের জন্য	ছিটিয়ে	৫০-৬০

বীজ বপন পদ্ধতি : মাসকলাইয়ের বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করা যায়। তবে বীজের জন্য সারিতে বপন করা ভালো। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির `iZ ৩০ সেমি. রাখতে হয়। সারিতে বীজগুলো অবিরতভাবে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ বপন করা হয়। ছিটিয়ে পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় মই সাহায্যে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ শোধন : বীজ বাহিত রোগ দমনের জন্য বীজ শোধন করে বপন করা দরকার।

সার ব্যবস্থাপনা : মাসকলাই চাষে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৪০-৪৫
টি এস পি	৮৫-৯৫
এমপি	৩০-৪০
অণুবীজ সার	৪-৫

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি :

১) জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে।

২) জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের দরকার হয় না।

৩) প্রতি কেজি বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ সার প্রয়োগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ মাসকলাই ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং মাসকলাই ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা :

১. চারা গজানোর পরে আগাছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২. জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বপনের পর জমিতে রসের পরিমাণ কম বা অভাব হলে হালকা সেচ দিতে হবে।

৪. সেচের পর 'জো' অবস্থায় মাটির উপরের শক্ত ¯Íi ভেঙে দিতে হবে।

৫. ফসলের জমিতে পোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা :

ক) মাসকলাইয়ের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ ও we¯Ívi **:** mvi‡Kv‡¯úviv নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ we¯Ívi লাভ করে। অধিক আর্দ্রতা ও D"PZv‡c এ রোগ দ্রুত we¯Ívi লাভ করে।

রোগের লক্ষণ : আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের †KvlmgN শুকিয়ে যায় এবং পাতা ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে m¤úY পাতা ঝলসে যায়।

প্রতিকার : ১) রোগ প্রতিরোধী জাতের (বারি-১, বারি ২ ও বারি ৩) মাসকলাই চাষ করতে হবে। ২) আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিও রোগ :

রোগের কারণ ও we¯—vi **:** ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা যায়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ we¯Ívi লাভ করে।

রোগের লক্ষণ : ১) পাতার উপর পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। ২) হাতে ¯úk করলে পাউডারের গুঁড়ার মতো লাগে।

প্রতিকার : ১) বিকল্প পোষক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ২) টিল্ট বা থিওভিট প্রয়োগ করতে হবে। ৩) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। ৪) ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ ও we¯Ívi **:** মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ we¯Ívi লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

রোগের লক্ষণ :

১) কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়।

২) আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে।

৩) `i থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

প্রতিকার:

১) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।

২) সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

৩) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪) শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৫) রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকলাইয়ের (যেমন : বারি-১, বারি ২, বারি ৩ এবং বিনা মাস-১) চাষ করতে হবে।

পোকা ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই ফসলে বিছা পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ পোকা পাতা, অপরিপক্ব সবুজ ফলের রস খেয়ে ফেলে। পাতাসহ mg¯— গাছ সাদা জালিকার মতো হয়ে যায়। ফলে ফলন কমে যায়। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে হাত দ্বারা সেগুলোকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে পরিমাণ মতো সিমবুশ ১০ ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া গুদামজাত মাসকলাই ডাল cYeq¯‹ পোকা ও কীড়া উভয়ই ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। গুদামজাত করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দানা শুকিয়ে দানার আদ্রর্তা ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টনপ্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ:

১) খরিপ-১ মৌসুমে মে মাসের শেষ এবং খরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষ মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়।

২) পরিপক্ব হলে সকালের দিকে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

৩) জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একবার বা ২-৩ বার ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

৪) প্রথম দিকে পরিপক্ব ফল হাত দিয়ে এবং শেষবারের বেলায় কাঁচি দিয়ে গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে।

৫) গাছগুলো রোদে শুকিয়ে লাটি দিয়ে পিটিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৬) সংগৃহীত বীজ রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হবে।

ফলন : জাত ভেদে মাস কলাইয়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই ফসলের পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

আমরা শাক সবজি প্রতিনিয়তই ফসলের জমিতে, বাগানে, হাটে বাজারে দেখতে পাই। আমরা এগুলো নিজের জমি থেকে বা বাজার থেকে সংগ্রহ করে শাকসবজির চাহিদা ciY করে থাকি। এবার আমরা এসব শাকসবজির চাষ m¤ú‡K জানবো। তবে চাষ পদ্ধতি জানার আগে শাকসবজির গুরুত্ব, চাষপদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

১) শাকসবজির গুরুত্ব : শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বের উন্নত দেশ mg‡n সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার অতি D"P পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করে একদিকে পারিবারিকভাবে চাহিদা মেটানো যায় এবং অন্য দিকে অতিরিক্তগুলো বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করা যায়। কাজেই খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ ও অর্থকরী ফসল হিসাবে শাকসবজি চাষ করা খুবই জরুরি।

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি।

১. খাদ্য হিসাবে শাকসবজি :

১.১. খাদ্য মান হিসাবে : শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, বি ও সি থাকে। এ ছাড়া আমিষ, ক্যালরি ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসাবেও শাকসবজির গুরুত্ব অনেক।

১.২. ভেষজ গুণাগুণ হিসাবে শাকসবজি : শাকসবজির ভেষজ গুণাগুণ হিসাবে অনেকঅবদান রয়েছে। যেমন- শশা হজম ও কোষ্ঠ কাঠিন্যের কাজ করে। রসুন বাত রোগ সারে ইত্যাদি।

১.৩. অর্থনৈতিক দিক থেকে শাকসবজি : মানব দেহের জন্য শাকসবজি অত্যাবশ্যক। সুস্থ ও সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই শাকসবজি উৎপাদনে একদিকে পরিবারের চাহিদা মেটানো যায় অন্যদিকে এগুলো বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। শাকসবজি চাষ করে পতিত জমির ব্যবহার করা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে এবং মহিলা ও পারিবারিক শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বcY।

২. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ :

পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজির চাষাবাদ হয়। উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে এসব শাকসবজিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) শীতকালীন শাকসবজি (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (৩) বারমাসি শাকসবজি। যেমন :

শীতকালীন সবজি : টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, গাজর ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন সবজি : করলা, ঝিঙা, পটল, ধুন্দল ইত্যাদি।

বারমাসি সবজি : বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে, কাঁচকলা ইত্যাদি।

কাজ : শীত, গ্রীষ্ম ও বারমাসি শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

শিম, টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। বর্তমানে দুই একটি জাত বের হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। গিমা কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং খিরা মিলিয়ে শসা জাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায়। তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

৩. শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয় : আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন শাকসবজির নাম এবং কোনোগুলো কোনো মৌসুমে জন্মায় তা জেনেছি। এবার শাকসবজি উৎপাদনের সাথে গুরুতcY বিষয়াবলি m¤ú‡K জেনে নেই।

কোনো ফসল তথা শাকসবজি চাষ বা উৎপাদন করার c‡e নিম্নলিখিত গুরুতcY বিষয়াবলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১) ভালো বীজ ২) বীজতলার জমি নির্বাচন ও তৈরি ৩) বীজ বপন ও বীজতলার যত্ন ৪) gj জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি ৫) বীজ বপন ও রোপণ ৬) পানি সেচ ও নিকাশ ৭) আগাছা দমন ও মালচিং ৮) পোকামাকড় দমন ৯) রোগ দমন ১০) সময় মতো ফসল সংগ্রহ।

৪. শাকসবজি চাষ পদ্ধতি : শাকসবজি চাষাবাদের বেশ কিছু পদ্ধতি দেশে বিদেশে চালু আছে। এগুলোর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি হলো পর্যায় ক্রমিক চাষ পদ্ধতি, মিশ্র ফসল পদ্ধতি, রিলে ফসল পদ্ধতি, ফালি ফসল পদ্ধতি, সারিতে ফসল চাষ পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকটি শাকসবজির চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পালংশাক চাষ

পালংশাক বেশ জনপ্রিয়, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু পাতা সবজি। এ সবজি অধিক ভিটামিনসমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

চিত্র : পালংশাক

পালংশাকের জাত : পুষা জয়ন্তী, কপি পালং, গ্রিন, সবুজ বাংলা ও টকপালং। এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, c®ú জ্যোতি ইত্যাদি।

মাটি : দোআঁশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী। এছাড়াও এঁটেল, বেলে-দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি : জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মিহি করে তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি:

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ wK¯—‡Z উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আল নির্বাচন ও তৈরি : জমিতে আল তৈরি করেও পালংশাক চাষ করা যায়। উঁচু আল পালংশাকের জন্য নির্বাচন করা হয়। উঁচু আলে কিছুটা আগাম পালংশাক বীজ বপন করা যায়। কোদাল দিয়ে আলের মাটি কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ : পালংশাকের জমিতে নিয়ম অনুযায়ী গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের হার :

প্রতি আলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৩৫-৪০ গ্রাম	১১৭ গ্রাম	৯-১১ কেজি	২৫-৩০ কেজি

বীজ বপনের সময় : সেপ্টেম্বর- জানুয়ারি মাস।

বীজ বপনের দরত্ব : ১০ সেমি `‡i `‡i বীজ বপন করতে হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়।

অঙ্কুরোদগমের সময় : বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : জমিতে আলে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে সে চারা রোপণ করেও পালংশাক চাষ করা যায়। বীজ বপনের c‡e বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট `i‡Z গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে পালংশাক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা :

আগাছা নিধন : জমিতে আগাছা দেখা দিলেই তা তুলে ফেলতে হবে।

সার উপরিপ্রয়োগ : সময় মতো নিয়মানুযায়ী সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ : এ শাকের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপণের পর হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

শন্যস্থান পরণ : কোনো স্থানের চারা মরে গেলে অথবা বীজ না গজালে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপণ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ : গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বেশি দিন রস ধরে রাখা এবং মাটিতে যাতে সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবার পানি সেচের পর আল/জমির উপরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলা করণ : বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় : পালংশাকে মাঝে মাঝে পিপঁড়া, DiP½ , উইপোকা এবং পাতাছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়।

রোগ ব্যবস্থাপনা : পালংশাকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে- ১) গোড়া পচা রোগ ২) পাতার দাগ রোগ ৩) পাতা ধ্বসা রোগ।

এছাড়া পালংশাকে আরও দুইধরনের রোগ দেখা যায়। যেমন- ডাউনি মিলডিউ, পাতায় দাগ।

ফসল সংগ্রহ : বীজ বপনের এক মাস পর থেকে পালংশাক সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং গাছে ফুল না আসা পর্যন্ত যে কোনো সময় সংগ্রহ করা যায়।

ফলন :

প্রতি আলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৮-১০ কেজি	২৮-৩৭ কেজি	২৮০০ -৩৮০০ কেজি	৭-৯ টন

পুঁইশাক

পুঁইশাক বাংলাদেশের প্রধান গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুঁইশাক সাধারণত বসতবাড়ির আঙিনার বেড়ায় বা মাচায় জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

জাত : পুঁইশাকের দুইটি জতের চাষ হয়ে থাকে। যথা।

ক) লাল পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড লালচে। খ) সবুজ পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড সবুজ।

এছাড়াও বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি জাতে আছে। যেমন বারি-১, বারি-২।

চিত্র : পুঁইশাক

জমি তৈরি : সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাস পুঁইশাক লাগানোর ভালো সময় তবে সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্গুন মাস হতেই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপণের c‡e জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা করে তৈরি করে নিতে হবে। এ সবজি চাষের জন্য উর্বর বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি উত্তম।

সার প্রয়োগ : পুঁইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো। এতে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুঁইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি:

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ ‖K‖¯–‡Z উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণ : মার্চ-এপ্রিল মাসে পুঁইশাকের বীজ বপন করতে হয়। বীজ ও শাখা কলম দিয়ে পুঁইয়ের চাষ করা যায়। তবে বীজ দিয়ে চারা তৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুঁইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি. `‡i `‡i সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি `‡i `‡i রোপণ করতে হবে। বর্ষার সময় পুঁইশাকের লতার কিছু অংশ কেটে মাটিতে রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা :

নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পোকামাকড় : এ শাকের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে শুঁয়োপোকা উলেখযোগ্য। এ পোকা গাছের পাতা, কচি ডগা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : পুঁইশাকের ডগা লম্বা হতে শুরু কলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কয়েকবার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভালোভাবে চাষ করলে প্রতি শতকে ১৩০-১৫০ কেজি পুঁইশাকের ফলন পাওয়া যায়।

বেগুন চাষ

অতি পরিচিত সবজি। বেগুন সারা বছর পাওয়া যায়। এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, cwK¯—vb, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় †`kmn প্রভৃতি দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

জাত : ইসলামপুরী, শিংনাথ, উত্তরা, নয়নকাজল, মুক্তকেশী, খটখটিয়া, তারাপুরী, নয়নতারা উলেখযোগ্য। বারমাসী কালো ও সাদা বর্ণের জাত(ডিম বেগুন) রয়েছে। বিদেশি জাতের মধ্যে ব্যাক বিউটি, ফ্লোরিডা বিউটি, উলেখযোগ্য।

বীজবপন ও চারা উৎপাদন : বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বcY কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণ মাসের মাঝমাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য চৈত্র মাস chšÍ বীজ বপন করা যায়। বালি, কমপোস্ট ও মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়।

চিত্র : বেগুনসহ বেগুনগাছ

জমি নির্বাচন : দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে পানি অপসারণের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এঁটেল ও দোআঁশ মাটিতেও বেগুনের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি : জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি:

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ wK¯—‡Z উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ : এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে তুলে নিতে হবে। চারা গাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর ৭৫ সেমি. `i‡Zi সারিতে ৬০ সেমি. `‡i `‡i চারা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং বেগুন চাষ পদ্ধতির উপর একটি দলীয় প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

পরিচর্যা : মাটিতে রসের অভাব হলে বা মাটি শুকিয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

বেগুনের বালাই ব্যবস্থাপনা : এ দেশে কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির পোকা এবং একটি প্রজাতির মাকড় বেগুন ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা এই পোকা বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্র করে। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কীটনাশকের যে কোনো একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মি.লি. মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের বালাই দমন করা যায়-

ক) কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উইল্টরোগ দমন করা যায়।

খ) ফেরোমন ও মিষ্টিকুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।

গ) মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেগুন, টমেটো, শশা, বাঁধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।

ঘ) সঠিক সময়ে আগাছা দমন ও মালচিং করলে ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

ঙ) পোকা প্রতিরোধী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা দমন করা যায়। যেমন- বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারিবেগুন-৫ (নয়নতারা), বারিবেগুন-৬, বারিবেগুন-৭ ইত্যাদি পোকা প্রতিরোধী জাত।

চ) পোকার আক্রমণমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে।

ছ) সুষম সার ব্যবহার করে।

জ) শস্য পর্যায় অনুসরণ করে

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। বেগুনের ফল বীজ শক্ত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ১৪০ কেজি বেগুন উৎপন্ন হয়। উত্তরা বেগুন ২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

বিপণন : বেগুন ফসল সংগ্রহের পর ঠান্ডা ও খোলা জায়গায় কয়েক দিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে e¯Íwq বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না। এতে বেগুন তার স্বাভাবিক রং হারাতে পারে এবং পচে যেতে পারে।

কুমড়া চাষ

কুমড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সবজি। এ জাতীয় সবজির কিছু গ্রীষ্মকালীন ও কিছু শীতকালীন জাত আছে যা বাংলাদেশে জন্মায়। আবার কিছু জাত আছে যাদেরকে সারা বছরই সংরক্ষণ করে সবজির চাহিদা ciY করা যায়। কুমড়া জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ প্রধান। আমরা এখন মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ সবজিগুলো m¤ú‡K জানব।

ক) মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভমিকা : মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়। মিষ্টিকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাঘী এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

চিত্র : মিষ্টি কুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

চাষের সময় : বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ এবং মাঘী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ : মাদার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার `i‡Z ৮০-১০০ ঘন সেমি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে গোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১৩০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও `¯Í॥ সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাদার চারপাশে অগভীর একটি নালা কেটে সার নালার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন : মাদা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি বীজ মাদার মাঝখানে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা : আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে চারা গাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। গোড়ার কাছাকাছি কিছু খড় ১৫-২০ দিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। ফল ধরা শুরু করলে ফলের নিচেও খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া মাটিতে হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাপাতা বেশি হলে কিছু লতাপাতা ছেঁটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন : কুমড়া জাতীয় গাছের বিভিন্ন পোকার মধ্যে লাল পোকা, কাঁটালে পোকা এবং ফলের মাছি উলেখ্য যোগ্য। এ পোকা দমনের জন্য সেভিন। ডায়াজিনন প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ জাতীয় সবজির রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিও, ডাউনি মিলডিও ও এনথ্রাকনোজ প্রধান। দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াথেন প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : মিষ্টিকুমড়া কচি অবস্থা থেকে শুরু করে c॥icY পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কচি অবস্থা থেকেই ফসল সংগ্রহ শুরু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক প্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।

খ) চালকুমড়া চাষ

ভমিকা : গ্রামবাংলায় ঘরের চালে এ সবজি গাছ উঠানো হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাচায় ফলন বেশি হয়। কচি ফল (জালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপক্ব ফল মোরব্বা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাল কুমড়ার জাত : বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব AÂ‡j চাষ করা যায়।

চিত্র : চালকুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

মাটি : দোআঁশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদা মাটি ছাড়া যে কোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময় : ফেব্রুয়ারি-মে

মাদা তৈরি : জমি ভালোভাবে চাষ করে মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। জমিতে মাদার D"PZv হবে ১৫-২০ সেমি., প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইট মাদার মাঝখানে ৬০ সেমি. ck¯Í সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে। পারিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় বোনার পর গাছ বুনে গাছ মাচা, ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেওয়া হয়।

মাদায় সার প্রয়োগ : প্রতি মাদায় গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

মাদায় গর্ত তৈরি : মিষ্টিকুমড়া চাষের নিয়মের অনুরূপ।

মাদার গর্তে বীজবপন : প্রতি মাদায় সারিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা গজানোর কয়েকদিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি সবল গাছ রাখতে হবে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করে চালকুমড়া মিষ্টি কুমড়ার চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে জমা দিতে বলবেন।

পরিচর্যা : মাদা শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধির জন্য মাচা দিতে হবে। মাদার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা : ফলের মাছি পোকা, রেড পামকিন বিটল, ইপিল্যাকনা বিটল, লাল মাকড় প্রভৃতি পোকা ফলের ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাউডারি মিলডিও পাতার উপরে সাদা পাউডার এবং ডাউনি মিলডিউ পাতার নিচে ami বেগুনি রং প্রভৃতি রোগ পাতার ক্ষতি করে গাছকে `ej করে ফেলে। ছত্রাক নাশক বা বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

লাউ চাষ

fwgKv **:** বাংলাদেশে লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউয়ের চেয়ে এর শাক বেশি পুষ্টিকর।

লাউয়ের জাত : বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চোখে পড়ে। ফলের আকার-আকৃতি এবং গাছের লতানোর পরিমাণ থেকেও জাতগুলো পাথর্ক্য করা যায়। যাহোক দেশীয় উন্নত এবং গবেষণালব্ধ কিছু জাতের নাম নিম্নে উলেখ করা হলো:

ক) দেশীয় জাত : গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ।

খ) বারিলাউ ১, বারিলাউ ২ : লম্বা হালকা সবুজ

গ) হাইব্রিড জাত : গোলাকার বা লম্বা

মাটি : প্রায় অনেক মাটিতেই লাউ ভালো উৎপাদিত হয়। তবে দোআঁশ মাটিতে লাউয়ের ফলন ভালো হয়। বেলে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে সহজে লাউ চাষ করা যায়।

বীজ বপনের সময় : আগস্ট-নভেম্বর

মাটি তৈরি, মাদা তৈরি, মাদায় সার প্রয়োগ ও মাদায় গর্ত তৈরি প্রভৃতি চালকুমড়া চাষের বর্ণনার অনুরূপ।

বীজ বপন : প্রতিমাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হবে।

বাউনি ও মাচা তৈরি : গাছ যখন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা KwÂmn মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

পরিচর্যা : চারা একটু বড় হলে প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে ঝুরঝুরা করতে হবে। লাউগাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি প্রতিদিন দিতে হবে।

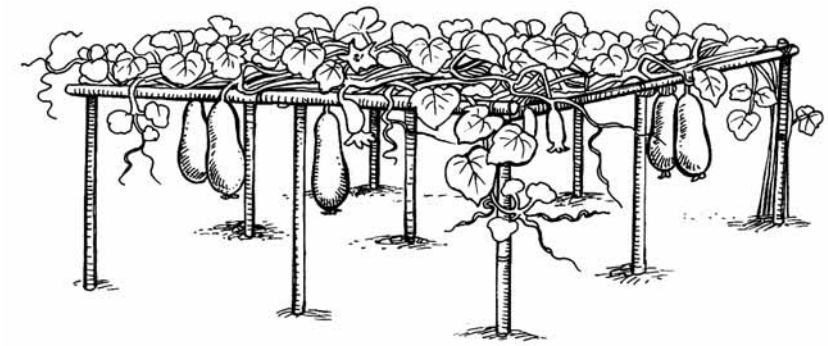

চিত্র : মাচাসহ লাউগাছ

বালাই ব্যবস্থাপনা : এ সবজিতে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া কিছু প্রজাতির ঘাসের মাধ্যমে লাউয়ের 'মোজাইক ভাইরাস' রোগ হতে পারে।

ফসল সংগ্রহ : ফল তোলা বা সংগ্রহ করার উপযুক্ত পর্যায় হবে যখন-

- ফলের গায়ে প্রচুর শুং এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নোখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ডেবে যাবে।
- পরাগায়ণের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

ফলন : বারি লাউ-১ এবং বারি লাউ-২ চাষ করলে যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি/শতক) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

শিম চাষ

শিম বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। এটি শীতকালীন সবজি।

মাটি : দোআঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। তবে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়।

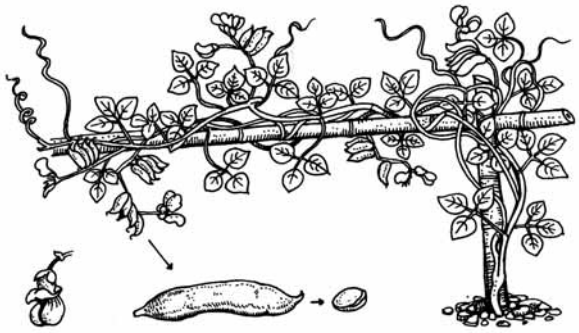

চিত্র : শিমসহ শিমগাছ

জাত : বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪, ইপসা শিম, ঘৃত KvÂb, কার্তিকা, নলডক, বাঘনখা, বারমাসি প্রভৃতি শিমের জনপ্রিয় জাত।

বীজ বপনের সময় : মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি : বেশি জমিতে আবাদ করলে জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। তবে বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আলে সাধারণত শিমের চাষ করা হয়।

মাদা তৈরি : জমিতে মাদা (গর্ত) ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি ×৪৫ সেমি আকারে তৈরি করতে হবে। এক মাদা থেকে আরেক মাদার `iZ ২.৫-৩ মিটার।

সার প্রয়োগ : প্রতিটি মাদা পচা আবর্জনা সার দিয়ে ciY করতে হবে। তারপর প্রতিটি মাদায় খৈল গুঁড়া, ছাই, টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাদাটি এমনভাবে ভরতে হবে যেন মাটি থেকে ভরাটকৃত মাদার D"PZv ১০ সেমি হয়। শিম ফসলটিতে নাইট্রোজেন সারের তেমন দরকার হয় না। কারণ এটি লিগুম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ফসল। এদের শিকড়ে নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে প্রচুর বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

বীজ বপন : সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পরিচর্যা : গাছ ঠিকমত বাড়ার জন্য মাচা দিতে হবে। গাছের গুঁড়ার মাটি শক্ত হলে নিড়ানি দিয়ে তা আলগা করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষায় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সে জন্য গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ wK¯Í‡Z ৬০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০ গ্রাম এমপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা : শিম গাছে জাব পোকা, থ্রিপস, পড বোরার ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে। জাব পোকা নতুন ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। নিমের বীজের শাঁস পিসে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এদের দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : জাত ভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম উঠানো যায়। বীজ হিসাবে শিম সংগ্রহ করতে শিম যখন গাছে শুকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সংগ্রহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার ও শুষ্ক পাত্রে নিমের শুকনা পাতার গুঁড়াসহ সংরক্ষণ করতে হবে।

চিত্র : শিম গাছের জাবপোকা।

ফলন : জাতভেদে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন- বারি শিম-১ জাতের শিমের বীজ হেক্টরপ্রতি ২-৩ টন (৮-১২ কেজি/শতক) উৎপাদিত হয়। সবজি হিসাবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে শিম ধরে। শিম গাছ ৪ মাসেরও বেশি ফলন দেয়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে পালং, পুঁই, কুমড়া, শিম ও বেগুনের রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি

ফুলের চাষ :

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ হয় না। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি রজনীগন্ধা, গোলাপ ও গ#ডিওলাসের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বেলি, জুঁই, চামেলি, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, শেফালি, চন্দ্রমলিকা প্রভুতি নানা ধরনের ফুল জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এসব ফুলের চাষ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। আমরা এবার শুধু গোলাপ ও বেলি ফুল চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K জানব।

গোলাপ চাষ

গোলাপকে ফুলের রানি বলা হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুজমিতে গোলাপের চাষ n‡"Q Ges দিন দিন গোলাপের চাষ বৃদ্ধি c‡"Q| এবং গোলাপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বcY অবদান রাখছে।

জাত সমহ : পৃথিবীজুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপি এবং মিশ্রিত রঙের হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রানি এলিজাবেথ (গোলাপি), ব্যাক প্রিন্স (কালো), ইরানি (গোলাপি), মিরিন্ডা (লাল), দুই রঙা ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়।

বংশwe¯—vi **:** গোলাপের বংশ we¯—v‡ii জন্য অবস্থাভেদে শাখা কলম, দাবা কলম, গুটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ উৎপাদন করে তা থেকে চারা উপাদন করা হয়।

জমি নির্বাচন: গোলাপ চাষের জন্য উর্বর দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করা উত্তম। ছায়াবিহীন উঁচু জায়গা যেখানে জলাবদ্ধতা হয় না, এরূপ জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে।

জমি তৈরি: নির্বাচিত জমি ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরা ও সমতল করতে হবে। এরপর মাটি কুপিয়ে ৫ সেমি উঁচু করে ৩ মি. × ১ মি. আকারের বেড বা কেয়ারি তৈরি করতে হবে। এভাবে কেয়ারী তৈরির পর নির্দিষ্ট `i‡Z ৬০ সেমি. × ৬০ সেমি. আকারের এবং ৪৫ সেমি. গভীর গর্ত খনন করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন আগে গর্ত করে খোলা রাখতে হবে। এ সময়ে গর্তের জীবাণু ও পোকামাকড় মারা যায়।

চিত্র : ফুলসহ গোলাপের ডাল

সার প্রয়োগ: প্রতি গর্তের উপরের মাটির সাথে ছকে প্রদত্ত সারগুলো মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর নিচের মাটির সাথে ৫ কেজি পচা গোবর, ৫ কেজি পাতা পচা সার ও ৫০০ গ্রাম ছাই ভালোভাবে মিশিয়ে গর্তের উপরের ¯—‡i দিতে হবে। এভাবে গর্ত m¤úiY ভরাট করার পর ১৫-২০ দিন ফেলে রাখলে সারগুলো পচবে ও গাছ লাগানোর উপযুক্ত হবে। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সে জন্য নালা তৈরি করতে হবে।

চারা বা কলম রোপণ: আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পৌষ মাস পর্যন্ত চারা লাগালে বেডের গর্তের মাঝখানে ক্ষুদ্রাকৃতির গর্ত খুঁড়ে চারা লাগাতে হয়। প্রথমে পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টব থেকে চারা বের করে দুর্বল শাখা,

রোগাক্রান্ত শিকড় ইত্যাদি কেটে ফেলতে হয়। চারা লাগিয়ে গোড়ায় শক্তভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটি পুতে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগিয়ে গোড়ায় পানি দেওয়া উচিত। ২-৩ দিন ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পরিচর্যা

ক) আগাছা দমন : গোলাপের কেয়ারিতে অনেক আগাছা হয়। আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

খ) পানি সেচ : মাটির আর্দ্রতা যাচাই করে গাছের গোড়ায় এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন মাটিতে রসের ঘাটতি না হয়।

গ) পানি নিকাশ : গোলাপের কেয়ারীতে কোনো সময়ই পানি জমতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গোলাপ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

ঘ) ডাল-পালা ছাঁটাইকরণ (Prunning) : গোলাপের নতুন ডালে বেশি ফুল হয়। তাই পুরাতন ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রতিবছর গোলাপ গাছের ডালপালা ছাঁটাই করলে গাছের গঠন কাঠামো সুন্দর ও সুদৃঢ় হয় এবং অধিক হারে বড় আকারের ফুল ফোঁটে।

ঙ) ফুলের কুড়ি ছাঁটাই : অনেক সময় ছাঁটাই করার পর gjMv‡Qi ডালে অনেক পত্রমুকুল ও ফুলকুঁড়ি জন্মায়। সবগুলো কুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল তেমন বড় হয় না। তাই বড় ফুল ফোটার জন্য আসল কুঁড়ি রেখে পাশের কুঁড়ি গুলো ধারালো চাকু দিয়ে কেটে দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফুলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বাগান পরিদর্শন শেষে গোলাপ ফুলের চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা : গোলাপ গাছে যেসব পোকা দেখা যায় তন্মধ্যে রেড স্কেল ও বিটল প্রধান।

ক) রেড স্কেল : এ পোকা দেখতে অনেকটা মরা চামড়ার মতো। গরমের সময় বর্ষাকালে এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের বাকলের রস চুষে খায়। ফলে বাকলে ছোট ছোট কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার না করলে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। গাছের সংখ্যা কম হলে দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে ব্রাশ করলে পোকা পড়ে যায়। ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন ঔষধ প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।

খ) বিটল পোকা : শীতকালের শেষে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ফুলের পাপড়ি ছিদ্র করে খায়। সাধারণত রাতের বেলা আক্রমণ করে। আলোর ফাঁদ পেতে এ পোকা দমন করা যায়। ম্যালথিয়ন বা ডাইমেক্রন ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা : গোলাপ গাছে অনেক রোগ হয়। তন্মধ্যে কালো দাগ পড়া রোগ, ডাইব্যাক ও পাউডারি মিলডিউ প্রধান।

ক) কালো দাগ পড়া রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। রোগাক্রান্ত গাছের পাতায় গোলাকার কালো রঙ্গের দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে গিয়ে গাছ cÎkb¨ হয়ে যায়। চৈত্র থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ

রোগের আক্রমণ ঘটে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য গাছে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সে দিকে খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

খ) ডাইব্যাক : ডাল ছাঁটাইয়ের কাটা স্থানে এ রোগ আক্রমণ করে। এ রোগ হলে গাছের ডাল বা কাণ্ড মাথা থেকে কালো হয়ে নিচের দিকে মরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং m¤úY গাছ মারা যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত কাণ্ড বা ডালের বেশ নিচ থেকে কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের চাকু জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ডাল ছাঁটাই করা উচিত। কর্তিত স্থান w¯úwiU দিয়ে মুছে দিতে হবে।

গ) পাউডারি মিলডিউ : এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। শীতকালে কুয়াশার সময় এ রোগে we¯—vi ঘটে। এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতা, কচিফুল ও কলিতে সাদা পাউডার দেখা যায়। ফলে কুঁড়ি না ফুটে নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত ডগা বা পাতা তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া থিওভিট বা সালফার ডাইথেন এম-৪৫ পানিতে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করে এ রোগ করা যায়।

ফুল সংগ্রহ : ফুল ফোটার c‡eB গাছ হতে ফুল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের পর ফুলের ডাটার নিচের অংশ পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখলে ফুল ভালো থাকে। মাঝে মাঝে ফুলে পানির ছিটা দেওয়া ভালো।

বেলি ফুল চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুলের তোড়া, ফুলের মালাতে সুগন্ধীফুল হিসাবে বেলির কদর আছে। উৎসব ও অনুষ্ঠান বেলিফুল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অর্থকরী ফুল।

জাত : তিন জাতের বেলি ফুল দেখা যায়। যথা : ১। সিঙ্গাল ধরনের ও অধিক গন্ধযুক্ত। ২। মাঝারি আকার ও ডবল ধরনের। ৩। বৃহদাকার ডবল ধরনের

চিত্র : ফুলসহ বেলিফুল গাছ

বংশ we¯—vi : বেলি ফুল গুটি কলম, দাবা কলম ও ডাল কলম পদ্ধতির মাধ্যমে eskwe¯—vi করা হয়।

চিত্র : টবে দাবা কলম

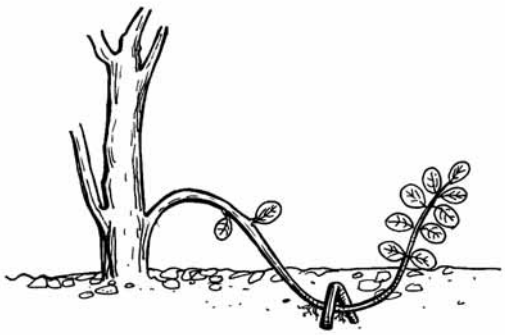

চিত্র মাটিতে দাবা কলম

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ

বেলে মাটি ও ভারী এঁটেল মাটি ব্যতীত সব ধরনের মাটিতে বেলি ফুল চাষ করা যায়। জমিতে পানি সেচ ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকা ভালো। জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। জমি তৈরির সময় জৈব সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমপি প্রযোগ করতে হবে। প্রায় ১ মিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগনোর পর ইউরিয়া প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হবে।

কলম বা চারা তৈরি : গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলি ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির `iZ ৫০ সেমি. হতে হবে। চারা লাগনোর জন্য গর্ত খুঁড়ে গর্তের মাটির রোদ খাইয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম বসাতে হবে। বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায়।

টবে চারা লাগনো : জৈব পদার্থ যুক্ত দোআঁশ মাটিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার পরিমাণমতো মিশিয়ে টবে বেলি ফুলের চাষ করা যায। টব ঘরের বারান্দা বা ঘরের ছাদে রেখে দেওয়া যায়।

পরিচর্যা

ক) সেচ দেওয়া : বেলি ফুলের চাষে জমিতে সবসময় রস থাকা দরকার। গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পরপর শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর ও বর্ষাকালে বৃষ্টি সময়মতো না হলে জমির অবস্থা বুঝে ২-১ টি সেচ দেওয়া দরকার।

খ) আগাছা দমন : জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না।

গ) অঙ্গা ছাঁটাইকরণ : প্রতিবছরই বেলি ফুলের গাছের ডাল-পালা ছাঁটাই করা দরকার। শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করতে হবে। মাটির উপরের ¯—i থেকে ৩০ সেমি. উপরে বেলি ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে। অঙ্গা ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা :

বেলি ফুল গাছে ক্ষতিকারক কীট তেমন দেখা যায় না। তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। এদের আক্রমণে পাতায়

সাদা A¯—iY পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে যায়। গন্ধক গুঁড়া বা গন্ধক ঘটিত মাকড়নাশক ঔষধ যেমন- সালট্যাফ, কেলথেন ইত্যাদি পাতায় ছিটিয়ে মাকড় দমন করা যায়।

বেলি ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার ছত্রাক রোগ দেখা যায়। এগ্রোসান বা ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফলন : ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। ফলন প্রতি বছর বাড়ে। লতানো বেলিতে ফলন আরও বেশি হয়। সাধারণত ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে ফেলে নতুন চারা লাগানো হয়।

কাজ : "গোলাপ ও বেলি ফুলের চাষ করে বেকারত্ব `i করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব"-এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফলের চাষ :

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফল জন্মায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা কলা ও আনারস চাষ m¤ú‡K জানব

কলা চাষ

কলা বাংলাদেশের সব জেলায়ই কম বেশি জন্মে। তবে নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এসব জেলায় কলার ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে বছরে ছয় লক্ষাধিক টন কলা পাওয়া যায়। কলা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলায় ক্যালরির পরিমাণও বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কলার চাষ হয়ে থাকে। কলা কাঁচা অবস্থায় তরকারি হিসাবে এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসাবে কলা খাওয়া হয়। রোগীর পথ্য হিসাবে কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

কলার জাত

বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশে যেসব কলার জাত চাষ করা হয় সেগুলো n‡"Q অমৃতসাগর, সবরি, চাপা, মেহেরসাগর কবরী ইত্যাদি। এ ছাড়াও কলার আরও অনেক জাত আছে যেমন : এঁটে কলা, বাঙলা কলা, জাহাজি কলা, কাচঁকলা বা আনাজি কলা ইত্যাদি। তবে বারি কলা-০১-বারিকলা-২ ও বারিকলা -৩ নামে তিনটি উন্নত জাত চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বারিকলা -২ জাতটি কাঁচকলার।

কলার উৎপাদন প্রযুক্তি : কলার উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো n‡"Q মাটি ও জমি তৈরি, রোপণের সময় ও চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি।

মাটি ও জমি তৈরি :

১। উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য ভালো।

২। জমিতে প্রচুর m‡hi আলো পড়বে এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। গভীরভাবে জমি চাষ করে দুই মিটার `‡i `‡i ৫০ সেমি. × ৫০ সেমি × ৫০ সেমি আকারের গর্ত খুঁড়তে হবে।

৪। চারা রোপণের প্রায় একমাস আগে গর্ত করে গর্তে গোবর ও টি এস পি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত cY করতে হবে।

চারা রোপণের সময় : বছরে তিন মৌসুমে কলার চাষ করা হয় বা কলার চারা রোপণ করা হয় যথা :

১। আশ্বিন-কার্তিক ২। মাঘ- ফাল্গুন ৩। চৈত্র- বৈশাখ

চিত্র : কাদিসহ কলাগাছ

কলার চারা নির্বাচন : কলার চারাকে তেউড় বলা হয়।

দুই রকমের তেউড় দেখা যায়। যথা :

১। অসি তেউড় (Sword Sucker)

২। পানি তেউড় (Water Sucker)

অসি তেউড় : কলা চাষের জন্য অসি তেউড় উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, mPv‡jv এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো। গোড়ার দিকে মোটা এবং ক্রমশ উপরের দিকে সরু হতে থাকে।

পানি তেউড় : পানি তেউড় দুর্বল । এর আগা-গোড়া সমান থাকে। কলা চাষের জন্য এই চারা উপযুক্ত নয়। এ দুধরণের চারা ছাড়াও m¤úY gjMwš' বা তার ক্ষুদ্র অংশ থেকেও কলা গাছের eskwe¯—vi সম্ভব। তবে এতে ফল আসতে কিছু বেশি সময় লাগে। ফলন্ত ও অফলন্ত দুধরনের গাছেরই gjMwš' চারা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

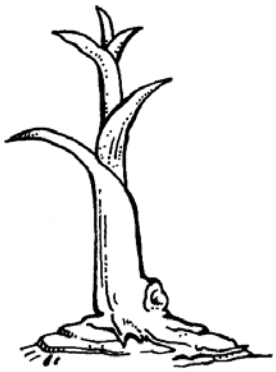

wPÎ : Awm Pviv

wPÎ : cwb Pviv

wPÎ : gjMwš'

চারা রোপণ : ১। চারা রোপণের জন্য প্রথমত অসি তেউড় বা তলোয়ার তেউড় নির্বাচন করতে হবে।

২। খাটো জাতের ৩৫-৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেমি. দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়।

৩। অতঃপর নির্দিষ্ট গর্তে যাতে প্রয়োজনীয় গোবর ও টি এস পি সার দিয়ে cY করা হয়েছে সেখানে চারা লাগতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন চারার কাণ্ড মাটির ভিতরে না ঢুকে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : কলা গাছে গোবর/ আবর্জনা সার, টি এসপি, এমপি ও ইউরিয়া ব্যবহার করা হয় নিচে সাবের নাম ও গাছ প্রতি পরিমাণ ও প্রয়োগ করার সময় উলেখ করা হলো :

সারের নাম	গাছ প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগ করার সময়
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম	চারা রোপণের একমাস আগে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে। চারা রোপণের একমাস আগে ৫০% টি এসপি মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে। চারা রোপণের দুই মাস পর ৫০% এমপি ও ৫০% টিএস পি গাছের গোড়ার চার দিকে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ২৫% ইউরিয়া চারার বয়স দুই মাস হলে এমপি ও টি এস পির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ছিটেয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর দুই মাস পর ৫০% এমপি ও ৫০% ইউরিয়া একত্রে গাছের চার দিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছে ফুল আসার সময় অবশিষ্ট ২৫% ইউরিয়া গাছের গোড়ার চার দিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
টি এস পি	২৫০-৪০০ গ্রাম	
এম পি	২৫০-৩০০ গ্রাম	
গোবর/আবর্জনা সার	১৫-২০ কেজি	

পরিচর্যা

সেচ ও নিকাশ : ১। কলার জমিতে আর্দ্রতা না থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া দরকার।

২। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নালা কেটে দিতে হবে। কারণ কলাগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

অতিরিক্ত চারা কাটা : ১। ফুল বা মোচা আসার ce পর্যন্ত গাছের গোড়ায় যে তেউড় জন্মাবে তা কেটে ফেলতে হবে।

২। মোচা আসার পর গাছপ্রতি ১টি তেউড় রাখা ভালো।

খুঁটি দেওয়া : কলাগাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিলে ছড়া গাছ ভেঙে পড়া রোধ হয়।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা : কলাগাছ ফল ও পাতার বিটল পোকা, রাইজম উইভিল, থ্রিপস এসব পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ডায়জিনন ৬০ ইসি পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা : কলা ফল চাষের সময় প্রধানত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়।

যথা- ১। পানামা রোগ ২। সিগাটোকা ৩। ¸"Q মাথা রোগ।

১। পানামা রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতা বোঁটার কাছে ভেঙে ঝুলে যায় এবং কান্ড অনেক সময় ফেটে যায়। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মরে যায় অথবা ফুল-ফল ধরে না। রোগের প্রতিকার হিসাবে রোগমুক্ত গাছ লাগাতে হবে, রোগক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং প্রতিরোধী জাত রোপণ করতে হবে। এ ছাড়া টিল্ট-২৫০ ইসি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

চিত্র : পানামা রোগক্রান্ত কলাগাছ

২। সিগাটোগা : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতা ঝলসে যায়ও mg¯— পাতা আগুনে পোড়ার মতো দেখায়। ফলে ফল ছোট হয় এবং ফলন কম হয় রোগের প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চিত্র : সিগাটোগা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

৩। গুচ্ছ মাথা রোগ : এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। জাব পোকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। ম্যালাথিয়ন বা অন্য যে কোনো অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগে জাব পোকা দমন করে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

চিত্র : ¸"Q মাথা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

কাজ : শিক্ষার্থীরা কলার বিভিন্ন রোগের নাম, রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা m¤ú‡K একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফসল সংগ্রহ :

১। চারা রোপণের পর ১১-১৫ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

২। ধারালো দা দিয়ে কলার ছড়া কাটা হয়।

ফলন : ভালোভাবে কলার চাষ করলে গাছপ্রতি প্রায় ২০ কেজি বা প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০-৪০ টন কলা উৎপাদিত হবে।

আনারস চাষ

বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে ব্যাপক আনারসের চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও প্রচুর আনারস জন্মে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার (জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বcY ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি একটি অর্থকরী ফসল। আনারস রপ্তানিপণ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের জাত : বাংলাদেশে আনারসের তিনটি জাত দেখা যায়। যথা : হানিকুইন, জায়েথ কিউ ও ঘোড়াশাল।

আনারসের উৎপাদন প্রযুক্তি: আনারসের প্রযুক্তিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

মাটি ও জমি তৈরি :

১। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি আনারস উৎপাদনের জন্য ভালো।

২। জমি চাষ ও মই এমনভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল হয় এবং জমিতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে।

৩। চারা রোপণের জন্য চাষকৃত জমিতে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার ck¯— বেড তৈরি করতে হবে এক বেড থেকে আর এক বেডের `iZ হবে ৫০-১০০ সেমি.।

৪। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করার জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যা বেশি খাড়া নয়।

৫। পাহাড়ের ঢালু জমি কোনোক্রমেই চাষ বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করা যাবে না, শুধু আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে।

চারা নির্বাচন ও তৈরি : আনারস গাছের eskwe¯—vi অঙ্গজ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনারস গাছে সাধারণত চার ধরনের চারা উৎপন্ন হয় যাদেরকে সাকার বা তেউড় বলা হয়। সাকার বা তেউড়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

১। ফলের মাথায় দু'ধরনের চারা উৎপন্ন হয়। ফলের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে। আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের তাকে স্কন্ধ চারা বা মুকুট স্লিপ বলে।

২। ফলের গোড়া বা বোঁটার উপর থেকে যে চারা বের হয তাকে বোঁটা চারা বলে।

৩। বোঁটার নিচের কিন্তু মাটির উপরে কাণ্ড থেকে যে চারা বের হয় তাকে পার্শ্বচারা বা কাণ্ডের কেকড়ী বলে।

৪। গাছের গোড়া থেকে মাটি ভেদ করে যে চারা বের হয় তাকে গোড়ার কেকড়ি বা f‡q চারা বলে। আনারস চাষের জন্য ভূঁয়ে চারা ও পার্শ্বচারা সবচেয়ে ভালো।

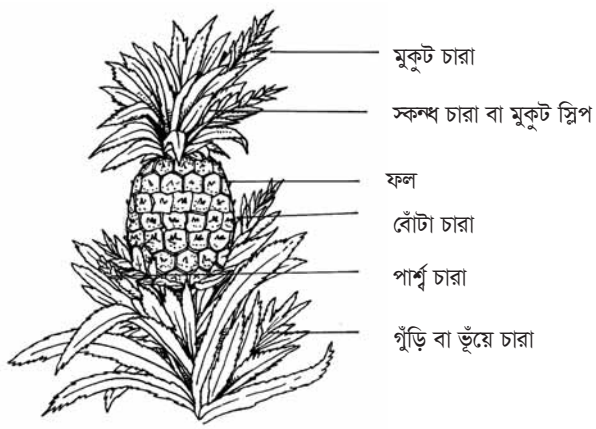

চিত্র : আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা

চারা রোপণ : ১। মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এই এক মাস আনারসের চারা রোপণের সঠিক সময়।

২। সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা রোপণের সময় আরো এক / দেড় মাস পিছান যায়।

৩। সারি থেকে সারির `iZ ৪০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার `iZ ৩০-৪০ সেমি. বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ১। সার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রথম কাজ হলো পরিমাণ নির্ধারণ। আনারসের জন্য গাছ প্রতি নিম্নোক্তহারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টি এস পি	১০-১৫
এম পি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

২। (ক) গোবর, টি এস পি ও জিপসাম বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া ও এমপি (পটাশ) চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে ৫ wK¯—‡Z প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : ১। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য নালা কেটে দিতে হবে। ৩। চারা অতি লম্বা হলে ৩০ সেমি রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। ৪। আনারসের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। ৫। আনারস ফসলে তেমন কোনো ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ সহজে আক্রমণ করে না। তাই বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো না।

ফল সংগ্রহ : ১। চারার বয়স ১৫/১৬ মাস হলে মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়ে আনারসের ফুল আসা শুরু করে।

২। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে।

৩। গাছা থেকে আনারসের বোঁটা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন : প্রতি হেক্টরে হানিকুইন ২০-২৫ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বাগান পরিদর্শন শেষে আনারস চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছ চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাগুর, পাবদা ও টেংরা মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এরা আঁশবিহীন ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ যাদের শরীরে আঁশ নেই এবং মুখে বিড়ালের ন্যায় লম্বা গোঁফ বা শুঁড় আছে তাদেরকে ক্যাটফিশ বলে। প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ বিপর্যয় ও অত্যাধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের চাহিদা ciY করা সম্ভব। শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আবার টেংরা ও পাবদার চাষ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের টেংরা মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গুলশা টেংরার পোনা উৎপাদন চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। নিচে শিং, মাগুর, পাবদা ও গুলশা টেংরার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) শিং ও মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাগুর মাছের পরিচিতি

শিং ও মাগুর মাছের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। এদের দেহ লম্বাটে, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চ্যাপ্টা ও আঁশ বিহীন এবং মাথার উপর নিচ চ্যাপ্টা। মুখে চার জোড়া শুড় ও মাথার দুই পাশে দুটি কাঁটা আছে। কিন্তু শিং মাছ মাগুর মাছের চেয়ে আকারে ছোট হয় এবং মাথা ZjbvgjK সরু হয়। শিং মাছের পার্শ্বিয় কাটা দুটো বিষাক্ত হয়। এজন্য শিং মাছের কাঁটা খেলে আক্রান্ত স্থানে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব হয়। শিং মাছের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। অন্যদিকে মাগুরের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি খয়েরি ও বড় হলে ami বাদামি হয়। শিং ও মাগুর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য n‡"Q ফুলকা ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে। ফলে এরা অল্প অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা পানি ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এজন্য শিং ও মাগুর মাছকে জিওল মাছ বলা হয়। শিং ও মাগুর মাছ সর্বভুক জাতীয় মাছ। এরা জলাশয়ের তলদেশে থাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও পচা জৈব আবর্জনা খায়। এরা বছরে ১ বার প্রজনন করে থাকে। এদের প্রজনন কাল n‡"Q মে থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুন-জুলাই মাসে এদের m‡ev"P প্রজনন হয়ে থাকে।

চিত্র: শিং মাছ

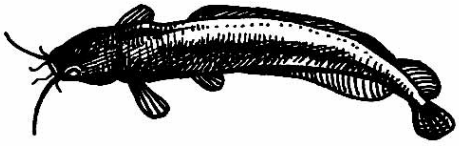

চিত্র: মাগুর মাছ

শিং ও মাগুর চাষের সুবিধা

১. বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এ মাছ চাষে অধিক মুনাফা লাভ করা যায়।

২. চাষ পদ্ধতি সহজ। যে কোনো ধরনের জলাশয়ে এমনকি †PŠev"Pv ও খাঁচাতেও চাষ করা যায়।

৩. cwZKj পরিবেশে যেমন-অক্সিজেন স্বল্পতা, পানির অত্যাধিক তাপমাত্রা , এমনকি পচা পানিতেও এরা বেঁচে থাকে।

৪. অল্প পানিতে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়।

৫. রোগবালাই খুব কম হয় ও অধিক সহনশীল।

৬. অল্প পানিতে এমনকি পানি ছাড়াও এরা দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে বলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়।

৭. সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে অল্প সময়েই (৬-৮ মাস) বাজারজাত করার উপযোগী হয়।

৮. একক মাছ চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্প মাছ, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের সাথে পুকুরে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব

বড় অনেক প্রজাতির তুলনায় শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এসব মাছে শরীরের উপযোগী লৌহ অধিক পরিমাণে আছে। এসব মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি ও তেল কম থাকে। এজন্য সহজে হজম হয়। অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য পথ্য হিসেবে এসব মাছ সমাদৃত। শিং ও মাগুর মাছ রক্ত স্বল্পতা রোধে ও বল বর্ধনে সহায়তা করে।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

শিং ও মাগুর মাছ চাষের জন্য পুকুর ১-১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। পুকুরের আয়তন ১০ শতক থেকে ৩০ শতক হলে ভালো হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরটির পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুকুরে কচুরিপানা সহ অন্যান্য জলজ আগাছা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। পুকুরে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে, বার বার জাল টেনে বা পুকুরের পানিতে রোটেনন প্রয়োগ করে তা করা যায়। শীতকালে যখন পুকুরের পানি অনেক কমে যায় তখন পুকুর শুকিয়ে ফেলে পুকুর প্রস্তুতির কাজ m¤úb করলে ভালো হয়। পুকুর শুকানো হলে তলায় চুন, গোবর বা হাঁসমুরগির বিষ্ঠা, ইউরিয়া, টিএসপি সার প্রতিশতকে নির্ধারিত হারে যথাযথ নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে যদি পানি থাকে তাহলে পানিতেই চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

নেটের বেষ্টনী/বেড়া নির্মাণ

শিং ও মাগুর মাছ চাষে পুকুর c¯‘wZi সময় একটি গুরুতcY KvR n‡"Q পুকুরের চারদিকে পাড়ের উপর অন্তত ৩০ সে.মি. উঁচু করে নেটের বেষ্টনী বা বেড়া নিমার্ণ করা। বেষ্টনী দেওয়ার সুবিধা n‡"Q এতে করে বৃষ্টির সময় মাছ পুকুরের বাইরে চলে যেতে পারে না। বিশেষত মাগুর মাছকে সামান্য বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়ই "হেঁটে" (গড়িয়ে) পুকুর থেকে বাইরে যেতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেষ্টনী দেওয়ার ফলে মাছের শত্রু যেমন-সাপ,ব্যাঙ ইত্যাদি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। নাইলনের নেট খুটির সাথে বেঁধে পাড়ের চারদিকে ঘিরে দিতে হবে। নেটের নিচের দিক মাটির ভিতর কিছুটা ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে যেন মাটি ও নেটের মাঝে ফাঁক না থাকে। পুকুর শুকানো হলে শুকানোর পর পরই এ কাজ করতে হবে। কারণ শুকনো অবস্থায় পুকুরে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন-ব্যাঙ, সাপ থাকে না। পানি থাকা অবস্থায় পুকুরে এসব প্রাণী থাকে বিধায় তখন বেষ্টনী দিলে এরাও পুকুরে আটকা পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভিতরে সেগুলোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- কোচ দিয়ে বা বিষ টোপ দিয়ে।

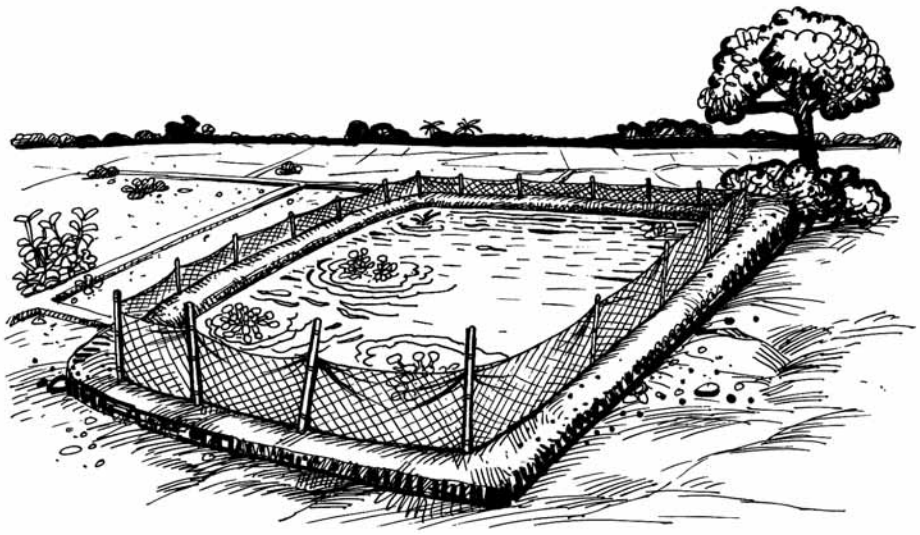

চিত্র: মাগুর মাছের পুকুরে নেটের বেষ্টনী

পোনা মজুদ

পুকুর c¯‘wZi ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ টি মাগুর মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। শিং মাছ যেহেতু আকারে ছোট তাই এ মাছ কিছু বেশি যেমন- ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত মজুদ করা যেতে পারে। শতকে ৩-৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে যা পুকুরে উৎপাদিত অতিরিক্ত ফাইটোপ্লাংকটন খেয়ে পরিবেশ ভালো রাখবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকলে শতকে মাগুরের পোনা ২৫০-৩০০টি এবং শিং মাছের পোনা ৪০০-৫০০টি মজুদ করা যাবে। কার্প বা রুই জাতীয় মাছের সাথে শিং/মাগুর এর মিশ্রচাষ করতে চাইলে শতকে শিং/মাগুর এর পোনা ৫০টি এবং রুই জাতীয় মাছের পোনা ৪০টি মজুদ করা যায়। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় n‡"Q সকাল বা বিকাল (ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়)। দুপুরে রোদে বা মেঘলা দিনে পোনা মুজুদ করা উচিত নয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার c‡e পটাশ বা লবণ পানিতে পোনা শোধন ও পুকুরের পানিতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ m¤ú‡K কৃষি উপকরণ অধ্যায়ে ২য় পরি"Qদে তোমরা we¯ÍwiZ জেনেছ।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাগুর ও শিং মাছ চাষে মাছকে m¤úiK খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিচে মাছের m¤úiK খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এগুলোর মিশ্রণের হার দেওয়া হলো-

শিং ও মাগুরের m¤úiK খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার।

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	
	নমুনা-১	নমুনা-২
ফিশমিল	২০	২০
মুরগির নাড়ি ভুঁড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট ও বোন মিল)	২৫	
সরিষার খৈল	১০	২০
চালের কুঁড়া	২৫	৩০
গমের ভুসি	১৫	১২
আটা/ চিটাগুড়	৪	৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১	১ গ্রাম/কেজি
সয়াবিন PY	-	৮
ভুট্টা PY	-	৫

শিং/মাগুর মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা নিচে দেওয়া হলো-

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈহিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৭
>১০১	৩-৫

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগ করে দিনে ২ বার (সকাল ও বিকালে) দিতে হবে। খাবার অল্প পানিতে মিশিয়ে ছোট ছোট বল করে পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির নিচে স্থাপিত ট্রেতে দেওয়া যাবে। খাদ্য প্রস্তুতের ২৪ ঘণ্টা c‡eB সরিষার খৈল পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা বাণিজ্যিক খাবারও মাছকে প্রদান করা যায়। এতে তৈরিকৃত খাদ্যের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি পড়তে পারে।

২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

চাষকালীন মাছ নিয়মিত বাড়ছে কিনা এবং মাছ রোগাক্রান্ত n‡"Q কিনা জাল টেনে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে। শিং ও মাগুর মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে মাঝে মাঝে শীতকালে ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ এবং পেট ফোলা রোগ দেখা যায়। নিচে এদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেওয়া হলো:

ক্ষত রোগ: gjZt এ্যাফানোমাইসিস ইনভাডেন্স নামক একধরনের ছত্রাকের আক্রমণ এ রোগ হয়। এতে মাংশপেশিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুকুরে ১-১.৫ মিটার পানির গভীরতায় শতকে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরুতে একই হারে পুকুরে চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে শীতকালে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

লেজ বা পাখনা পচা রোগ: এ্যারোমোনাডস ও মিক্সোব্যাকটার জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট মিশ্রিত করে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিনিট গোসল করাতে হবে। পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি শতক পুকুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেট ফোলা রোগ: এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগ হলে মাছের পেট ফুলে যায়। মাছ ভারসাম্যহীন ভাবে চলাচল করে ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের পেট হতে খালি সিরিঞ্জ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মি.গ্রাম ক্লোরামফেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে। আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

মাছ আহরণ

সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ৭-১০ মাসে শিং ও মাগুর মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। উক্ত সময়ে শিং মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাগুর মাছ ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুকুরে জাল টেনে বেশির ভাগ মাছ ধরতে হবে। m¤úY মাছ আহরণ করতে হলে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে এক একর একবার একটি পুকুরে শিং/মাগুর চাষের সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাতায় লিখে জমা দিবে।

খ) পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি

বিল, হাওর, নদী, পুকুর এবং দিঘিতে পাবদা ও গুলশা মাছ পাওয়া যায়। পাবদা ও গুলশা মাছ খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এ কারণে এদের চাহিদা ও বাজার gj¨ ZjbvgjKfv‡e বেশি। পাবদা মাছ ১৫-৩০ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। দেহ চ্যাপ্টা ও সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিক ক্রমাগত সরু। এ মাছের মুখ বেশ বড় ও বাঁকানো। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড় মুখের সামনের দিকে দু'জোড়া লম্বা গোঁফ আছে। পৃষ্ঠ পাখনা ছোট। পায়ু পাখনা বেশ লম্বা ও লেজ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের রং সাধারনত উপরিভাগে ami icwj ও পেটের দিক সাদা। ঘাড়ের কাছে কানকোর পিছনে কালো ফোঁটা আছে। শিরদাঁড়া রেখার উপরিভাগে হলুদাভ ডোরা দেখতে পাওয়া যায়। পাবদা মাছ মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন - জুলাই মাসে m‡ev"P প্রজনন m¤úb হয়।

গুলশা মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি. হয়ে থাকে, মাছের দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা। পিঠের অংশ বাঁকানো। মুখ বেশ ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়। মুখে ৪ জোড়া গোঁফ বা শুঁড় আছে। পৃষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা কাঁটা যুক্ত। শরীরের রং জলপাই ami, নিচের দিক কিছুটা হাল্কা। শিরদাঁড়া রেখা বরাবর নীলাভ ডোরা দেখা যায়। এরা বছরে একবার ডিম দেয়। গুলশা মাছের প্রজননকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত । জুলাই-আগস্ট মাসে m‡ev"P প্রজনন করে থাকে।

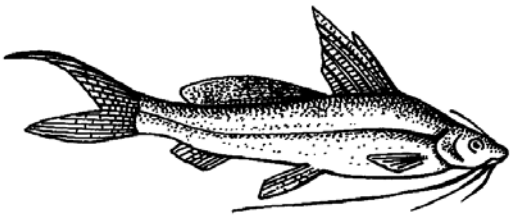

চিত্র : গুলশা

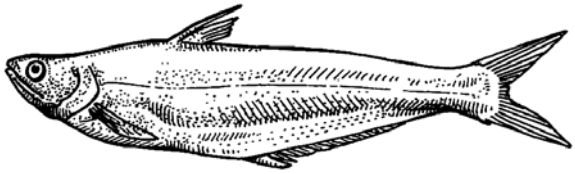

চিত্র : পাবদা

পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের গুরুত্ব

১. বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং gj¨ অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। তাই এদের চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি সম্ভব।

২. এদের গেহে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রেন্ট বিদ্যমান থাকে।

৩. খেতে খুবই সুস্বাদু।

৪. চাষ পদ্ধতি সহজ।

৫. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। ফলে সহজে পোনা পাওয়া সম্ভব।

৬. বার্ষিক পুকুর ছাড়াও মৌসুমি পুকুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়েও চাষ করা যায়।

৭. দ্রুত বর্ধনশীল, ৫-৬ মাসেই বিপণনযোগ্য হয়।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন

সাধারণত ১৫-২০ শতাংশের পুকুর যেখানে ৭-৮ মাস পানি থাকে এমন পুকুরে এ মাছ দু'টো চাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। থাকলে তা ছেঁটে দিতে হবে যেন পুকুরে পাতা ও ছায়া না পড়ে। পুকুরে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা `i করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পুকুরে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হারে গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৩-৫ গ্রাম ওজনের পোনা শতক প্রতি ২৫০ টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়া উচিত। পোনা আনার সাথে সাথে সেগুলো সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার c‡e পটাশ বা লবণ পানিতে শোধন করে নিতে হবে এবং পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে বা অভ্যন্তকরণ করে নিতে হবে।

কাজ : দলগতভাবে পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

খাদ্য প্রয়োগ

পাবদা ও টেংরা মাছের m¤úiK খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি
ফিশমিল	৩০	২-৩ টি ডুবন্ত ট্রেতে করে প্রতিদিন দেহ ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে দৈনিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) প্রয়োগ করতে হবে।
মিট ও বোন মিল	১০	
সরিষার খৈল	১৫	
সয়াবিন খৈল	২০	
চালের কুঁড়া	২০	
আটা	৪	
ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রণ	১	

সার প্রয়োগ

m¤úiK খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার জন্য ৭-১৫ দিন পর পর শতকপ্রতি ৪-৫ কেজি হারে পচা গোবর, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গুলিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা:

মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। ট্রেতে খাবার দেওয়ার আগে ceeZx দিনের খাবার m¤úY খেয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্য থেকে যাবে তার সমপরিমাণ খাদ্য কম সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে ২ বার জাল টেনে দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সপ্তাহে একবার পুকুরে হররা টানতে হবে। পুকুরে পানি কমে গেলে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানির স্বাচ্ছতা (সেকিডিস্ক গভীরতা) ২৫ সে.মি. মধ্যে থাকলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

মাছ আহরণ

গুলশা মাছ ৬ মাসে ৪০-৪৫ গ্রাম এবং পাবদা মাছ ৭-৮ মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই আকারের পাবদা মাছ বেড় জাল দিয়ে ও গুলশা মাছ পুকুর শুকিয়ে আহরণ করা যায়

নতুন শব্দ : জিওল মাছ, এ্যাফনোমাইসিস ইনভাডেন্স, মাইক্রোনিউট্রেন্ট

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের পুষ্টির চাহিদা ciY, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. পুষ্টির চাহিদা ciY : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস n‡"Q মাছ। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। একজন cYeq¯‹ লোকের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা গড়ে মাত্র ২১ গ্রাম আমিষ খেয়ে

থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই মাছ চাষ খুবই গুরুত্বcY|

এছাড়া মাছের তেল দেহের জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ যেমন- মলা, ঢেলা, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যয়। ভিটামিন 'এ' রাতকানা রোগ `i করে। মাছের কাঁটায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায় যা দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।

২. কাজের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে প্রায় মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০.৫০% বা ১৫৬ লক্ষ লোক মৎস্য সেক্টর থেকে বিভিন্ন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে hv‡"Q| মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি : মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। দেশে রপ্তানি আয়ের ২.৭৩% আসে মৎস্য খাত হতে। মাছ চাষ বৃদ্ধি করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুকুর, ডোবা ও নালা রয়েছে যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে গ্রামের গরিব ও স্বল্প আয়ের লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব

cÂg **পরিচ্ছেদ**

সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

সমন্বিত চাষের ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা হয়। আবার সে সাথে অনেকের বাড়িতে রয়েছে পুকুর যেটি ধোয়ামোছা, রান্নাবান্না, গোসল ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। সনাতন পদ্ধতিতে এই সব পুকুরে মাছও লালন করা হয়। এসব হাঁস-মুরগি, মাছ পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে fwgKv রাখে। পুকুরের উপর ঘর করে যদি হাঁস-মুরগি রাখা যায় তবে এদের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হয় না। আবার গরুর গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেইসাথে হাঁস-মুরগির উ"Qষ্ট খাদ্য পুকুরে ফেলে দিলে তা মাছের m¤úiK খাদ্যের যোগান দেয়। অব্যবহৃত পুকুরের পাড়ে ফল-gj এবং শাকসবজির চাষও করা যায় যেখানে পুকুরের তলার অতিরিক্ত কাদা (পচা জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ) সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে djgj ও শাকসবজির ঝরাপাতা Kg‡cvó সার হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হয়। আবার কৃষকের ধানের জমিতে যে কয়েকমাস পানি থাকে সে সময়ে ধানের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মাছের বিষ্ঠা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই মাছ ধানের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফেলে এবং মাছের চলাচল জমিতে আগাছা জন্মাতে বাধা দেয়। এভাবে যখন একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে সমন্বিত চাষ বলে। সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য ফসলের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

সমন্বিত চাষের গুরুত্ব

১. এইক জমিতে একই সময়ে অল্প খরচে একাধিক ফসল পাওয়া যায়। ফলে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হয়।

২. একই ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে

৩. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে

৪. সার ব্যবহারে খরচ কমে

৫. শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় (একটি ফসলের জন্য যে শ্রম প্রয়োজন, সেই একই শ্রমে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়)

৬. m¤ú‡`i m‡ev"P ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অপচয় রোধ হয়

৭. ঝুকি কম থাকে অর্থ্যাৎ কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হলে অন্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেয়া যায়।

নিচে আমরা দুটি গুরুত্বcY সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি (সমন্বিত মাছ-হাঁস/মুরগি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ) m¤ú‡K জানব।

ক) সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষ

মাছ ও হাঁস মুরগির সমন্বিত চাষের সুবিধা

১. পুকুরের উপর হাঁস/মুরগির ঘর তৈরি করা হয় বলে আলাদা জায়গায় প্রয়োজন হয় না। ২. হাঁস/মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ চাষের জন্য উৎকৃষ্ট জৈব সার, এই পদ্ধতিতে পুকুরে বাইরে থেকে কোনো সার দেওয়ার দরকার নেই। ৩. হাঁস/মুরগির উ"Qষ্ট খাদ্য সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ফলে মাছর জন্য আলাদা কোনো m¤úiK খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ৪. হাঁস পুকুরের পোকামাকড় ও ব্যাঙাচি খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে। ৫. হাঁস পুকুরের পানিতে সাঁতার কাটে বলে বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে মেশে ফলে পানিতে অক্সিজেনের সমস্যা হয় না। ৬. একই জায়গা থেকে মাছ, মাংস ও ডিম পাওয়া যায় ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদন ও m¤ú‡`i m‡ev"P ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

চিত্র : সমন্বিত মাছ ও হাঁস চাষ

চিত্র : সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : খুব ছোট আকারের পুকুর সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষের জন্য তেমন উপযোগী নয়। পুকুরের আয়তন b¨bZg ৩৩ শতক হলে ভালো হয়। বছরে কমপক্ষে ৮-১০ মাস ১.২ থেকে ১.৮ মিটার (৪-৬ ফুট) পানি থাকে এমন পুকুর নির্বাচন করাতে হবে। এরপর যথাযথ নিয়মে মাছ চাষের জন্য পুকুর c¯‘Z করে নিতে হবে। তবে সমন্বিত হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষে পুকুর c¯‘wZKvjxb সময়ে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। চুন দেওয়ার ৭দিন পর পুকুরের উপর বানানো ঘরে হাঁস/মুরগির ev"Pv মুজুদ করতে হবে। হাঁস/মুরগির ev"Pv মজুদের ৭-১০ দিন পর পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

হাঁস-মুরগির ঘর নির্মাণ : খরচ কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশ, কাঠ ও শন দিয়ে এক চালা বা দো-চালা ঘর তৈরি করা যায়। ঘরটি পাড় থেকে ১.২ থেকে ১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট) ভিতরে পানির উপর হবে যেন শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলেও বিষ্ঠা ও Dw"Qô খাদ্য মাটিতে না পড়ে পানিতে পড়ে। পানির উপরিভাগ থেকে ঘরের মেঝের দুরত্ব ০.৪৬-০.৬ মিটার (১.৫-২ফুট) এবং মেঝে থেকে ঘরের চালার D"PZv হবে ১.২-১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট)। ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য চালা ও ঘরের বেড়ার মাঝের জালের মত বেড়া বা জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এক বাতা থেকে অন্য বাতার `iZ হবে ১ সে.মি। এতে করে মুরগির বিষ্ঠা ও Dw"Qô সরাসরি পানিতে পড়বে কিন্তু মুরগির পা বাতার ফাকে ঢুকে আঘাত প্রাপ্ত হবে না। হাঁস/মুরগির ঘর অনেকসময় পুকুরের পাড়েও তৈরি করা হয়।

হাঁস-মুরগির জাত ও সংখ্যা নির্ধারণ : প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য উন্নতজাতের ২টি হাঁস বা মুরগি (ব্রয়লার বা লেয়ার) পালন করা যায়।

হাঁস-মুরগির খাদ্য : ev"Pv অবস্থায় ৯০ দিন পর্যন্ত প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রতিদিন ৬০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২৫ গ্রাম সুষম খাদ্য দিতে হবে। হাঁসকে খাদ্য খাওয়ানোর সময় প্রয়োজনমতো পানি মিশিয়ে দিতে হবে। ব্রয়লার মুরগিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সব সময় খাবার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি লেয়ার মুরগির জন্য ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ৮০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২০ গ্রাম হারে দৈনিক খাবার প্রদান করতে হবে। খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর জন্য পৃথক পৃথক পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

হাঁস-মুরগির রোগবালাই দমন : হাঁস/মুরগির রোগ হতে পারে। রোগ হলে নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য হাঁস-মুরগির ঘর সবসময় শুকনো রাখতে হবে। ঘরের মেঝে এবং খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টিকা ও ইনজেকশন দিতে হবে। অসুস্থ হাঁস-মুরগিকে যতদ্রুত সম্ভব ভালোগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব : পুকুরে ৮-১২ সে.মি আকারের বিভিন্ন কার্পজাতীয় মাছের পোনা শতক প্রতি ৩৫-৪০টি নিম্নলিখিত অনুপাতে ছাড়া যায় তমধ্যে শতক প্রতি কাতলা/বিগহেড ৪টি, সিলভার কার্প ৯টি, রুই ৮টি, মৃগেল ও কার্পিও ৪টি করে গ্রাস কার্প ১টি এবং সরপুঁটি ৫-১০টি ছাড়তে হবে।

গ্রাসকার্প ঘাসজাতীয় খাদ্য খায়। তাই পুকুর পাড়ে জমানো ঘাস, নরম পাতা, কলা পাতা ইত্যাদি নিয়মিত পুকুরে দিতে হবে। অন্য জাতের মাছের জন্য বাইরে থেকে কোনো খাদ্য দেওয়ার দরকার নেই। পানিতে পড়া হাঁস/মুরগির উ"Qষ্ট খাদ্যই এরা গ্রহণ করবে।

মাছ মজুদোত্তর যত্ন : প্রতিমাসে একবার জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হলে নতুন পানি সরবরাহ বা বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত

গ্যাস জমা হলে হররা টেনে পুকুর থেকে গ্যাস `i করা যেতে পারে। ক্ষত রোগের আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শীতের শুরুতে শতক প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

উৎপাদন : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষ করা হলে পুকুরে কোনো সার বা খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াই শতকপ্রতি ১৮ থেকে ২১ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়। খাকি K¨vwú‡ej বা ইন্ডিয়ান রানার জাতের হাঁস বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। একটি ব্রয়লার মুরগি ২ মাসে প্রায় ১.৫-২ কেজি ওজনের হয় এবং লেয়ার মুরগি বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

খ) ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ

ধান চাষের সময় অনেক জমিতেই দীর্ঘদিন পানি ধরে রাখার দরকার হয়। এসব ধানক্ষেত একটু পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করে নিলে একই জমিতে এক বছরে ধান এবং মাছ ও গলদা চিংড়ির একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি ধানক্ষেতে মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী যা এখনই ব্যবহার করা যায়। আরও ৩.০ লক্ষ হেক্টর ধানের জমি ভবিষ্যতে গলদা ও মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধা : ১) একই জমিতে অতিরিক্ত ফসল হিসাবে মাছ ও গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয়। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। ২) মাছ ধানের ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ও পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। তাই ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের দরকার হয় না। ৩) মাছ ও চিংড়ির চলাফেরার কারণে ক্ষেতে আগাছা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি হয় ৪) মাছ ও চিংড়ির বিষ্ঠা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে ফলে সারের খরচ Zjbvgj K কম হয়। ৫) গবেষণায় দেখা গেছে এ পদ্ধতিতে ধানের ফলন গড়ে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়

জমি নির্বাচন : যেসব জমিতে কমপক্ষে ৪-৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব এবং চাষকালীন সময়ে ক্ষেতের সব অংশে কমপক্ষে ১২-১৫ সে.মি পানি থাকে সেসব জমিতে ধান এবং মাছ ও গলদার সমন্বিত চাষ সম্ভব। যে সব জমি উচু অর্থাৎ পানি ধরে রাখতে পারে না, আবার যে mg¯— জমি বেশি নিচু অথাৎ সহজে পাবিত হয় এদের কোনোটিই মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়।

মাছ ও গলদা চাষের জন্য ধানক্ষেত প্রস্তুতকরণ

১. জমির আল তৈরি/ মেরামত : জমির আল শক্ত, মজবুত করে তৈরি বা মেরামত করতে হবে। সাধারণ বন্যায় যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ৩০-৬০ সে.মি উচু করে আল তৈরি করা ভালো। আল পর্যাপ্ত চওড়া হতে হবে। এতে আল তাড়াতাড়ি ভা½বে না ও আলে কিছু শাকসবজিও চাষ করা যাবে।

২. ধানক্ষেতে ডোবা ও খাল/নালা খনন : মাছ ও চিংড়ির আশ্রয় ও চলাচলের সুবিধার জন্য ধান ক্ষেতের আলের চারপাশে ভিতরের দিকে নালা খনন করা হয় অথবা আলের এক বা দু'পাশে নালা বা ডোবা খনন করা হয় । আবার অনেকক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের মাঝখানে বা কোনায় ডোবা খনন করা হয় । কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতে নালা ও ডোবা দুই-ই খনন করা হয়। সেক্ষেত্রে ডোবার সাথে নালার সংযোগ থাকে। মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা ডোবা ও নালা হলেই চলে। এদের গভীরতা ০.৫-০.৮ মিটার হলে ভালো হয়। জমির ঢালু বা নিচু অংশে ডোবা তৈরি করা হয়।

ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির সুবিধা হ"Q- (১) ক্ষেতের পানি কমে গেলে বা খুব গরম হয়ে গেলে চিংড়ি ও মাছ গর্ত ও নালার অপেক্ষাকৃত গভীরে ঠাণ্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারে। (২) আগাছা পরিষ্কার বা মাছ ধরার প্রয়োজন হলে জমির পানি শুকিয়ে মাছ গুলোকে নালা বা ডোবায় এনে তা সহজেই করা যায়।

গলদা চিংড়ির আশ্রয়স্থল সৃষ্টি : চিংড়ির জন্য ডোবা বা খালে কৃত্রিম পাস্টিক বা শুকনো KwÂ দিয়ে গলদার আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। চিংড়ি এখানে খোলস বদলের সময় নাজুক অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারবে।

ধানের জমি তৈরি : জমিতে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে প্রচলিত নিয়মে সার,গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে।

ধানের জাত নির্বাচন : ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য বি আর-৩ (বিপব), বি আর-১১ (মুক্তা) , বি আর -১৪ (গাজী), বি আর -২ (মালা) ইত্যাদি D"P ফলনশীল ধান নির্বাচন করা উচিত।

ধান রোপণ পদ্ধতি : ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে রোপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির `iZ ২০-২৫ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার `iZ ১৫-২০ সে.মি , রাখতে হবে। পর পর ৫-৬ সারি লাগানোর পর ৩৫-৪০ সে.মি. ফাঁকা রাখতে হবে। এতে মাছ ও চিংড়ির চলাচলে সুবিধা হয় এবং পানিতে পর্যাপ্ত mhv‡jvK পড়তে পারে ফলে দ্রুত মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে।

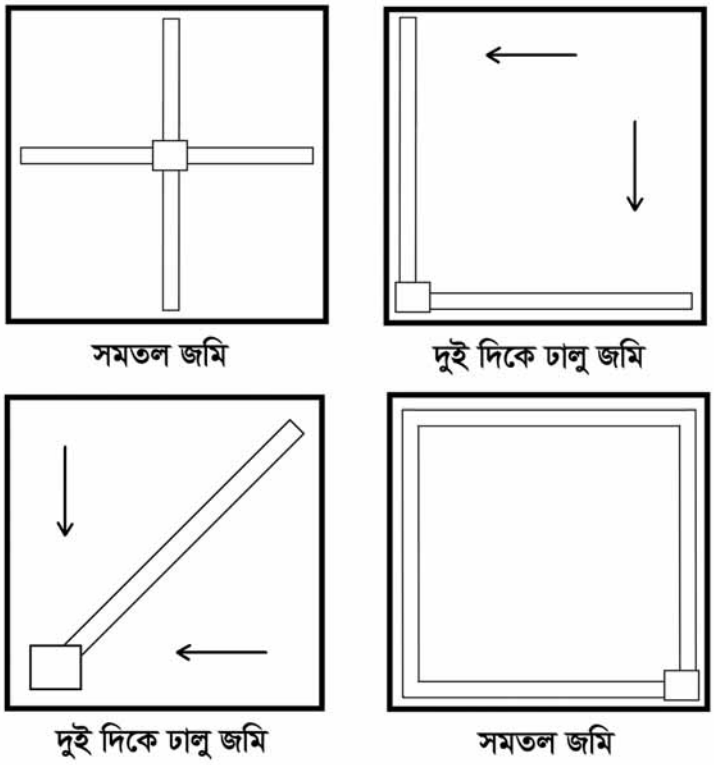

চিত্র: ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির কয়েকটি নকশা

মাছের প্রজাতির নির্বাচন : যেহেতু ধানক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না তাই কম পানিতে ও কম অক্সিজেনের বাঁচতে পারে, D"P তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং সেসাথে ধান চাষকালীন সময়ের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয় এরূপ দ্রুত বর্ধনশীল মাছ নির্বাচন করতে হবে যেমন- কার্পিও, সরপুটি, তেলাপিয়া। তবে এগুলোর সাথে অল্পসংখ্যক রুই, কাতলা দেওয়া যেতে পারে। আবার মাগুর মাছের পোনাও ছাড়া য়ায়। তবে গ্রাস কার্প ছাড়া যাবে না কারণ এরা ধান গাছ খেয়ে ফেলতে পারে।

পোনা মজুদ : ধান রোপণের ১০-১৫ দিন পর যখন ধান গাছ শক্তভাবে মাটিতে লেগে যাবে তখন চিংড়ি ও মাছ মজুদ করতে হবে। শতাংশপ্রতি মাছের পোনা ১৫-২০টি ও চিংড়ির পোনা ৪০-৫০টি মজুদ করা যেতে পারে।

mv¤úiK **খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ :** চালের কুঁড়া, খৈল, ফিশমিল ১ঃ১ঃ১ অনুপাতে নিয়ে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আটা পানিতে ফুটিয়ে আঠালো করে উক্ত উপকরণগুলোর সাথে মিশিয়ে কাই করে ছোট ছোট বল বানিয়ে মাছ ও চিংড়িকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% খাবার তিন ভাগ করে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা : ধানের মাথে মাছ চাষ করলে কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়। তবে কীটনাশক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে মাছকে ডোবা/নালায় আটকিয়ে তা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের অন্তত ৫ দিন পর সেচ দিয়ে পুনরায় মাছকে mg¯— জমিতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে। ক্ষেতের পানি কমে গেলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাছ রোগ বালাই এর লক্ষণ দেখা দিলে মাছগুলোকে ডোবার মধ্যে নিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ধান, মাছ ও চিংড়ি আহরণ : ধান কাটার সময় হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে চিংড়ি ও মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে ধান কাটতে হবে। ধান কাটার পরও যদি ক্ষেতে পানি থাকে বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী ফসল শুরু করার ce পর্যন্ত মাছ চাষ চালিয়ে নেয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশুপাখি পালন পদ্ধতি

গাভী পালন

কৃষির অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে পশু ও গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। বলা হয়ে থাকে একটি জাতির মেধার বিকাশ নির্ভর করে gjZ ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর। আজকের বিশ্বে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে গাভীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাভী পালন একটি শিল্প হিসাবে গড়ে উঠছে। আমাদের দেশে পাঁচ ধরনের উন্নত জাতের গাভী দেখা যায় সেগুলো হলো-হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি, রেড চিটাগাং প্রভৃতি। এই mg¯— জাতের গাভীর দুধ উৎপাদক্ষমতা মোটামুটি ভালো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন ও প্রজনন করালে এদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

গাভীর বাসস্থান :

গাভীর বাসস্থানকে গোশালা বলে। অনেক জায়গায় এটিকে গোয়াল ঘরও বলা হয়। আমাদের দেশে গোয়াল ঘরে রেখে গাভী পালন করা হয়। গোশালা উঁচু ও শুকনো জায়গায় নির্মাণ করা হয়। যাতে করে gjgÎ ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় ও গোশালা শুকনো থাকে। গোশালা এমন ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এবং বৃষ্টির পানি, তাপ, আদ্রর্তা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গোশালা অবশ্যই যেন গাভীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়। গোশালা একটু বড় আকারের হওয়াই e\Âb\q| প্রতিটি গোশালায় খাবার পাত্র ও আলাদা পানি পানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

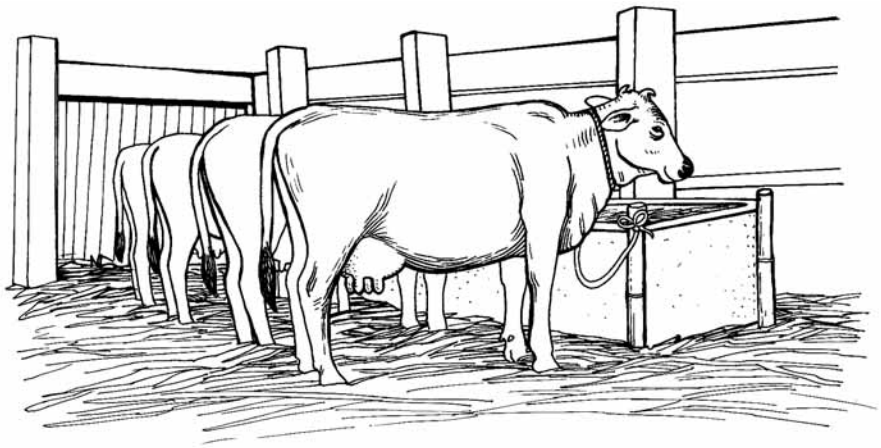

চিত্র : খামারের দুগ্ধবতী গাভী

গাভীর পরিচর্যা :

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ হলো গাভী যাতে অধিক কর্মক্ষম থাকে। গাভীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও দুগ্ধদোহন কালের পরিচর্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়ে। গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময়ে গাভীর ভিতরের ev"Pv বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার জাতীয়খাদ্য দিতে হবে। প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসবের কয়েক দিন আগে গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই গাভীকে সমতল জায়গায় রাখতে হবে। গর্ভধারণ ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। গর্ভকালীন অবহেলা করলে ev"Pv নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাছুরকে অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে কারণ এই শাল দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। গাভী প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয় এর পরে দুধ পাওয়া যায়। দুধ দোহনের সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এবং দ্রুততার সাথে দোহনের কাজ শেষ করতে হবে। গাভী পরিচর্যার আরও একটি লক্ষ্য হ"Q, গাভীকে পোকামাকড় ও মশামাছি থেকে নিরাপদ `i‡Z রাখা।

গাভীর খাদ্য :

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ ও ¶qciY, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, স্নেহ পদার্থ সংরক্ষণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননের সক্ষমতা অর্জন, গর্ভাবস্থায় ev"Pvi বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতুলতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ গাভীর শারীরিক বিকাশের জন্য সব ধরনের খাদ্য উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব খাদ্য মিশ্রণে পশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে। গাভীর cwicY বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাই সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। গাভীর খাদ্যদ্রব্যে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিউ অ্যাডিটিভস। আঁশযুক্ত খাদ্যের মধ্যে খড়বিচালি, কাঁচাঘাস, লতাপাতা, হে, সাইলেজ ইত্যাদি প্রধান। দানাদার খাদ্যের মধ্যে শস্যদানা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, খৈল ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া খনিজ ও ভিটামিন এর মধ্যে হাঁড়ের

গুঁড়া, বিভিন্ন ভিটামিন - খনিজ প্রিমিক্স পদার্থ রয়েছে। এসব পশু খাদ্য প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করে গাভীকে পরিবেশন করতে হবে। গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা একধরনের থাম্বরুল পদ্ধতির মাধ্যমে নিরুপণ করা যায়। যেমন-

১। প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খড় ও সবুজ ঘাস খেতে পারে তা তাকে খেতে দিতে হবে।

২। গাভীর শরীর রক্ষণাবেক্ষণের ১.৫ কেজি দানাদার এবং প্রতি ১.০ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও সবুজ ঘাসের সাথে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

৩। গাভীকে ৪০-৫০ গ্রাম হাঁড়ের গুঁড়া ও ১০০ -১২০ গ্রাম খাদ্য লবণ সরবরাহ করতে হবে।

৪। তাছাড়া দুগ্ধবতী গাভীকে প্রতিদিন পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বুঝায় যা এ যাবতকাল cïm¤ú` উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো-

১। বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা।

২। খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরি"Qন্ন রাখা।

৩। পচা, বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা।

৪। সর্বদা তাজা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা।

৫। প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করা।

৬। দ্রুত gjgÎ নিষ্কাশন করা।

৭। অসুস্থ গাভীর পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা।

৮। নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা।

৯। সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

গাভীকে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা :

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে অসুস্থ গাভী শনাক্ত করা যায়। গাভীর বিভিন্ন রোগ বালাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। গাভী তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা রোগ, গলাফোলা, রিন্ডারপেস্ট, ম্যাস্টাইটিস, পরজীবী ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গাভীর যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাছুর পালন

গরু মহিষের শৈশবকালকে বাছুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু মহিষের ev"PvB বাছুর নামে পরিচিত। দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর নির্ভর করে । কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের দুধ উৎপাদনশীল গাভী, উন্নত মানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী গরু। তাই পশুপালন বিজ্ঞানে বাছুর পালন একটি অত্যন্ত গুরুতcY বিষয়। অল্প বয়সের এই গরু বা মহিষের ev"Pv অত্যন্ত রোগ

সংবেদনশীল হয়। আমাদের দেশে যে সংখ্যক গবাদিপশু পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগের ও বেশি বাছুর। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন-গর্ভাবস্থায় গভীর সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও নবজাত বাছুরের সঠিক যত্ন।

বাছুরের বাসস্থান :

দেশীয় জাতের একটি বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন সাধারণত ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি হয়। একটি বাছুরের বাসস্থানের জায়গা কতটুকু হয় বাছুরের আকারের উপর তা gjZ নির্ভর করে । প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৩৫ বর্গফুট (৩.২৫ ব.মি.) জায়গার

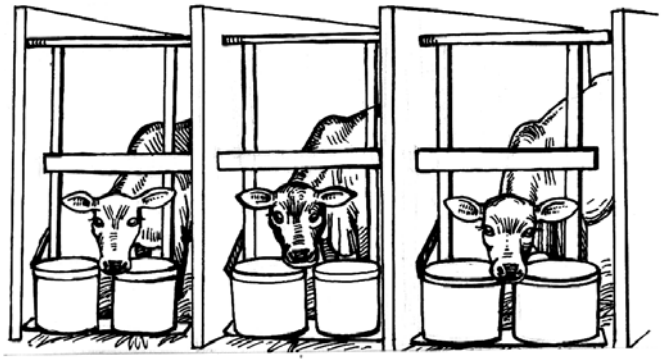

চিত্র : ঘরের ছোট খোপে বাছুর

ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়। বাছুরের বাসস্থানের জায়গা এমন হতে হবে যে ঘরে প্রচুর পরিমাণ

আলো ও বাতাস প্রবেশ করে। বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা হতে পারে তবে এতে gjgÎ নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি ছোট বাছুরের জন্য ১২ বর্গফুট (১.১১ ব.মি.) জায়গার প্রয়োজন। বাছুরের খোপে খড় বিছালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। মেঝে পাকা হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা :

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদের খাদ্য পরিবেশন, রোগবালাই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বোঝায়। আমাদের দেশে বাছুরের আলাদা যত্ন নেওয়ার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে এটি একটি অত্যন্ত গুরুতcY বিষয়। বাছুর জন্মের পর থেকে দৈহিক পরিপক্বতা অর্জন না করা পর্যন্ত এদের পালন করা বা এদের দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাছুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো :

জন্মের পর পরই অনেক বাছুর মায়ের বাট থেকে দুধ চুষে খেতে পারে না। তাই বাছুরের মুখের ভিতর বাঁট দিয়ে দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাতে হয়। গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে অনেক সময় অন্য গাভীর দুধ পান করানোর প্রয়োজন

হতে পারে। শৈশবে বাছুরকে ৩৭.৫০ সে. তাপমাত্রার দুধ পান করানো হয়। সাধারণত বোতলে বা বালতিতে করে বাছুরকে দুধ খাওয়ানো হয়। বিশুদ্ধ দুধ ও পানি ১ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উত্তম। দুধ খাওয়ানোর পর বোতল অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

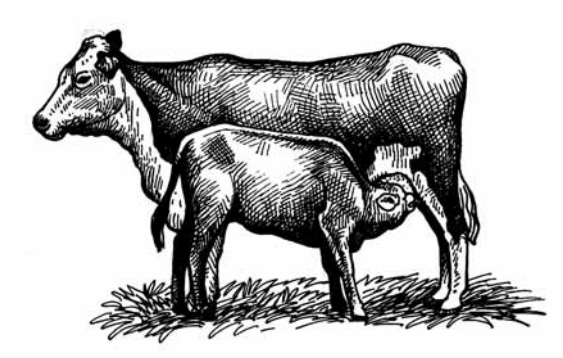

চিত্র : বাছুর মায়ের দুধ পান করছে

চিত্র : বাছুরকে বোতলে দুধ খাওয়ানো n‡"Q

খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো :

এটি ছোট খামারের জন্য তেমন প্রয়োজন না হলেও বড় খামারের জন্য জরুরি। পশুর জাত উন্নয়ন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত কানে ট্যাগ নম্বর লাগিয়ে পশু চিহ্নিতকরণ করা হয়।

পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, gjgÎ ও বিছানা পরিষ্কার রাখা :

বাছুরের সঠিকভাবে বৃদ্ধির জন্য পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত দৈহিক ওজন অনুসারে খাবার প্রদান করা হয়। বর্ধিত বাছুরের চাহিদা অনুসারে জন্ম থেকে ¯^qsm¤úY না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিপালনের জন্য বাছুরের থাকার ঘরটিতে gjgÎ নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়মিত বাছুরের থাকার ঘরের বিছানা পরিবর্তন করে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাছুরের শোয়ার ঘর যথেষ্ট শুকনো রাখতে হবে।

বাছুর সময়মতো ঘরে তোলা ও বের করা :

বাছুরকে সময়মতো ঘরে তুলতে হয় এবং ঘর থেকে বের করতে হয়। বাছুরকে সারা দিন যেমন ঘরে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয় এবং তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় রাখাও ঠিক নয়। বৃষ্টিতে ভেজা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় থাকলে বাছুরের ফুসফুস প্রদাহ রোগ হতে পারে।

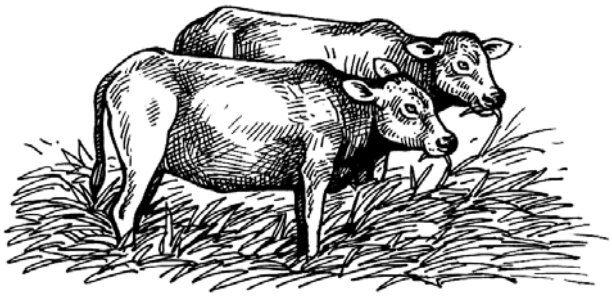

চিত্র : চারণ f‖g‡Z বাছুর ঘাস খাওয়া অভ্যাস করছে

বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা :

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাধিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয়। এই সময়ে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি ভালোভাবে না হলে পরবর্তীতে ভালো উৎপাদনশীল গরু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বাছুরের বিভিন্ন রোগবালাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। বাছুরের স্কায়ার, নিউমোনিয়া, ছত্রাক, বাদলা রোগ, কৃমি ও আঁচিল রোগ দেখা যায়। বাছুরের যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভেড়া পালন

ভেড়া একটি নিরীহ প্রাণী। এরা চারণ ঘাস খেতে খুব পছন্দ করে এবং দলগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, ১৫ মাসে ২ বার ev"Pv দেয়। তাই ভেড়া পালন শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে খামারের আকার বড় হয়ে উঠে এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায়। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কিছু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ভেড়া পশম (Wool) ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। এদেশে ভেড়ার তেমন কোনো ভালো জাত নেই। বাংলাদেশের ভেড়া মোটা পশম উৎপাদন করে। তাই এরা পশমের জন্য জনপ্রিয় নয়। এখানে ভেড়া মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার পশম খুব gj¨ewb ও জনপ্রিয়। ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল,শাল, স্যুয়েটার, জ্যাকেট তৈরি করা হয়। মোটা পশম কার্পেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার এত গুণাগুণ থাকলেও PviYfwg ও উদ্যোগের অভাবে এদেশে এর পালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।

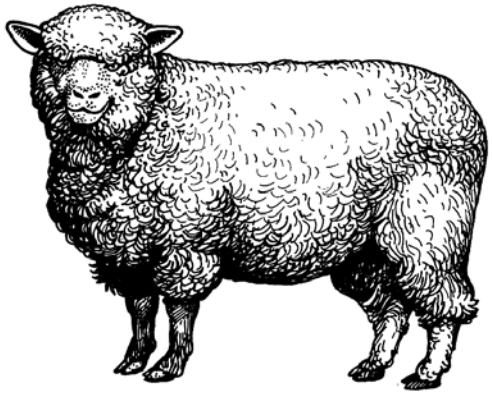

চিত্র : m2 পশমের মেরিনো ভেড়া

চিত্র : মোটা পশমের কারাকুল ভেড়া

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এরা খাবারের জন্য সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবুও নিম্ন লিখিত কারণে এদের বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

১। রাতের বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

২। বন্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

৩। ঝড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য।

৪। বেশি উৎপাদনক্ষম ভেড়ার দুগ্ধ দোহন করার জন্য।

৫। গর্ভবতী, cmwZ ও ev"Pv ভেড়ার পরিচর্যার জন্য।

৬। ভেড়ার পশম কাটার জন্য।

৭। চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়া পালনের জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যথা,

ক. উন্মুক্ত খ. আধা উন্মুক্ত ও গ. আবদ্ধ ঘর। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করে রাতে আশ্রয়ের জন্য ভেড়ার ঘর তৈরি করা হয়। ভেড়ার ঘরের মেঝে fwg সমতলে বা মাচার তৈরি হয়ে থাকে।

ক. উন্মুক্ত ঘর: যেসব AÂ‡j বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট জায়গার চারিদিকে বেড়া দিয়ে উন্মুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন চরে খাওয়ার পর রাতে ভেড়ার পাল এখানে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঝেতে খড় ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : ভেড়ার উন্মুক্ত ঘর

খ. আধা উন্মুক্ত ঘর: উন্মুক্ত ঘরের নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ছাদসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আধা উন্মুক্ত ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় সেখানে আধা - উন্মুক্ত ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।

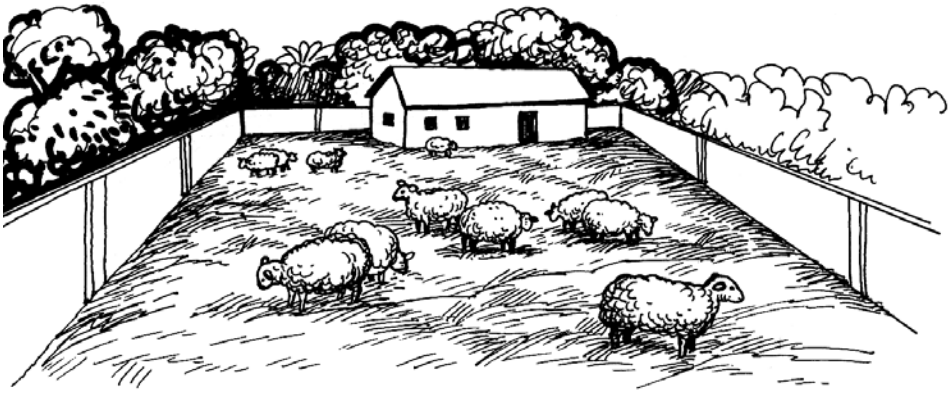

চিত্র : ভেড়ার আধা উন্মুক্ত ঘর

গ. আবদ্ধ ঘর: যেসব AÂ‡j প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হয়, সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবদ্ধ ঘরের পুরা অংশেই চাদ থাকে। ঘরের পাশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ ঘরের মেঝে পাকা ও আধা পাকা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান-

ভেড়ার ওজন/বয়স	মাচার মেঝে (বর্গমিটার)	fwgmgZ‡j খড়ের মেঝে (বর্গমিটার)
বাচ্চা ছাড়া ভেড়ি (৪৫ -৬৮ কেজি)	০.৭৫-০.৯৫	১.০-১.৩
বাচ্চা সহ ভেড়ি (৪৫ -৬৮ কেজি)	১.০-১.৪	১.৩০-১.৭৫
মর্দা ভেড়া (৩২ কেজি)	০.৫৫-০.৭৫	০.৭৫-০.৯৫
মর্দা ভেড়া (২২ কেজি)	০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫
বাচ্চা ভেড়া (৬ সপ্তাহ)	-	০.৪
বাচ্চা ভেড়া (২ সপ্তাহ)	-	০.১৫

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য এবং এদের থেকে বেশি উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে ভেড়ার পশম পরিষ্কার করতে হবে। এতে পশমের ময়লা বেরিয়ে আসবে। ভেড়ার দেহে মাঝে মধ্যে বহিঃপরজীবীনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ভেড়ার পশম কাটার c‡e গোসল করাতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য

ভেড়া যে কোনো ধরনের খাদ্য খেতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এটি গরু, মহিষ ও ছাগলের মতোই জাবরকাটা প্রাণী। ভেড়ার খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস গরু ছাগলের মতোই। এদের রেশনে আঁশযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ দানাদার খাদ্যের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। গর্ভবতী ভেড়ির তুলনায় cmwZi খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। ev"Pv প্রসবের একমাস ce থেকে ভেড়ির খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করতে হয়।

মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার খাদ্য তালিকা-

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪০
চিটা গুড়	৫
গমের ভুসি	১০
খৈল	৯
শুকনো লিগিউম ঘাস	৩৬
মোট	১০০

কাজ
পাঁচটি মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার প্রতিদিন কী পরিমাণ আঁশ ও দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা হিসাব করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

গর্ভবতী ভেড়ির খাদ্য তালিকা:

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৪৫
খৈল	১০
চিটা গুড়	৫
ভুট্টার সাইলেজ	২০
শুকনো লিগিউম ঘাস	২০

cmwZ ভেড়ির খাদ্য তালিকা:

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভালো মানের শুকনো লিগিউম ঘাস	৮০
ভুট্টার গুঁড়া	১৩
খৈল	৪
গমের fwm	৩

নবজাতকের যত্ন

নবজাত মেষ শাবককে জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এতে ev"Pvi রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।

ভেড়ার রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

ভেড়াকে পরিষ্কার cwi"Qb পরিবেশে রাখতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ও সময়মতো টিকা প্রদান করতে হবে। ভেড়া বাদলা, তড়কা, ম্যাস্টাইটিস, খুরা রোগ, চর্মরোগ, কৃমি, বহিঃপরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত ভেড়াকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

হাঁস পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশের নদীমার্তৃক দেশ। এ দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু হাঁস পালনের উপযোগী। এখানে অনেক খালবিল, ডোবানালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ও নদী রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোহরসহ অনেক জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁসের খামার গড়ে উঠেছে। গ্রামের হাঁসের খামারিরা প্রচলিত পদ্ধতিতে হাঁস পালন করে থাকে। কিন্তু হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১। উন্মুক্ত পদ্ধতি
২। অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি
৩। আবদ্ধ পদ্ধতি
৪। ভাসমান পদ্ধতি

উন্মুক্ত পদ্ধতি

হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি n‡"Q উন্মুক্ত পদ্ধতি। বাংলাদেশের MvgvÂ‡j এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সকাল বেলায় হাঁসগুলোকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ থাকে। এখানে হাঁসকে সাধারণত কোনো খাবার দেওয়া হয় না। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন, ছোট মাছ, শামুক, জলজ উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দানাশস্য ও কীটপতঙ্গ নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। হাঁস সকাল বেলায় ডিম পাড়ে। তাই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সময় ডিমপাড়া হাঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। আমাদের দেশের যেসব AÂ‡j পতিত জমি, হাওর বাঁওড় ও নদী রয়েছে সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উত্তম ও লাভজনক। কিন্তু উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা :

১। শ্রমিক কম লাগে।

২। খাদ্য খরচ কম ।

৩। বাসস্থান তৈরিতে খরচ কম হয়।

৪। পরিবেশের সাথে অভিযোজন ভালো হয়।

৫। এদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ভালো হয়।

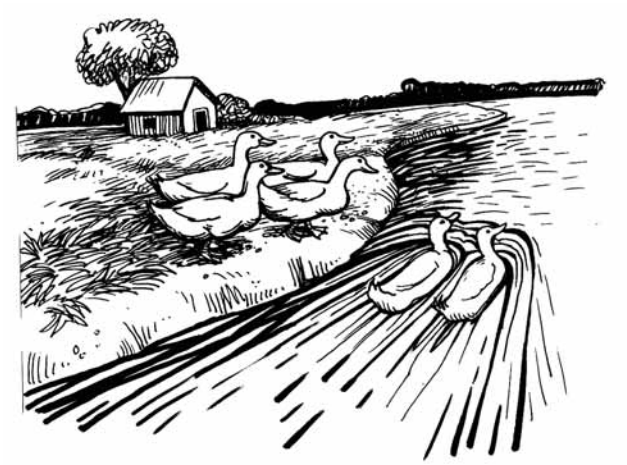

চিত্র : উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা :

১। অনেক পতিত জমি ও জলমহলের প্রয়োজন হয়।

২। বন্য পশুপাখি হাঁসের ক্ষতি করার আশঙ্কা থাকে।

৩। অনেক সময় খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হয়ে থাকে।

৪। সবসময় পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

৫। অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে থাকে।

আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসকে সব সময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ev"Pv হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

১। মেঝে পদ্ধতি

২। খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি

মেঝে পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের ev"Pv আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে বিছানা হিসাবে খড়ের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে বিছানা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

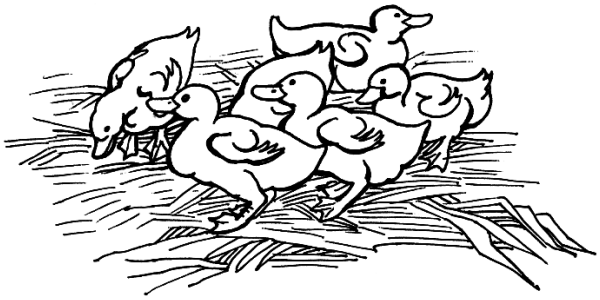

চিত্র : মেঝেতে হাঁসের ev"Pv পালন

ব্যাটারি বা খাঁচা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের ev"Pv‡K খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ev"Pvi জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। ev"Pv পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

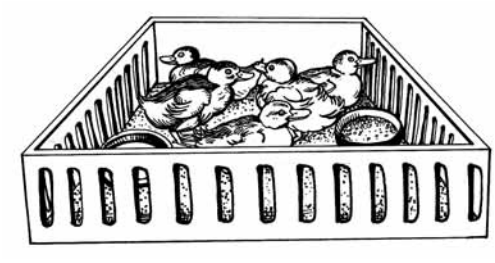

চিত্র : খাঁচায় হাঁসের ev"Pv

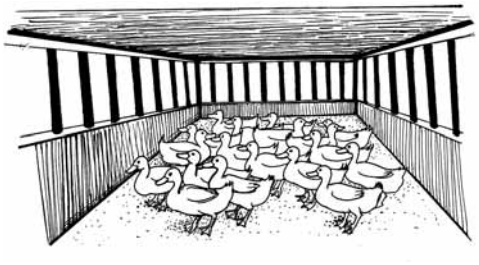

চিত্র: আবদ্ধ পদ্ধতিতে বয়স্ক হাঁস পালন

আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা :

১। খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।

২। সহজে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৩। শ্রমিক কম লাগে।

৪। বন্য পশুপাখি হাঁসের ক্ষতি করতে পারে না।

৫। প্রতিটি হাঁসের জায়গা কম লাগে।

আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা :

১। বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়।

২। ঘর নির্মাণ খরচ বেশি হয়।

৩। হাঁসের মুক্ত আলোবাতাসের অভাব হয়।

৪। পাখির যন্ত্রপাতি খরচ বেশি।

৫। নিবিড় যত্ন নিতে হয়।

৬। এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায় না।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁসকে রাতে ঘরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট জলাধার বা জায়গার মধ্যে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। জায়গাটি জলাধার না হলে হাঁসকে সাঁতার কাটার জন্য কৃত্রিম জলাধার, নালা বা †PŠev"Pv তৈরি করে দিতে হয়। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে ও খাবার পানি খেতে পারে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা :

১। এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায়।

২। দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে।

৩। শ্রমিক কম লাগে।

৪। খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা :

১। হাঁস পালন খরচ বেশি।

২। নিবিড় যত্ন নিতে হয়।

৩। খাদ্য খরচ বেশি।

৪। খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।

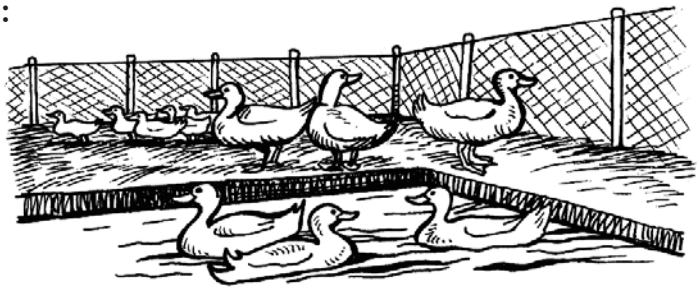

চিত্র: অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

ভাসমান ঘরে হাঁস পালন :

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও বয়স্ক হাঁস পালনের উপযোগী। বড় পুকুর,

দিঘি বা নদীর কিনারায় পানির উপর হাঁসের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে নির্মাণ খরচ একটু বেশি হলেও খাদ্য খরচ কম। ভাসমান ঘর তৈরির জন্য ড্রাম ব্যবহার করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে বন্যা বেশি হয়, সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন খুবই সুবিধাজনক।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

হাঁসকে পরিষ্কার-cwi"Qb পরিবেশে রাখতে হবে। হাঁসকে সময়মতো টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। হাঁস ডাক পেগ, কলেরা ও পরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত হাঁসকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

নতুন শব্দ : হাওর-বাঁওড়, ভাসমান পদ্ধতি, অভিযোজন, জলমহল, কৃত্রিম জলাধার, ডাক পেগ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিল্পের কাঁচামাল : কৃষিজ দ্রবাদি

কৃষি মানবজাতির বেঁচে থাকার একটি অনন্য নিয়ামত এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষেকৃষি শিল্পের কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। আবার গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল হিসাবে কাঠ, গুল্ম ও ঘাস জাতীয় দ্রবাদি সরবরাহ করে। চা, কফি, চিনি, তুলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৃষিজ দ্রব্যাদি ছাড়াও বাঁশ, বেত, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, আম ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কুটির শিল্পের উত্থান n‡"Q বাঁশ-বেতের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার বাঁশ-বেত দ্বারা কিসব জিনিস তৈরি হয়, নারিকেলের ছোবড়া কী উপকারে আসে- আর আম দ্বারা কিসব তৈরি হয়। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

আমজাত খাদ্যসামগ্রী ও ব্যবহার

আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে যত ফল আছে তন্মধ্যে স্বাদের দিক থেকে আমের অবস্থান প্রথম। আম নাতিশীতোষ্ণ AÂ‡ji ফসল। এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই আম উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদনের দিক থেকে ভারত প্রথম স্থান দখল করে আছে। আর বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই কমবেশি আম জন্মে। তবে বেশি আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো হ"Q- বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা। মোট আমের ৮০ ভাগের বেশি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় উৎপাদন হয়।

কাঁচা আম, পাকা আম প্রতিয়াজাতকরণ করে আমের মোরব্বা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচুর, আমসত্ত্ব, পাকা আমের বোতলজাত জুস ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরি হ"Q।

নারিকেলজাত দ্রব্য ও ব্যবহার

নারিকেল একটি অর্থকারী ও তেলজাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরি হয়। নারিকেল গাছের পাতা দ্বারা ঝাঁটাও তৈরি হয়।

নারিকেলের কচি ফলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। রোগীর পথ্য হিসাবেও ডাবের পানির ব্যবহার হয়। DcKj AÂ‡ji †লাকেরা তরকারিতে নারিকেলের শ্বাস ব্যবহার করেন। আর ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরিতে বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হতে মাথায় দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয়। গিসারিণ সাবান ও অন্যান্য কসমেটিকস তৈরিতেও নারিকেল ব্যবহার করা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া

বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল উৎপাদনের সাথে নারিকেলের ছোবড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে নানা গৃহস্থালি e¯Í তৈরি হয়।

যেমন- খাটের জাজিম, ওয়ালম্যাট, পাপোশ, রশি ইত্যাদি জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।

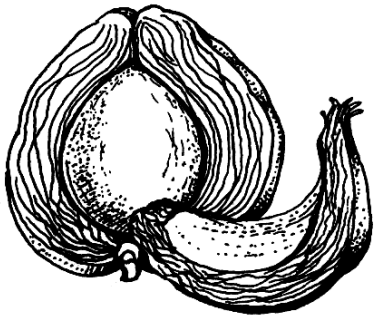

চিত্র : নারিকেলের ছোবড়া

শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষি দ্রব্যাদি ব্যবহারের গুরুত্ব

বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার

বাঁশ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গুরুতcY অকাঠ বনজ ও প্রাকৃতিক m¤ú`| আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাঁশকে পারিবারিক বা গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। গৃহনির্মাণ ও গৃহসামগ্রী থেকে শুরু করে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার ॥e¯ÍZ| বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাঁশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, পাইবোর্ড, ঢেউটিন এমনকি প্যানেল পর্যন্ত তৈরি n‡"Q| প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশ পাতলা করে চেরাই করে চাটাই, ডোল, বীম, আড়, ঘরের খুটি, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, টুকরি, ঝুড়ি, কুলা মাছ ধরার খাঁচা, পলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।

চিত্র : বাঁশ

আধুনিক বিশ্বে দেশে ও বিদেশে বাঁশের n¯Í ও কুটির শিল্পের cfZ উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বাঁশ থেকে স্বাস্থ্যকর লেমিনেটেড বাঁশের মেঝে ও দেওয়ালকভার, মাদুর, কুশন, সিটকভার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব n‡"Q|

বাঁশ শিল্পের শ্রেণি বিভাগ

বাঁশ শিল্পকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা :

১। কাগজশিল্প

২। নির্মাণশিল্প

৩। ক্ষুদ্র n¯Í॥kí

কাগজ শিল্প

gwjewk কাগজ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। মুলিবাঁশের তৈরি কাগজের মণ্ড দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপজাত হিসাবে রেয়নও c¯‘Z হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঁশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়াও বাঁশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, পাইবোর্ড, ফ্লেকবোর্ড বাঁশের ঢেউটিন, প্যানেল বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নির্মাণশিল্প

বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণশিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজ যেমন খুঁটি দেওয়া ঘরের বেড়া দেওয়া, বীম বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

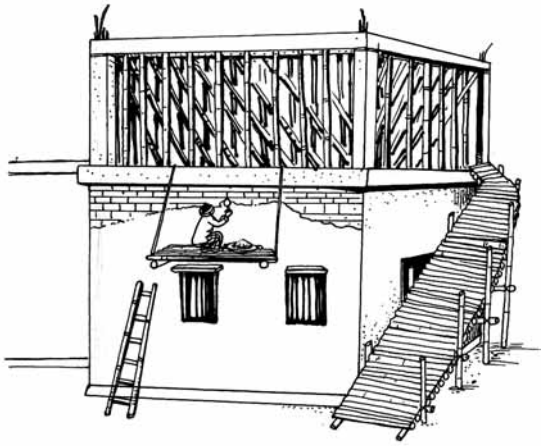

চিত্র : দালানকোঠা নির্মাণে বাঁশ

আরও অনেক নির্মাণশিল্প যেথায় বাঁশ অতীতকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন, গ্রামের খাল বা Ack¯Í নদীতে সেতু বা সাঁকো তৈরিতে, নৌকার gv¯‘j, ছই, পাটাতন, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, জোয়াল, ঘানি ও মাড়াই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুঁটি, মাছ ধরার চাঁই, খাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ম জালের দণ্ড, সবজির লাগানো গাছ বেয়ে উঠার জন্য মাচা, নৌকার হাল ও দাঁড়ের দণ্ড, বক্তৃতার gÂ, তোরণ এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত n‡"Q নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দ্বারা Kc তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় আর্টেজীয় Kc| এই K‡ci সাহায্যে পাহাড়ি এলাকায় জমি চাষ করা হয়।

ক্ষুদ্র n¯ÍwkÍ

ক্ষুদ্র n¯ÍwK‡íB অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের দ্রব্যজাত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। mg¯Í প্রকার বাঁশ বয়ন ক্ষুদ্র n¯ÍwkíiB অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, ডোলা, কুলা, ঝুড়ি, ঝাকা, চালনি, খাঁচা, খেলনা, কলম, টুপি, ফুলদানি, লাইট স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠি এমনকি দাঁত খিলান, বুকসেলফ ইত্যাদি।

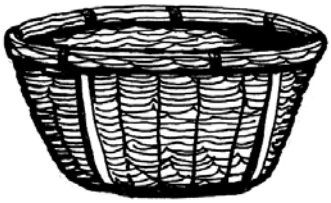

চিত্র : টুকরি

চিত্র : পলো

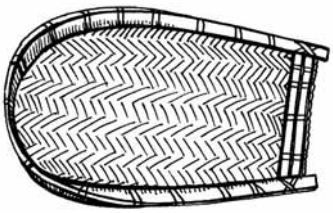

চিত্র : কুলা

ঔষুধি বাঁশ

বাঁশ শুধু কাগজ তৈরি বা গৃহ সামগ্রী তৈরির কাজেই ব্যবহার হয়না। ঔষধ তৈরির কাজেও বাঁশ ব্যবহার হয়। বাঁশের অনেক জাত আছে। তন্মধ্যে সোনালী বাঁশ বিভিন্ন রোগের কাজে লাগে, কাশি, শোথ রোগ, প্রস্রাবজনিত রোগ, ফোঁড়া পাকা ইত্যাদি মানুষের সাধারণ রোগ। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার মহৌষধ n‡"Q এই সোনালি বাঁশ। ঔষধ হিসেবে বাঁশের শীষ, পাতা ও gj ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই এগুলো কবিরাজের পরমর্শমত ঔষধ তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে।

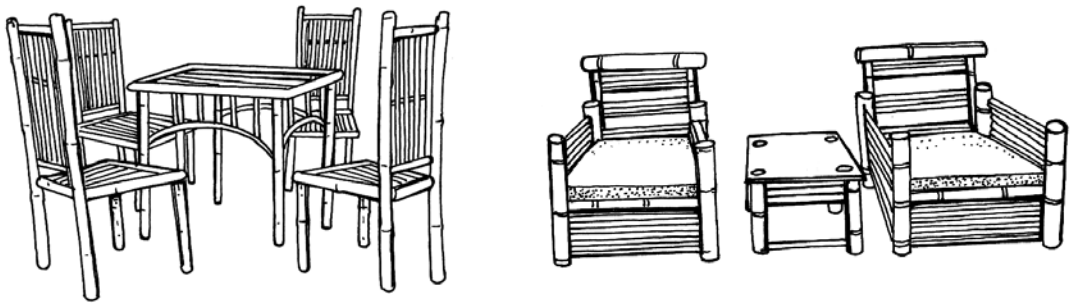

চিত্র : বাশের চেয়ার ও সোফা

কাজ : শিক্ষার্থীরা যেখানে ঝুড়ি তৈরি করা হয় এমন স্থান পরিদর্শন করবে এবং ঝুড়ি তৈরির ধাপগুলো লিখে আনবে। পরবর্তীতে হাতে কলমে নিজেরা করবে।

বেত ও বেতের ব্যবহার

বেত কাঠ ও বাঁশের মতো প্রাকৃতিক বনজ m¤ú`| বাংলাদেশের বনে জঙ্গালে অনেক ধরনের বেত পাওয়া যায়। বেত উৎপাদনের জন্য কৃষি fwg ব্যবহার করা হয়না। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম AÂ‡j প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর বেত উৎপাদন হয়। বেত, তাল ও নারিকেল গোত্রীয় কিন্তু কাঁটাযুক্ত লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর ফল হয়। যা বেত ফল নামে পরিচিতি।

চিত্র : বেত গাছ

বেত শিল্প

বেতের শিল্পগুণের জন্যই বেত সবার নিকট সুপরিচিত। বেতের কাণ্ড বেত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেতের কাণ্ড শক্ত বটে কিন্তু নমনীয়ও চেরাইযোগ্য। এ থেকে আকর্ষণীয় ও আভিজাত্যবহনকারী শিল্পদ্রব্য c¯‘Z করা হয়।

বেতের ফার্নিচার তৈরি

বেতের তৈরি ফার্নিচার একেবারেই প্রাকৃতিক। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই বেতকে সুতার মতো ব্যবহার করে কোনো শক্ত জিনিসের (রড, বাঁশ) উপর পেঁচিয়ে ফার্নিচার তৈরি করা যায়। আবার বেতের মোট শাখা প্রশাখা শুকিয়ে শোধন করে শক্ত কাঠামো দাঁড় করিয়ে সোফা, চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, খাট, দোলনা, মোড়া, জুতা রাখার তাক, কর্ণার সেলভ, ওয়ার্ডড্রোবস, রকিং চেয়ার, আরাম কেদারা ইত্যাদি ফার্নিচার বা আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

ফার্নিচার তৈরির আগে বেতগুলোকে সাইজ মতো কেটে শোধন করতে হবে। একটি চাড়িতে আনুমানিক হারে বরিক এসিড ও পানির দ্রবণ তৈরি করে এই দ্রবণে বেত এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে ঘুন বা অন্যান্য পোকা-মাকড় আক্রমণ করবে না।

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই n‡"Q গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

১। হালকা নির্মাণশিল্প
২। বুননশিল্প
৩। ক্ষুদ্র n¯ÍwkÍ
৪। মিশ্রশিল্প

হালকা নির্মাণশিল্প :

বেতের হালাক নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় মোটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা ভার বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদাহরণ n‡"Q- সোফাসেট, চেয়ার, খাট, পার্টিশন, শেলফ, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পের যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমাণে বেশি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প নৈপুণ্যের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণ শিল্পের দ্রব্যাদিও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত গোলাবেত, উদমবেত, কদমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

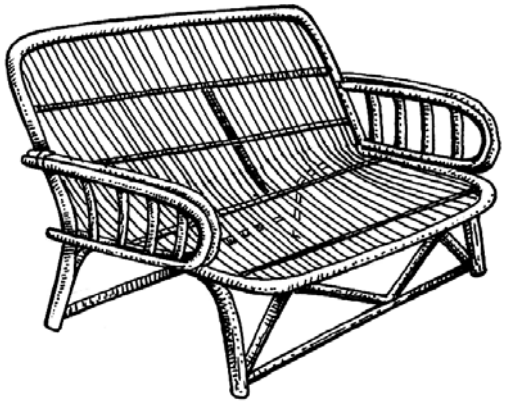

চিত্র : বেতের সোফা সেট

বুনন শিল্প

বুননশিল্পে সরু ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেরাই করে আরও সরু ফালি পাওয়া যায়। এই সরু ফালিকে বেতি বলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেতি ব্যবহার করা হয়। বুনন শিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণ শিল্পকে কারুকার্যময় ও নান্দনিক করা হয়। বুনন শিল্পের জন্য বান্দরিয়েত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

ক্ষুদ্র n¯ÍwkÍ:

e¯‘Z বেতশিল্পের পুরোটাই n¯ÍwkÍ- ক্ষুদ্র হোক অথবা বড় হোক। নির্মাণশিল্প ও বুননশিল্পের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে সৌন্দর্যবর্ধক যেসব দ্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাকেই বলে বেতের ক্ষুদ্র n¯ÍwkÍ| বেতের ক্ষুদ্র n¯Íwk‡íi উদাহারণ n‡"Q খেলনা, ফুলের সাজি, কলমদানি, বেতের ধামা, জুতার র‍্যাক, মোড়া, ফুলদানি ইত্যাদি।

চিত্র : বেতের ধামা

মিশ্রশিল্প :

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক, নাইলন, স্টিল ইত্যাদি মিশ্রণ করে যেসব দ্রবাদি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। মোটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ বড় ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্র শিল্প হিসাবে দোলনা, মোড়া, র‍্যাক, সেলফ, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার সরু বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্লাস্টিকের বেতি মোটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খাট, বাক্স, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

চিত্র : ফুলের সাজি

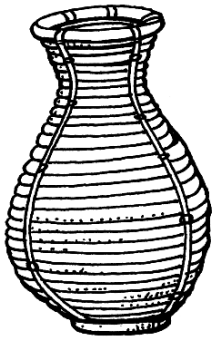

চিত্র : ফুলদানি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঔষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

ঔষধি উদ্ভিদ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে হরেক রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বহুবিধ উপায়ে এসব উদ্ভিদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। খাদ্য, e¯¿, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের সকল চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা বিশাল উদ্ভিদরাজির উপর নির্ভরশীল। Gm¤ú‡K ইতোমধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা দেখেছি বা শুনেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোটদের সর্দি কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এর ফলে তাদের সর্দি-কাশি উপশম হয় এবং তারা আরাম পায়। হঠাৎ করে কারও শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে গাঁদা ফুলের পাতা বা `eÿNvm ভালো করে ধুয়ে শীলপাটায় বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে। সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে পরিবেশের যেসব উদ্ভিদ আমাদের রোগ ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ে ব্যবহার হয়, সেগুলোকেই ঔষধি উদ্ভিদ বলা হয়।

ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ

আমাদের দেশ এক সময় ঔষধি উদ্ভিদে সমৃদ্ধ ছিল। মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, বন-জঙ্গল সর্বত্র অসংখ্য ঔষধি উদ্ভিদে ভরপুর ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে fwgi বহুবিধ ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া অজ্ঞতা, অবহেলা ও অযত্নের কারণে বর্তমানে এসব ঔষধি উদ্ভিদের প্রধান উৎপত্তিস্থল প্রাকৃতিক উৎস ebfwg কমে যাওয়ায় ঐসব gj¨evb বৃক্ষ m¤ú` হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখনও আমাদের দেশের আনাচে-

কানাচে যথেষ্ট ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলো আমরা চিনি না। এমনকি সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ m¤ú‡KI আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। চারপাশের এসব ঔষধি D™`mgn শনাক্ত করতে পারা এবং সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ m¤ú‡K আমাদের সচেতন হতে হবে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের রোগব্যাধি নিরাময়ে ব্যাপক fwgKv রাখতে পারব।

ঔষধি উদ্ভিদ

থানকুনি

তুলসী

কালমেঘ

বাসক

সর্পগন্ধা

অর্জুন

হরিতকী

আমলকী

বহেড়া

নিসিন্দা

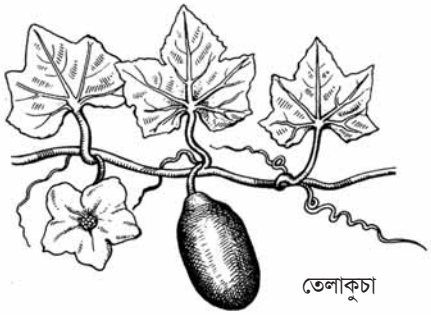
তেলাকুচা

কাজ : শিক্ষক নমুনা ঔষধি উদ্ভিদ শ্রেণিতে নিয়ে আসবেন, সেগুলো শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদের নামের তালিকা তৈরি করবে।

ঔষধি উদ্ভিদ ও এদের ব্যবহার :

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে রোগব্যাধি উপশমে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ ব্যবহার করে উপকৃত n‡"Q| ওষধি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব উদ্ভিদকে ঔষধি বা ভেষজ উদ্ভিদ বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদের পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

৬. **থানকুনি :** থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে gj এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল বৃক্কের মতো, একান্তর।

ব্যবহৃত অংশ : mg¯Í উদ্ভিদ

ব্যবহার : ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময় থানকুনি খুব বেশি ববহৃত হয়। এছাড়া থানকুনি আয়ুবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমরক্ত নাশক, চর্মরোগনাশক।

৭. **তুলসী :** তুলসী অতিপরিচিত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি সাধারণত ৩০ সে: মি হতে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, cÖZgL, ডিম্বাকার, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কার্শিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েদের তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

৮. **কালোমেঘ :** এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ২০ সেমি. থেকে ১ মিটার উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিতা। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : mg¯Í গাছ, বিশেষ করে পাতা।

ব্যবহার : ছোট ছেলে-মেয়েদের জ্বর, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এর রস একটি অত্যন্ত ভালো ঔষধ।

৯. **বাসক :** গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি।

ব্যবহৃত অংশ : পাতার নির্যাস,

ব্যবহার : কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয়। সমপরিমাণ, আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস খেলে কার্যকরী হয়।

১০. **সর্পগন্ধা :** সর্পগন্ধা একটি বহুবর্ষজীবী বিরুৎ। প্রতিপর্বে সাধারণত ৩টি পাতা থাকে। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহৃত অংশ : সর্পগন্ধার g‡ji বা ফলের রস D"P রক্তচাপে ব্যবহৃত হয়। পাগলের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

১১. **বহেড়া :** এটি একটি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বোঁটা লম্বা। ফুল সবুজাভ সাদা, ডিম্বাকৃতির। ফলে একটি করে বীজ থাকে। ফল গোলাকৃতির বা ঈষৎ লম্বাটে।

ব্যবহৃত অংশ : ফল ও বীজ

ভেষজ ব্যবহার : ত্রিফলার অন্যতম ফল বহেড়া। বীজের শাঁস (বাদামের মতো) দু'একটি করে দুঘণ্টা অন্তর এবং দিনে দুটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেড়া PY সকাল-বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। বহেড়ার

ফল পেটের পীড়া, অর্শ্ব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং চুল পড়া বন্ধ করে।

১২. হরিতকী : বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃন্তক। ফুল শ্বেতবর্ণ ও ছোট হয়। ফল লম্বাকার হালকা খাঁজযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ : ফল ও কাঠ

ভেষজ ব্যবহার : আয়ুর্বেদিক ঔষুধ ত্রিফলার অন্যতম ফল হরিতকী। হরিতকী ফল PY করে একটু লবণ মিশিয়ে সেবন করলে অর্শ্বরোগ নিরাময় হয়। হরিতকী PY পাইপে ভরে ধুমপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। যে কোনো ক্ষতে হরিতকী পোড়া ছাইয়ের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়। চিনি ও পানির সাথে হরিতকী PY ব্যবহার করলে চোখ উঠা ভালো হয়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাকাফল i³kb¨Zv, পিত্তরোগ, হৃদরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য। djPY দন্তরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী বলবৃদ্ধিকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বার্ধক্য নিবারক।

১৩. অর্জুন : অর্জুন মাঝারি থেকে বৃৎদাকৃতির বৃক্ষ। কাণ্ড সরল উন্নত, মসৃণ এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ডিম্বাকৃতির। ফুল হলুদাভ ক্ষুদ্রাকৃতির, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ।

ভেষজ ব্যবহার : কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভালোভাবে পেষন করে তার রস চিনি ও দুধের সাথে প্রত্যেহ সকালে সেবনে যাবতীয় হৃদরোগ আরোগ্য হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। ছালের রস সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপসম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের PY দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয়। AR‡bi ছালের মিহি গুঁড়া মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেচতার দাগ মিলিয়ে যায়।

১৪. আমলকী : মাঝারি আকারের বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, উপপত্র বিপরীতভাবে web¨¯Í| ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ। ফল রসাল, মাংসল, সবুজ, গোলাকৃতি, মুখরোচক ও উপাদেয়। মার্চ থেকে মে মাসে ফুল আসে।

ভেষজ ব্যবহার : আমলকী পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক এবং টনিক। ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজম ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। আমলকীর ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, জন্ডিস, চর্মরোগ, ডায়া, চুল পড়া, প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

১৫. ঘৃত কুমারী : বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লম্বা কিনারা খাঁজা কাটা, রসাল।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা থেকে নির্গত ঘন wcw"Qj রস।

ভেষজ ব্যবহার : পাতা থেকে নির্গত ঘন wcw"Qj রস কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসুঔষধ। এটি ক্ষুধামন্দা, জন্ডিস, লিউকোমিয়া, অর্শ্বরোগ, কাটা-পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় djcm অবদান রাখে। প্রসাধন দ্রব্যে এর মিশ্রণে প্রসাধনের মান উন্নত হয়।

১৬. তেলাকুচা : এটি লতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বন বাদাড়ে আপনা-আপনি এ গাছ, জন্মাতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাণ্ড ও পাতা

ভেষজ ব্যবহার : এ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার নির্যাস ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এর নির্যাস সর্দি, জ্বর, হাপানি ও gQv‡ivM চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এর পাতা বাটার প্রলেপ বেশ উপকারী।

কাজ : ঔষধি উদ্ভিদের নাম ও ব্যবহার নিয়ে দলীয় আলোচনা উপস্থাপন কর।

ঔষধি ¸Ym¤úb বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা :

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি ¸Ym¤úb বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোগ নিরাময় উপশমে কার্যকরী fwgKv পালন করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা kv‡¯¿i ব্যাপক উন্নতির পিছনে ঔষধি উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের নিকট ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময় খুবই জনপ্রিয়। কারণ ঔষধি উদ্ভিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, m¯Iv Ges তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এ কারণে বর্তমানে ঔষধি ¸Ym¤úb আয়ুর্বেদী ও ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থাও আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার উৎকর্ষ চরমে পৌঁছলেও মানুষ আবার সেই প্রাচীন ঔষধি ¸Ym¤úb উদ্ভিদের ঔষুধ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। পৃথিবীর বহুদেশ ভেষজ ঔষুধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষুধশিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

কাজ : 'রোগ নিরাময়ে ঔষধি গাছপালা' এ বিষয়ের উপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উফশী ধানের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

২. আউশ, আমন ও বোরো ধানের ২টি করে জাতের নাম লিখ।

৩. দেশি পাট ও তোষা পাটের ২টি করে জাতের নাম লিখ।

৪. তেউড় কত প্রকার ও কী কী?

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. ধানের জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও `¯Iv সার প্রয়োগের নিয়মাবলি লেখ।

২. গোলাপের বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকামাকড়ের একটি তালিকা তৈরি কর এবং যেকোনো ১টি রোগ ও একটি পোকার দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩. সংক্ষেপে কলার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষিজাত দ্রব্যাদির গুরুত্ব লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন পোকা ধানের দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে ?

ক. মাজরা পোকা খ. পামরিপোকা

গ. গান্ধিপোকা ঘ. চুঙ্গী পোকা

২. গাজী ধানের বৈশিষ্ট্য n‡"Q-

i. গাছ খাটো হয়।

ii. পাতা হেলানো থাকে

ii. ফলন বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. কোনটি পাটের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ?

ক. কাণ্ডে কালো বেষ্টনীর মতো দাগ থাকে। খ. কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ হয়।

গ. আক্রান্ত স্থান ফেটে যায়। ঘ. কাণ্ডে কালো কালচে দাগ হয়।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তাসফি মিয়া একজন পাট চাষি। তিনি এ বছর তার দুই খণ্ড জমিতে সি-সি-৪৫ ও চিন mi¦ গ্রিন জাতের পাটের চাষ করেন। তিনি সিসি-৪৫ জাতের পাট আষাঢ় মাসে ও চিন mi¦ গ্রিন জাতের পাট ভাদ্র মাসে কাটেন। তিনি প্রতি খণ্ড থেকে ১৫০০ টি করে আঁটি পান। পাট জাগ দেওয়ার সময় তিনি ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন।

৪. তাসফি মিয়া দুই খণ্ড জমির পাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাটার কারণ-

i. ফসলের পরিপক্বতা ভিন্নতা হওয়ায়

ii. জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য

iii. ফসলের জাতের ভিন্নতা থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. তাসফি মিয়ার পাট পচানোর জন্য কত কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন?

ক. ১৫ কেজি খ. ২০ কেজি

গ. ২৫ কেজি ঘ. ৩০ কেজি

সৃজনশীল প্রশ :

১. আয়শা বেগম বিল AÂ‡j উঁচু ভিটে বাড়িতে বসবাস করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ৫ শতক জমিতে পালংশাক চাষ করে সফলতা লাভ করলেন। এ সফলতার পর তিনি বিলে অবস্থিত তার জমিগুলোর উঁচু আলেও পালংশাক চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

ক. পালংশাকের একটি জাতের নাম লিখ।

খ. পালংশাক চাষে 'ইউরিয়া সার' উপরি প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আয়শা বেগম জমিতে কী পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করেছিলেন নির্ণয় কর।

ঘ. আয়শা বেগমের পরিকল্পনা তার কৃষি কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশেষণ কর।

২।

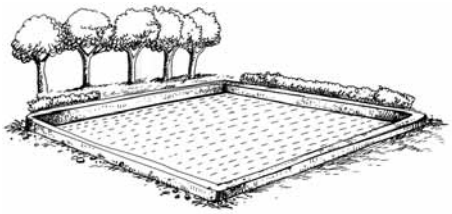

চিত্র - ক

চিত্র - খ

ক. সমন্বিত চাষ কাকে বলে ?

খ. সমন্বিত চাষে fwgi ব্যবহার দ্বিগুণ হয় কীভাবে ? ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্র ক ও খ-এ উলিখিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটির উৎপাদন খরচ কম কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরিবারের আয় ও পুষ্টি বৃদ্ধিতে চিত্রে উলিখিত কোন পদ্ধতিটি উত্তম–যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৩। মেঘনার তীরের বাসিন্দা কৃষক তোরাব তার দুই একর জমিতে পাট চাষ করলেন। কিছুদিন পর তার পাটের জমিতে শুঁয়োযুক্ত এক ধরনের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হলো। তোরাব বিচলিত না হয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকা দমন করলেন। ফলে তার জমিতে পাটের আশাতীত উৎপাদন হওয়ায় পরবর্তী বছর এলাকার অন্যান্য কৃষকরা তাদের জমিতেও পাট চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ক. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?

খ. স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও পাটের বীজ বেশি বোনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃষক তোরাব আলীর জমিতে পোকা দমন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কৃষকদের সিদ্ধান্ত ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু সুফল বয়ে আনবে তা gj¨vqb কর।

cÂg Aa¨vq

বনায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছলাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বলা হয় বনায়ন। বনায়নের ফলে বনভূমি হতে সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বসতবাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধের ধার, পাহাড়ি AÂj ও উপকূলীয় AÂ‡j বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সৃজিত বনায়নকে বলা হয় সামাজিক বনায়ন।

বাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি ও তা সংরক্ষণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। কোনো দেশের বা AÂ‡ji we¯ÍY এলাকাজুড়ে বড় বড় বৃক্ষরাজি ও লতা-গুল্মের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বনকেই বনভূমি বলা হয়। এসব বনভূমি কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় ও গড়ে ওঠে। আবার কখনো মানুষ তার প্রয়োজনে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শুধুমাত্র ১০ ভাগ। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের ebvÂ‡ji we¯ÍwZ, ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য m¤ú‡K জানব। এছাড়াও বন সংরক্ষণ বিধি, বন নার্সারি, বন নার্সারির বীজ, বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ এবং উপকূলীয় বনায়ন m¤ú‡K we¯ÍwiZ জানব।

চিত্র : DcKjxq বন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশের ebvÂ‡ji ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের ebvÂ‡ji নাম উলেখ করতে পারব।

- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারির বীজ m¤ú‡K বর্ণনা করতে পারব।
- বন নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তক্তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- DcKjxq বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ebvÂ‡ji we¯ÍwZ

বন একটি দেশের gj¨evb m¤ú`| আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বcY| সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এই বন সারাদেশে সমানভাবে we¯ÍZ নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশের ce, `w¶Y-cevÂj এবং `w¶Y-cwðgvÂ‡j অবস্থিত। দেশের উত্তর ও DËi-cwðgvÂ‡j বনভূমির পরিমাণ খুবই কম।

অবস্থান ও we¯ÍwZ‡f‡` বাংলাদেশের ebvÂ‡ji ধরন

বনভূমির অবস্থান ও we¯ÍwZ অনুসারে বাংলাদেশের ebvÂj‡K প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন ২। সমতলভূমির বন ৩। ম্যানগ্রোভ বন ৪। সামাজিক বন ৫। কৃষি বন

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন AÂ‡ji বনভূমির পরিমাণ দেখানো হলো–

অবস্থান ও we¯ÍwZ‡f‡` বাংলাদেশের ebvÂ‡j (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সৃজিতবন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

ebvÂ‡ji **ধরন ও বৈশিষ্ট্য :**

পাহাড়ি বন

আমাদের দেশের cevÂj ও `w¶Y-cevÂ‡j পাহাড়ি বন অবস্থিত। বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবন, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজার এবন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পাহাড়ি গাছ n‡"Q- গর্জন, রাজকড়ই, চাপালিশ, তেলসুর, কড়ই, গামার, P¤úv, জারুল, সেগুন, বন্য আম প্রভৃতি। পাহাড়ি বন এলাকায় নানা ধরনের বাঁশও জন্মে থাকে। এসব বাঁশের মধ্যে বরাক, gjx, উরা, মরাল, তলা, কেইট্টা, নালা প্রভৃতি। পাহাড়ি ebvÂ‡j হাতি, বানর, শুকর, ভালুক, বনমুরগী, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিভিন্ন রকমের পাখি ও কীট পতঙ্গ পাহাড়ি ebvÂ‡j দেখা যায়। বড় বড় গাছপালা ছাড়াও লতা-গুল্মসহ অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাহাড়ি ebvÂ‡j জন্মে থাকে। দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পাহাড়ি বনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ বনের পরিমাণ ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।

চিত্র : পাহাড়ি বন

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা AÂ‡ji বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি, এছাড়া কড়ই, রেইনট্রি, জারুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে hv‡"Q| ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে hv‡"Q| ইতোমধ্যে অনেক স্থানে ebkb¨ হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া n‡"Q| জনগনের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত n‡"Q| এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল ও শালিক দেখা যায়। এ বনের মোট পরিমাণ ১.২৩ লক্ষ হেক্টর।

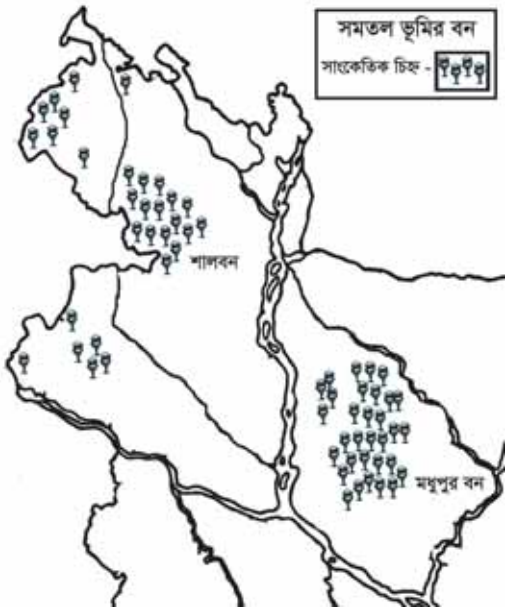

চিত্র : সমতলভূমির বন

ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যহ সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে লোনা পানির বনও বলা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের we¯ÍZ এলাকা ম্যানগ্রোভ বলে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। সুন্দরি বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দর বন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের উর্ধ্বমুখী বায়বীয় gj রয়েছে। যার সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ g‡ji পক্ষে অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। এ বনের ¸iZcY বৃক্ষ হলো- গেওয়া, গরান, পশুর, কেওয়া, বাইন, কাকড়া, গোলপাতা ও মোটা বেত। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগর, বিচিত্র রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কুমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দর বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও m¤ú`kvjx ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। এবনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের ৩টি জায়গায় এই বনভূমি রয়েছে। ১। চকোরিয়া ২। টেকনাফ ৩। খুলনার সুন্দরবন।

চিত্র : ম্যানগ্রোভ বন

গ্রামীণবন : বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে গ্রামীণ বন রয়েছে, মানুষ বসতভিটা, পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে এসব বন গড়ে তোলে।

কাজ - ১ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিচের ছকের কাজটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করবে।

বনের নাম	অবস্থান	উলেখযোগ্য উদ্ভিদ	বসবাসকারী প্রাণী
১। পাহাড়ি বন			
২। সমতল ভূমির বন			
৩। ম্যানগ্রোভ বন			

কাজ - ২ শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখে বিভিন্ন বনের অবস্থান চিহ্নিত করবে।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বনে মজুদ থাকা কাঠের পরিমাণকে গ্রোয়িং স্টক বলা হয়। এই গ্রোয়িং স্টক এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

বন ভূমিতে মজুদ মাঠের পরিমাণ

বনের ধরন	মজুদ কাঠের পরিমাণ মিলিয়ন* ঘন মিটার
পাহাড়ি বন	২০.৭১
ম্যানগ্রোভ বন	১২.৩২
সমতল ভূমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মোট	৮৮.৯১

* মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

ebvÂ‡ji ধরন ও বৈশিষ্ট্য ঃ সামাজিক বন

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি m¤ú³ থাকে। জনগণের স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন KgmwP ev¯Íewqz হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় PivÂjmg‡n g¨vb‡Mvf ebvÂj সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক বনায়ন KgmwP গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত n‡"Q| বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন KgmwP প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম ev¯Íewqz n‡"Q| প্রধানতঃ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

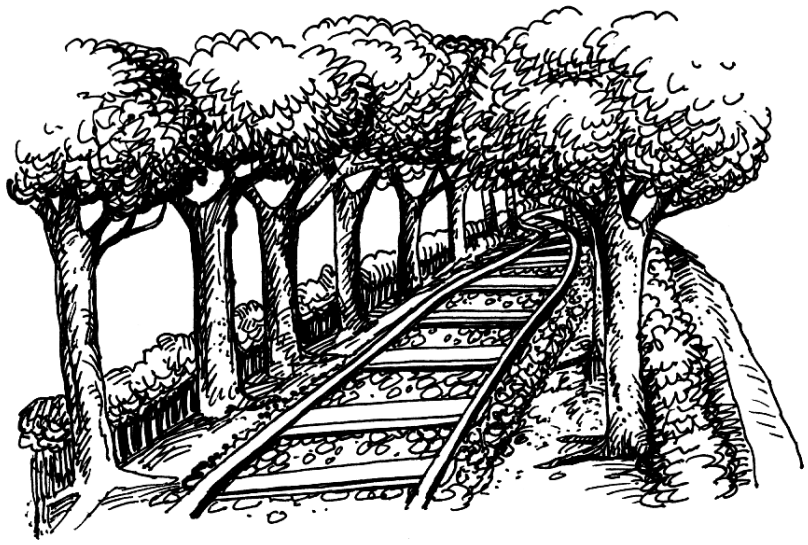

চিত্র : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা :

১। গৃহনির্মাণ ও আববাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি ciY|

২। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র বিমোচন।

৪। পশুখাদ্য, শাকসবজি, ফলমুল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজন।

৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ `IY রোধ ও মরুe¯Íwi রোধ করা। ভূমিক্ষয় রোধ করা।

৭। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা ciY করা।

কাজ- দলগত কাজ

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার ম্যাপ পোস্টার কাগজে তৈরি কর।

ebwÂ‡ji **ধরন ও বৈশিষ্ট্য ঃ কৃষি বন।**

পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঁঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। কৃষি বনায়ন হলো কোন জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন n‡"Q এক ধরনের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

১। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

২। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটায় উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়।

৩। খামারের উৎপাদন স্থায়িত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।

৪। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

৫। প্রান্তিক ভূমিজ mvaú` ব্যবহার হয়।

৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।

৭। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা ciY হয়।

৮। কৃষি বনে উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যায়।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

১। ফসলবন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।

২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।

৩। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ। মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।

৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু জমি সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২। খাদ্যের চাহিদা ciY ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

৩। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

৪। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র হটানো।

৫। এলাকাভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।

৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

৭। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

৮। মাটির-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।

৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপাকরী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।

১০। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।

কাজ-২ ঃ শিক্ষার্থীরা এককভাবে দুইটি করে বনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ m¤ú` গঠিত। এ বনজ m¤ú` একটি দেশের ¸iZcY m¤ú`| বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃm¤úK বিরাজমান। কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্র¯Í হলে অন্যগুলোও আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো AÂ‡j bZb ebvÂj সৃষ্টি বা সরকারি ebvÂj থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সকল m¤ú` সংরক্ষণ ও ব্যাবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা বন "আইন, ১৯২৭" নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার

১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করে যা "বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০" নামে পরিচিত। এ আইনের পর অবৈধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বটে কিন্তু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ m¤ú` সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য kw¯Íi বিধান রয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তাহলো-

১. সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

২. এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে b¨bZg তিনমাস এবং অনধিক চার মাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির we¯ÍwiZ উলেখ করে আবেদন করতে পারবেন।

৩. সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উলেখযোগ্য w`Kmgn জেনে নেই। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত KvRmgn দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা-

১. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ m¤ú` আহরণ করা।

২. অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ m¤ú` সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোনো স্থানে প্রেরণ।

৩. যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি ebvÂ‡j প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে ebvÂ‡ji ক্ষতিসাধন করা।

৪. ebvÂ‡j গবাদিপশু চরানো।

৫. প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।

৬. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।

৭. বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিদ্র করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।

৮. বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, জল বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।

৯. বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও n¯Íন্তর করা।

১০. বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

১১. যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে খাদ খোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যাতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।

১২. বিভাগীয় বন কর্মকর্তার cevbgwZ ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে Av‡Mqv¯¿mn প্রবেশ করা।

বন আইন j•N‡Yi kw¯Íi বিধান

বন আইন j•N‡Yi বিভিন্ন ধরনের kw¯Íi বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভং•Nর জন্য b¨bZg ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং m‡ev"P পাঁচ বছরের জেলসহ cÂvk হাজার টাকা জরিমানা বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বনপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে ebvÂ‡j বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার একই মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন ল•Nণ করা kw¯Í‡hvM¨ অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি ল•Nণকারীকে আদালত ছমাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং m‡ev"P দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গাকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা kw¯Í‡hvM¨ অপরাধ নয়।

কাজ-২ ঃ বন বিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি নিয়ে দলীয় আলোচনা কর। এ m¤úKxq পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যান্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যা মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজ m¤ú‡`i উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্র¯Í n‡"Q প্রজনন বিঘ্নিত n‡"Q, খাদ্য সংকট n‡"Q| অবৈধ শিকারীর কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস n‡"Q| বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজ m¤ú` চুরি ও পাচার করে। এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সৃজিত সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বংসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্র¯Í n‡"Q| ebRm¤ú`‡K ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনবিধি m¤ú‡K জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি ev¯ÍewqZ হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন নার্সারি

বন নার্সারি

আভিধানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয়। নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের ce পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব। নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয়।

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

এমন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপন করতে হয়। তা না হলে অঙ্কুরোদগমের হার কমতে থাকে। এসব প্রজাতির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন- গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। ভালোমানের বাগান করতে প্রয়োজন উন্নতমানের সুস্থ, সবল চারা। এ ধরনের চারা নার্সারিতে তৈরি করা যায়। আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য তাহলো-

১. সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায়।

২. বিভিন্ন বয়সের চারা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।

৩. অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

৪. কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।

৫. স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প খরচে অনেক চারা পাওয়া যায়।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

১. নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায়।

২. নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

৩. নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

৪. নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয়।

৫. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপণ করা হয়।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারির ধরন : নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন– ১. মধ্যম ভিত্তিক নার্সারি ২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি ৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক ৪. ব্যবহার ভিত্তিক

১. মাধ্যমভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয়। পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা খরা, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছ থেকে গাছে রোগ সংক্রমণ কম হয়। এ পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদন বেডের মাটি উর্বর হতে হয়।

২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের যেমন–

ক. স্থায়ী নার্সারি ঃ এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে। স্থায়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায়। গ্রিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে gja‡bi প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অস্থায়ী নার্সারি ঃ এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণে বেগ পেতে হয়।

৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরণের যেমন–

ক. গার্হস্থ্য নার্সারি ঃ পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল, ফল ও কাঠের চারা উত্তোলন করা হয়।

খ. ব্যবসায়িক নার্সারি ঃ এ নার্সারিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফল, সবজি, ফুল, কাঠ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উত্তোলন করে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৪. ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে বন নার্সারি পরিদর্শন করে বৃক্ষের তালিকা তৈরি করবে।

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ we¯ÍvwiK উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলো ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুন m¤úb মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপনের ce পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা

দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন ceeZx প্রক্রিয়াকরণ m¤ú‡K জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন ঃ মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারি গাছকে নির্বাচন। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশে বীজ মাতা গাছ এক বা একাধিক উৎস হতে শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি

২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা ebvÂj

৩) iv¯Ívi পাশের বৃক্ষ

৪) বিভিন্ন স্থায়ী নার্সারি, প্রভৃতি ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণ m¤úb মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

১. **ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ ঃ** বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুন, গর্জন, শাল, কদম, পিতরাজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।

২. **গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ ঃ** এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ব হবে তখন দা বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক `i chšÍ ছড়িয়ে যায় ফলে মাটি হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড জাতীয় - বাবুল, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল- মেহগনি, P¤úv, গ) কোন-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে শুকাতে হবে। এরপর পড, ক্যপসুল বা কোন ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।

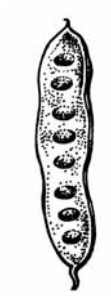

চিত্র : কড়ই এর পড

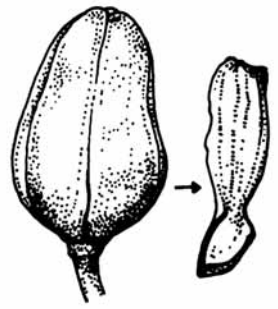

চিত্র : মেহগনির ক্যাপসুল

চিত্র : পাইন কোন

বীজ নিষ্কাশন ঃ ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাঁস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

১. **বাছাই পদ্ধতি ঃ** যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ সেগুন বীজ রৌদ্রে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

২. **শুকনো পদ্ধতি ঃ** জারুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেনজিয়াম, বাবুল মেহগনি, কড়াই গাছের বীজ শুকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে যখন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।

৩. **পচন পদ্ধতি ঃ** এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়। যেমন– আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি তার পরে বাতাসে শুকাতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ ঃ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে ছিটিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফ্রিজারেটর এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

কাজ ঃ বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হর্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

১. স্থান নির্বাচন ঃ Av‡jvevZvmcY খোলা মেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি উঠে না এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি m¤úb হবে। উন্নত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২. নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ঃ

এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সে.মি. x ১০ সে.মি.	৬৫ টি
১৮ সে.মি. x ১২ সে.মি.	৪৫ টি
২৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি.	২৬ টি
সীড বেডে শিকড় চারা হতে চারার `iZ	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
৫ x ৫ সে.মি.	৪০০ টি
১৮ সে.মি. x ১২ সে.মি.	২০০ টি
২৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি.	১০০ টি

৩. বেড নির্মাণ ঃ

অনিষ্টকারী জীবজন্ত ও পথচারীদের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার। স্থায়ী নার্সারিতে বেড়া দেওয়ার উপায়-

ক) ইটের দেয়াল ঃ স্থায়ী নার্সারির চার দিকে উঁচু ইটের c`qvল নির্মাণ করে বেড়া দেওয়া যায়।

খ) কাঁটা তারের বেড়া ঃ স্থায়ী নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া সহজে দেওয়া যায়।

গ) লোহার জালের বেড়া ঃ লোহার জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবন্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। কাঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াতেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।

ঘ) জীবন্ত গাছের বেড়া ঃ দূরন্ত, কাটা মেহেদী, মেন্দী, ঢোল কলমী প্রভৃতি জীবন্ত গাছ দিয়ে নার্সারির চার দিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪. ভূমি উন্নয়ন

নার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। নার্সারি বেড় তৈরির স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। মাটি তৈরির সময় বৃষ্টির বা সেচের পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালু ও ড্রেন করতে হবে। ভূমির মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫. অফিস ও আবাসিক এলাকা

নার্সারির অফিস ঘরটি প্রধান iv¯Ívi পার্শ্বে gj গেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। নার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬. বিদ্যুতায়ন ঃ

স্থায়ী নার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭. iv¯Ív ও পথ

নার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান iv¯Ív থাকা আবশ্যক। প্রধান iv¯ÍwU পরিকল্পিতভাবে নার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮. সেচ ব্যবস্থা

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের শুরুতেই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নর্দমা ও নালা

নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থায়ী নার্সারিতে এগুলো পাকা করতে হবে। নিয়মিত cwi"Qb রাখতে হবে।

১০. নার্সারি ব্লক

নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লককে আবার কয়েকটি সীড বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। গ্রিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদিও সুবিধামতোভাবে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১. নার্সারি বেড

বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

ক) **সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেডঃ** এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির মাটির কোদাল বা লাঙল দিয়ে আগলা করতে হবে। সব রকম আগাছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার ´ ৩ মিটার ´ ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।

খ) **পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি ঃ** এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সে.মি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

কাজ-২ ঃ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী যে কোনো একটি বনজ নার্সারি পরিদর্শন কর। নার্সারিতে যে সব বৃক্ষের চারা আছে। তার তালিকা তৈরি করে দলগতভাবে শিক্ষককের কাছে জমা দিবে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ আমাদের AwZgj¨evb জাতীয় m¤ú` | অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হয় তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে। সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়। তবে যেসব গাছ সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুতcY। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার। গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে।

এরপর কাঠের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীত্বকাল বেশ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ cwi‡"Q‡` আমরা বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, তক্তা পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা m¤ú‡K ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন কর।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

বৃক্ষের চারা রোপণ থেকে শুরুকরে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপক্বতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে। পরিপক্ব হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না। বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

১। **স্বল্প আবর্তন কাল ঃ** যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ পশু খাদ্য ও মণ্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয়। সাধারণতঃ ১০-২০ বছর আবর্তনকালে এসব বৃক্ষ কর্তন করা হয়। যেমন-আকাশমনি, কদম, শিমুল, তেলিকদম, কেওড়া, বাইন, বাবলা, ঝাউ, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।

২। **মাঝারি আবর্তনকাল ঃ** আংশিক শক্ত কাঠ প্রদায়ি cRwZmgn খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন-গামার, শিশু, আম, কড়ই, খয়ের বকুল, হরতকী, ছাতিয়ান, চন্দন, রেন্ডি কড়ই বা রেইনট্রি ইত্যাদি।

৩। **দীর্ঘ আবর্তনকাল ঃ** শক্ত জাতীয় কাঠ ও ধীর বর্ধনশীল প্রজাতিসমুহ শুধুমাত্র, কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন- সেগুন, গর্জন, শাল, জারুল, শীলকড়ই, মেহগনি, তেলসুর, চাপালিশ, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ঃ

১. গাছ যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে। সাধারণত মাটির ১০ সেমি উপরে গাছ কাটলে m‡ev"P পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়।

২. গাছ কাটার c‡e ডালপালা ছেটে নিলে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয়।

৩. গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেলতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে আগের মতোই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে গাছ Kw•LZ দিকে পড়বে।

৪. কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খণ্ডিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে। খণ্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ। এ লগকে করাত কলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার উপযোগী চিরাই কাঠে পরিণত করা হয়। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমি এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সেমি হলে তাকে বলা হয় তক্তা।

৫. গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সেমি উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সেমি উপরে। এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। গাছ কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক।

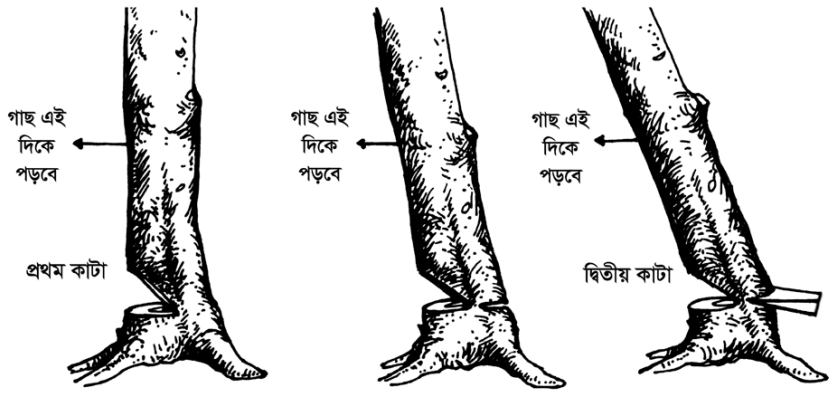

চিত্র : গাছ কাটার দৃশ্য

গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাপ পদ্ধতি ঃ

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের m‡Îi সাহায্যে বের করতে হয়।

mÎwU Gic t

$$fwjDg = 0.08 \times \frac{\text{বেড় ১} + (\text{৪} \times \text{বেড ২}) + \text{বেড ৩}}{\text{৬}} \times \text{^`N¨ NbwgUvi}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

উদাহরণ ঃ একটি গর্জন গাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত ?

সমাধান ঃ $fwjDg = 0.08 \times \frac{\text{বেড় ১} + (\text{৪} \times \text{বেড ২}) + \text{বেড ৩}}{\text{৬}} \times \text{^`N¨}$

$$= 0.08 \times \frac{(\text{১.৫} + \text{৪} \times \text{২}) + \text{২.৫}}{\text{৬}} \times 6 \text{ NbwgUvi}$$

$$= 0.08 \times \frac{\text{১২}}{\text{৬}} \times 6 \text{ NbwgUvi}$$

$$fwjDg = 0.96 \text{ NbwgUvi}$$

ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাপ

গোলকাঠ চেরাইকালে কিছুটা অপচয় হয়। সবটুকু কাঠই ব্যবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ ব্যবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হম্পাস এর m‡Îi সাহায্যে বের করা হয়।

$$\text{সূত্রটি এরূপ ঃ ভলিউম} = \left\{\frac{\text{লগের মাঝের বেড়}}{\text{৪}}\right\}^{\text{২}} \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

তক্তা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাপ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খন্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্নের m‡Îi সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

ভলিউম = দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটারে।

কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট

জীবন্ত অবস্থায় বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের গুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সহজে ঘুনপোকা, পোকা-মাকড় বা ছত্রাক আক্রমণ করতে পারবে না। বেশি দিন টিকবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কাঠ থেকে পানি বের করে নেয়ার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে। সিজনিং দুইভাবে করা যায়-

১. এয়ার ড্রাইং

গাছ কেটে চিরাই করার পর বাতাসে কাঠ শুকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রখর রোদে শুকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় ¯Í‡i ¯Í‡i শুকাতে হয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ফালি এলোমেলোভাবে বা বাঁকা করে সাজানো যাবে না। এতে করে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং হতে কমপক্ষে এক মৌসুম লাগে এবং আর্দ্রতার পরিমাণ ২০% এর কাছাকাছি থাকে।

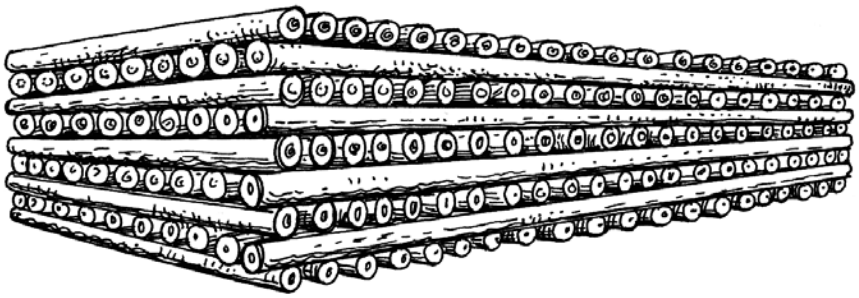

চিত্র : এয়ার ড্রাইং

২. কিলন পদ্ধতি

সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজন করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুটো তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য দুটো তক্তার মধ্যবর্তীস্থানে ৩-৪ সেমি পুরুদুটো কাঠের টুকরা দুপাশে বসাতে হবে যাতে দুটো তক্তার মধ্যখান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে Rjxqe®ú প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

কাঠ ট্রিটমেন্টের gjbxwZ হলো দ্রবণাকারে রাসায়নিক দ্রব্য কাঠ ও বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। সিসিএ (CCA) নামের রাসায়নিক দ্রব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি ৩টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪%, সিসিএ এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্যে থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপক্বতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগকে ¶wZM¯Í করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে ?

২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন ?

৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন ?

৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা ?

৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় ছেয়ে যেতে পারে কিনা ?

৬। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপড়ে পড়ে স্থাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা ?

৭। গাছ কোন বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা ?

৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা ?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ ও সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খণ্ডিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ m¤ú` আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ m¤ú` সংরক্ষিত হয়।

কাজ ঃ শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাণ করে পরিশোধের পদ্ধতি m¤ú‡K লিখে জমা দেব।

cÂg পরিচ্ছেদ
উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় AÂjmg‡n লবণাক্ততা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক `‡hv‡Mi ফলে প্রাকৃতিক বন রক্ষা ও সৃষ্টি হুমকীর মুখে পতিত হয়েছে। এসব উপকূলীয় AÂ‡ji পরিবেশগত ভারসাম্য সারা দেশের পরিবেশের উপর নানা ভাবে প্রভাব we¯Ívi করে থাকে। এজন্য we¯ÍY উপকূলীয় AÂ‡j লবণাক্ততা রোধী, R‡jv""Qvm ও NwYS‡o টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ এবং লবণাক্ততা সহ্যকারী ফসলের চাষ করে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ পরিকল্পনা ev¯Íevqÿb করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক `‡hv‡Mi কবল থেকে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক mxú` রক্ষা করা ছাড়াও উপকূলবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য (ঝাউ গাছ ও দেবদারুগাছ)

উপকূলীয় ebvÂj‡K লোনামাটির AÂjI বলা হয়। লোনা মাটির AÂj বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশালের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও তৎসংলগ্ন জেগে ওঠা PivÂjmgn| এসব AÂ‡ji প্রধান প্রধান বন বৃক্ষ cRwZmgn - নারকেল, আমড়া খেজুর, বাবলা, কাজুবাদাম, শিরিষ, রেইনট্রি, তাল, তেঁতুল, সুপারি, জলপাই ইত্যাদি। তবে উপকূলীয় AÂ‡ji উদ্ভিদ হিসাবে ঝাউ ও †`e`viMvQI উলেখযোগ্য। এসব উদ্ভিদের giR বৈশিষ্ট্য থাকায় লবণাক্ততা সহ্য করে উপকূলীয় আবহাওয়ার সাথে সহজে খাপখাওইয়ে নিতে পারে। উপকূলীয় AÂ‡ji অধিক লোনাযুক্ত মাটিতে সুন্দরি, গেওয়া, কেওয়া, কাঁকড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি ভাল জন্মে। লবণাক্ততার সাথে খাপখাওয়াতে এসব উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১। উপকূলীয় বনায়নের জন্য বেশি এলাকা জুড়ে শিকড় we¯ÍZ থাকে এরকম গাছ নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য উপকূলীয় বনে নারিকেল, সুপারি বা অন্যান্য এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের পরিমাণ বেশি থাকা বvÂbxq| এদের শিকড় বেশ এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটি ক্ষয় রোধ করা সহজ হয়। তবে উপকূলীয় বাঁধের বনায়নের ক্ষেত্রে সড়কের পাশের মতো একাধিক ¯Í‡i গাছ লাগাতে হবে। এতে মাটি ক্ষয় কম হবে।

২। অন্যান্য বাঁধের মতো উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে যেখানে গাছ লাগানো হয সে স্থান বেশ ঢালু হয়। তাই সারিবদ্ধভবে গাছ লাগাতে হবে। প্রথম লাইন যেখান শুরুহবে দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু করা হয়। `‡i `‡i গাছ লাগানো হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার `iZ হবে ২ মিটার ×১ মিটার। এর ফলে মাটি ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়বে।

৩। উপকূলীয় উদ্ভিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন পাতার কিউটিক্যাল ¯Íi খুব পুরু হয়। এ কারণে এসব উদ্ভিদ খরা প্রতিরোধক হয়।

৪। NwYSo mvB‡Kv‡bi g‡Zv `‡hvM মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে। কারণ এসব উদ্ভিদের কান্ড বেশ লম্বা ও শক্ত হয় এবং শাখা-প্রশাখা কম হয়। যেমন- নারিকেল, গজারি, খেজুর, তাল, ঝাউ, আকশমনি, বাবলা, দেবদারু প্রভৃতি।

৫। উপকূলীয় ewamgn `‡hv‡Mi সময় গরু-ছাগলের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কাজেই গাছলাগানোর সময় গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এরকম গাছও লাগাতে হয়। যেমন- ইপিল-ইপিল, আকাশমনি, ধৈÂv প্রভৃতি।

৬। যে সব উদ্ভিদ জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে উপকূলীয় বনায়নের জন্য যে সব উদ্ভিদ লাগাতে হবে।

৭। উপকূলীয় বনায়নে শক্ত ও লম্বা শক্ত কান্ড এবং ছোট পাতা ও ডালপালা কর্তন সহনীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে। যেমনঃ- শিশু, বাবলা, কড়ই, খেজুর, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

ঝাউ গাছ

বর্ণনা ঃ ঝাউ বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। D"PZv ১৫-১৮ মিটারের মতো হয়ে থাকে। বাকল বাদামি ও অমসৃণ। কাঠ খুব শক্ত তবে ফেটে যায়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকতে এক বছর সময় লাগে। বেলেমাটি বনায়নের ঝাউ গাছ খুবই কার্যকরী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রধানত উপকূলীয় এলাকা তবে দেশের বিভিন্ন স্থানেও ঝাউ গাছ জন্মে থাকে।

বীজ ঃ মে-জুন মাসে-বীজ সংগ্রহ করা হয়।

চারা উত্তোলন ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাউয়ের চারা উত্তোলন করা হয়।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ ফল সরাসরি গাছ থেকে পড়তে হয়। ডালের গোড়ার ফল ডাল পরিপক্ব হয় তা এ ফল সংগ্রহ করা উত্তম। ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে মাড়াই করে বীজ খোসা থেকে আলাদা করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ ঃ বীজ রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধক পাত্রে ৫-৭ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি ঃ

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ তলায় অথবা পলিব্যাগে বীজ বপন করা হয়। বীজতলা ও পলিব্যাগে পরিশোধিত বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বপন করা সুবিধাজনক। বীজ গজাতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। চারা গজানোর আগেই ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪০-৫০ দিন পর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে।

চারা বাছাই ও রোপণ পদ্ধতি ঃ

বীজ তলায় অতিরিক্ত চারা গজালে কিছু চারা তুলে ফেলতে হয়। আগাছা বাছাই করতে হয়। পলিব্যাগে চারার শিকড় পলিব্যাগের বাইরে এলে কেটে দিতে হয়। ঝাউ গাছ দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। ৬ মাস বয়সী বড় চারা রোপণ করা উত্তম। বালিয়ারি ও লোনা মাটিতে ঝাউ গাছ ভালো হয়। এ জন্য উপকূলীয় AÂ‡ji বনায়নের ঝাউ গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার ঃ

কোণাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সৌন্দর্যের জন্য সড়ক, মহাসড়কের পাশে রোপণ করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় এ গাছ উপকূলীয় AÂ‡j বেশি লাগানো হয়। জ্বালানি হিসাবে এ কাঠ উৎকৃষ্ট। কাঠ খুব শক্ত তাই খুঁটি ও খড়িকাঠ হিসেবেও ব্যবহার হয়।

দেবদারু

বর্ণনা ঃ চির হরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড মোটা, সোজা ও অতি উঁচু হয়। সাধারণত সোজাবর্ধন হিসাবে রোপণ করা হয়ে থাকে। গাছ ৫০-৬০ মিটার লম্বা হয় এবং ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, যৌগিক, দেখতে অনেকটা বর্শার মতো কিন্তু কিনারা ঢেউ খেলানো। সাধারণত অক্টোবর মাসে ফুল হয়, তারপর ফল এবং পাকে দেরিতে। বাংলাদেশের সব AÂ‡jB এ গাছ পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় ঃ জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ পাকা ফল কালো রঙের হয়। ফল পাকলে গাছ থেকে বা গাছ তলা থেকে সংগ্রহ করে e¯Íwq রেখে পচিয়ে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। দেবদারু বীজ সংরক্ষণ করা যায় না বলে সংগ্রহ করার সাথে সাথে তা বীজ তলায় বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি ঃ প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৯০ ভাগ। ৭-১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম m¤úb হয়।

চারার বয়স রোপণের সময় ঃ দেড় থেকে দুই বছর বয়সের চারা সড়কের পাশে, বাগানের ও উপকূলীয় AÂ‡j জুন-জুলাই মাসে রোপণ করা উত্তম।

ব্যবহার ঃ দেবদারু কাঠ হালকা ও নরম। টিনের ধারের ফ্রেম, পাটাতন, দেশলাই ও প্যাকিং বক্স তৈরিতে দেবদারু কাঠ ব্যবহার হয়। কাগজের মণ্ড তৈরিতেও দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, NwYSo, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় AÂj রক্ষা করা। জ্বালানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনের উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। উপকূলীয় ebvÂ‡ji Dc‡hwMZv mgn বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

১. এ ebvÂ‡ji বৃক্ষরাজি উপকূল AÂ‡ji ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-নিম্নস্থ পানির ¯Íi বৃদ্ধি করে।

২. ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীবকুলের বাসউপযোগী করতে সাহায্য করে।

৩. পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উত্তাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।

৪. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী উপকূলীয় AÂ‡j সৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড়, R‡jv"Qvm ও সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষ ও জীব জন্তুকে রক্ষা করে।

৫. ভূমিধস, বালিয়াড়ি ও ঝড়রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

৬. এ ebvÂj মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে অত্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

৭. উপকূলীয় বনায়ন আমাদের gj¨evb cvKwZK m¤ú` সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুতে প্রাকৃতিক `‡hv‡Mi হাত থেকে রক্ষা করতে ¸iZcY fvgKv পালন করে। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যনগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাভান্না বেষ্টনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য AfZce| এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ বিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

১. উপকূলীয় ebvÂ‡j বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিশীম। এ ebvÂ‡j ভ্রমনকারী দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ m¤úmwiZ হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

২. ফলজ উদ্ভদ যেমন- নারকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।

৩. ebvÂ‡j উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফুল, ফল ও cje¸"Q থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

৪. উদ্ভিদ রাজির কান্ড ও শাখ থেকে জ্বালানি কাঠ, খুঁটি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, যানবাহন, কৃষি উপকরণ, রেলওয়ে স্লিপার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাজ ঃ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়?

২. বন বিধি কী ?

৩. বন নার্সারি বলতে কী বোঝায়?

৪. গাছের অপচয় পুরাপুরি রোধ করতে হলে কীভাবে কর্তন করতে হবে?

eYbvgjK ck

১. চিত্রসহ বাংলাদেশের ebvÂ‡ji we¯—vZ বর্ণনা কর।

২. বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৩. গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. বাঁশ ও কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট এর উপায় বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ-

ক. ১২.১৬ লক্ষ হেক্টর খ. ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর

গ. ১৪.১৬ লক্ষ হেক্টর ঘ. ১৫.১৬ লক্ষ হেক্টর

২. নিচের কোন e¶ ¸"Q পাহাড়ি বনের?

ক. গর্জন, গরান, গামার। খ. গজারি, গেওয়া, সেগুন।

গ. তেলসুর, P¤úv, চাপালিকা। ঘ. জারুল, রেইনট্রি, পশুর।

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ ebfvg অবস্থিত-

i. দক্ষিণ cevÂ‡j|

ii. দক্ষিণ cvðgvÂ‡j|

iii. উত্তর cvðgvÂ‡j|

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তিয়া টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে বনের উপর প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। এক পর্যায়ে সে দেখতে পেল ঐ বনের অধিকাংশ গাছেরই অংজ্কুরোদগম ফল গাছে থাকা অবস্থায়ই n‡"Q এবং চারা গাছ গজানোর পর তা মাটিতে পড়ে কাদায় গেঁথে hv‡"Q|

৫. তিয়ার দেখা অজ্কুরোদগম নিচের কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

ক. গরান খ. গামার

গ. গর্জন ঘ. গজারি

৬. তিয়ার দেখা eb¨Â‡ji বৈশিষ্ট্য হলো -

i. মাটি কর্দমাক্ত থাকে।

ii. বায়ুবীয়gj বিদ্যমান।

iii. শাখাgj দীর্ঘ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ৪ শতক জমিতে মেনজিয়াম বীজ রোপণ করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সে.মি × ১০ সে.মি আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে জামান সাহেব ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।

ক. নার্সারি কাকে বলে?

খ. নার্সারি স্থাপনের একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. জামান সাহেবের নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় কর।

ঘ. জামান সাহেবের সফলতার কারণ বিশেষণ কর।

২. সুফিয়া বেগম বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর c‡e লাগানো দুটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিলো ৩ মিটার।

ক. কাঠ সিজনিং কী?

খ. আবর্তন কালের ভিত্তিতে গামার, শিশু কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা কর?

গ. সুফিয়া বেগম একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় কর।

ঘ. সুফিয়া বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কৃষি সমবায়

একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করা সমবায়। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় gjab সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা সুচারুরূপে m¤úb করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের cvi¯úwiK সম্মতির ভিত্তিতে একটি কৃষি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এইরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে। এইরূপ সমবায় দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত হলে সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা কৃষি সমবায় m¤ú‡K আলোচনা করব।

চিত্র : সমবায় অফিস

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- কৃষি সমবায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বিশেষণ করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যাখ্যা করতে পারব
- কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা বিশেষণ করতে পারব।

প্রথম cwi‡"Q`

কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

বিষয়টি বুঝতে খেলা দিয়েই শুরু করা যাক। পাড়ায় বা মহল্লায় কিশোর কিশোরীরা কোনো খেলা, ধরা যাক ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন, বা টেবিল টেনিস খেলতে চাও। কি করা যেতে পারে? প্রথম কাজ খেলার সাথি সংগ্রহ করা। খেলার স্থান নির্বাচন করে রেফারি ঠিক করা ও মুরুব্বিদের অনুমতি নেয়া। এরপর খেলার সামগ্রী, ক্রিকেট হলে ব্যাট, বল, ÷¨vwú, ব্যাডমিন্টন হলে নেট, নেটের খুঁটি, কর্ক, ব্যাট, টেবিল টেনিস হলে টেবিল, ব্যাট, বল এগুলো কেনা। সাথিরা সবাই মিলে টাকা একত্র করে এগুলো কেনা। আবার তহবিলে কিছু অর্থ যেন থাকে যা থেকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফুরিয়ে যাওয়া সামগ্রী কেনা যায়। আরেকটি অতি দরকারি কাজ হলো, তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করা। একে মোটামুটি বলা যায় যে, সমবায় পদ্ধতিতে খেলা।

কৃষিকাজ m¤úb করতে এবং কৃষি থেকে m‡ev"P মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেও সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একে আমরা বলব কৃষি সমবায়। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা AvÂwjK হয়। আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কৃষক উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারেনা। ev¤úvi ফলন হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতোটাই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি এলাকায় তাঁদের নিজস্ব ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম থাকতো তাহলে এই আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত। কোনো একজন কৃষকের পক্ষে (খুব বড় ও ধনী কৃষক না হলে) এই সুবিধাগুলো অর্জন সম্ভব না হলেও প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, সাধারণত এটাই সমবায়ের ভিত্তি।

গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: **'দশের লাঠি একের বোঝা'।** অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা বরং সহজে বহনযোগ্যই নয় বরং লাঠির মতো উপকারী হতে পারে।

কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি chw³mgn যেমন শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় D"PgvÎvi সক্ষমতা এনে দিতে পারে এবং এভাবে D"P মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। তদুপরি কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়। ফলে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এবার আমরা কৃষি সমবায়ের কিছু উপযোগিতা একটু we¯ÍwiZfv‡e আলোচনা করবো।

সমবায়ের প্রকার

উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষকগণ নানা ধরনের সমবায় গড়ে তুলতে পারেন।

১। **কৃষি** gjab **সমবায়** (mÂq **সমবায়) :** উদ্দেশ্য সমবায়ের প্রয়োজনীয় gjab সংগ্রহ

২। **কৃষি উপকরণ সমবায় :** উদ্দেশ্য বীজ, সার, ঔষদ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার

৩। **কৃষি উৎপাদন সমবায় :** কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

৪। **কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় :** cY¨gj¨ নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষার জন্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব m¤ú‡K একটি প্রতিবেদন লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

দ্বিতীয় cwi‡"Q`

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

কৃষি উপকরণগুলোকে মোটা দাগে আমরা কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা দেখব যে সমবায়ের মাধ্যমে এই সকল উপকরণ যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় তেমনি এ সকল উপকরণের m‡ev"P লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি জমি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এই উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর চাইতে ক্ষুদ্রতর কৃষি জমির মালিক। এমন কী যাদের আড়াই একর বা তার কিছু বেশি পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে তাঁরাও তাঁদের কৃষিকাজের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে দামি যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নন। যদি কোনোভাবে কিনেও ফেলেন ঐ যন্ত্রপাতির m‡ev"P ব্যবহার করতে পারেন না। নিজের কাজ শেষে হয় যন্ত্রটি বসিয়ে রাখতে বা ভাড়ায় দিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের m‡ev"P পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীগণ সম্মত হলে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ ZjbvgjK নিচু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যায়। দক্ষ ও স্ব"Q e্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন হবে।

পানি : কৃষিকাজের জন্য পানি অত্যন্ত ¸iZcY| পানি ছাড়া কোনো ধরনের কষিকাজই চালানো সম্ভব নয়। কয়েক দশক আগে আমাদের দেশে কৃষিকাজের জন্য গভীর bjK‡ci সুপারিশ করা হতো। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে গভীর bjK‡ci অতি ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব নয়। সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে mvÂZ পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে mÂq করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। জলাধার করা, সেখান থেকে cv‡¤úi সাহায্যে সেচ নালা বা পাইপে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে, স্বল্প অপচয়ে, সেচের পানি ব্যবহার করা যায়। f-Dcwi¯’ জলাধারে mvÂZ পানি দিয়ে সেচ দেওয়ার খরচ তুলনামূলক অনেক কম। তা ছাড়া সেচ ছাড়াও এই জলাধারের পানি অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজে লাগে যা লাভজনক।

কৃষি যন্ত্রপাতি : কৃষির আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ যত সহজে সমবায়ের মাধ্যমে করা সম্ভব তা ব্যক্তি মালিকানায় সম্ভব নয়। সমবায়

পদ্ধতিতে যে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা যে কোনো উন্নত দেশের মানকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

কৃষির জন্য সার, ঔষধ, বীজ, খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও ব্যবহার

বীজ, সার, পালিত পশু পাখি মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিবারক ঔষধেরও একটা বড় অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়। সরকারের কৃষি সেবা সংস্থাগুলোও বীজ,সার,ঔষধ সরবরাহ করে। সমবায় তার বাৎসরিক প্রয়োজন আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারে এবং সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে সেই তথ্য আগেভাগেই সরবরাহ করতে পারে। এতে জাতীয় কৃষি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো সরবরাহযোগ্য উপকরণের মোট চাহিদা m¤ú‡K জেনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

কৃষি ঋণ : কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বা"Q›দবোধ করবে। প্রথমত: ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় রয়েছে, দ্বিতীয়ত: ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে, তৃতীয়ত: এবং সর্বোপরি, যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমবায় দিতে সক্ষম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

তৃতীয় cwi‡"Q`

কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

কৃষি পণ্য উৎপাদন : পণ্য শব্দটির ব্যবহার বলে দেয় যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনের জন্যই সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা n‡"Q| তা সে উৎপাদিত দ্রব্য শস্য, ফুল, ফল, তন্তু, বীজ, বাঁশ, কাঠ, ডিম, দুধ, মাংস, চামড়া, মাছ যাই হোকনা কেন। gj উদ্দেশ্য লাভ বা মুনাফা অর্জন। কৃষি পণ্য উৎপাদন উৎপাদক এবং ভোক্তা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যহানিকর যেন না হয় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব যেন হয়, সেই দিকেও লক্ষ্য রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন জরুরি।

সমবায়টি কোনো কৃষি পরিবেশ AÂ‡j অবস্থিত, কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জমি শ্রেণি, মাটির গুণাগুণ, সমবায়ী পরিবারগুলোর এবং বাজারের চাহিদা ইত্যাদি এবং পরিবেশবান্ধবতা বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষিপণ্য এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত। কৃষি ক্ষেত্রে এবং খামারে যাতে কোনো রোগ-বালাইয়ের উপদ্রব না হয়, হলেও যাতে তা কার্যকরভাবে নিরাপদ রাখা যায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার c¯‘wZ থাকা দরকার। উৎপাদিত দ্রব্য নিরাপদে সংগ্রহ করার বিষয়টিও জরুরি। সংগ্রহের পর সংরক্ষণ পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন বাছাই-ছাটাই শ্রেণি বিভাজন, প্যাকেটজাতকরণ বা যথাযথ পাত্রে স্থাপন ইত্যাদি কাজও পণ্যের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক হয়। উপযুক্ত সময়ে বিপণনের জন্য কম বেশি সময়ের জন্য পণ্য গুদামজাত করে রাখার প্রয়োজন। কৃষি পণ্য গুদামজাত করতে উপযুক্ত এবং কার্যকর পাত্র যেমন প্রয়োজন, তেমনি গুদামের পরিবেশও সৃষ্টি করতে হয়। ধান, গম, ভুট্টা বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদি পণ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকানোর প্রয়োজন হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রে রেখে পাকা গুদামে রাখতে হয়। খুব ধনী কৃষক না হলে একজনের পক্ষে এই সকল সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সমবায় এই আয়োজন সহজেই করতে পারে।

কৃষি পণ্য বিপণনে আরেকটি কার্যক্রম হলো নিরাপদ পরিবহন। পরিবহনের পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি ¸iZcY বিষয়। প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর। শস্য পরিবহনে চটের e¯Ív উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল-ফলের জন্য কোনোক্রমেই উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্যের কোনটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার। আবার মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি ব্যবহার করা নিরাপদ হলেও মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনে প্রয়োজন পানি ভরা বড় পাত্র। পোনা এমনভাবে পরিবহন করতে হবে যাতে পোনা অক্সিজেনের অভাবে মারা না যায়। ডিম পরিবহনের জন্য বিশেষ পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে ভাঁজ করে হাজার হাজার ডিম এক সাথে পরিবহন করা যায়। আবার দুধ পরিবহন প্রয়োজন বিশেষ পাত্রে। বিপণনের সুবিধার জন্য কৃষি সমবায়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার আগে থেকে m¤úb চুক্তি থাকলে সবচাইতে ভালো হয়। এই আয়োজনও সমবায় ভালোভাবে করতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে বিপণনের হিসাব নিকাশ/রেজিস্ট্রার্ড খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সমবায় m¤ú‡K এ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হলো সেগুলো বিবেচনায় নিলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ার c‡e এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এই মহৎ কর্মযজ্ঞের mPbv হয় মাত্র। দ্বিতীয় অতি ¸iZcY পদক্ষেপ হলো জমি ও অর্থ সমবায়ে যুক্ত করা। তারও আগে দরকার সমবায়ের gj শর্ত তথা বিধিগুলো আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের নিকটবর্তী দপ্তরের সহযোগিতাও চাওয়া যেতে পারে। পরামর্শ নেয়া যেতে পারে উপজেলা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য কর্মকর্তাদের। সমবায় অধিদপ্তর প্রণীত কৃষি সমবায়ের গঠন প্রণালি অনুসরণ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তা যথানিয়মে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু এক সাথে কৃষিকাজ করার জন্য একমত হয়ে, কোনো সংগঠন না গড়ে নিলে এইরূপ সমবায় বেশি `i এগোতে পারে না। বরং স্ব"Qতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এর অকাল মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। মোদ্দা কথা হলো, সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য একটি দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটিই সমবায় সংগঠন। কৃষি পরিকল্পনা, ev¯Íevqb, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সকল হিসাব পাই পাই রক্ষা করবে এই সংগঠন। মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টনের দায়িত্বও এই সমবায় সংগঠন পালন করে। সরকারের বা সরকারি বে-সরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভুর্তকি, সেবা গ্রহণ করবে এবং হিসাব রাখবে। কৃষি পণ্য ক্রেতা সংস্থা, †Kv¤úvwb বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবে এবং তদানুযায়ী ব্যবসা করবে। সমবায়ীদের সাধারণ সভার কাছে সমবায়ের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে এবং mgn হিসাব উপস্থাপন করবে।

তাই আমরা দেখতে cvw"Q সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের হৃৎপিন্ড। এই সংগঠন যত দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই লাভবান হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা m¤ú‡K একটি প্রতিবেদন c¯‘Z করবে এবং উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষি সমবায় বলতে কী বোঝ?

২. সমবায় কত ধরনের হতে পারে?

৩. কৃষি সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা লিখ।

eYbvgjK প্রশ্ন

১. কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করবে বর্ণনা কর।

২. কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করবে বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি কোনটি ?

ক. বালাইনাশক ব্যবহার
খ. রাসায়নিক সার ব্যবহার
গ. শস্য পর্যায় অবলম্বন
ঘ. গুদামজাত করণের রাসায়নিক দ্রব্যব্যবহার

২. কৃষি পণ্যের মানোন্নয়নে প্রয়োজন –

i. ফসলের মান অনুযায়ী সজ্জিতকরণ।

ii. যথাযথভাবে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ।

ii. সঠিক ভাবে ফসলের পরিচর্যা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তা আলম সাহেবের সহযোগীতায় গড়ে তোলেন নব জাগরণ কৃষি সমবায় সমিতি। লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শ স্বরূপ।

৩. ঐ সমিতির মাধ্যমে এলাকার কৃষকগণ লাভ করেন–

i. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা

ii. D"P মুনাফা অর্জনের নিশ্চয়তা

iii. রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুফলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ঐ গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশ বান্ধব কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন?

ক. অগভীর নলকূপ খনন খ. গভীর নলকূপ খনন

গ. f-Dcwi¯' জলাধার নির্মাণ ঘ. cv‡¤úi মাধ্যমে সেচের ব্যবস্া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পরিমল বাবু, গোমেজ বাবু যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'ফুল নার্সারি' স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়েই তারা আয়ের মুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে?

খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায় ব্যাখ্যা কর।

গ. পরিমল বাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উলিখিত AÂ‡j কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বের যথার্থতা gj¨vqb কর

সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির gj চালিকা শক্তি। এদেশের কৃষক প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালনা করে আসছে। এদেশের কৃষক তার খামারে শস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে। এ অধ্যায়ে পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

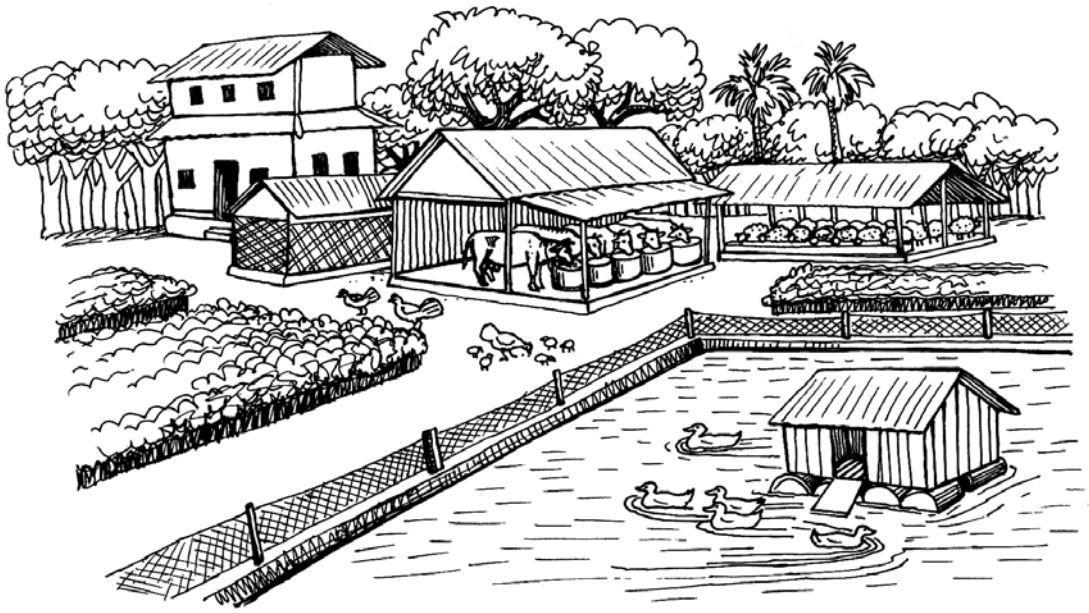

চিত্র : পারিবারিক খামার

এই অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

১। পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

২। পারিবারিক কৃষি খামার তৈরির কলাকৌশল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩। ক্ষুদ্র আয়ের উৎস হিসাবে পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪। পারিবরিক দুগ্ধ খামার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করতে পারব।

৫। দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরের যত্ন বর্ণনা করতে পারব।

৬। দুগ্ধ দোহন ও সংরক্ষণের সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৭। পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।

৮। খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশের কৃষক পরিবার কৃষি খামারের মাধ্যমেই শস্য, শাকসবজি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। আকার অনুযায়ী খামার বাণিজ্যিক ও পারিবারিক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কৃষি খামার আবার বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খামারের জন্য বেশি পরিমাণ gjab ও লোকবল প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক খামারের জন্য কম gjab প্রয়োজন। পারিবারিক কৃষি খামার পরিবারের ভরণপোষণ মিটিয়ে কখনো কখনো কিছু অতিরিক্ত আয় করে থাকে। বর্তমানে কৃষক পারিবারিক কৃষি খামার থেকে আয় করার চিন্তা মাথায় রেখে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। gjZ পরিবারের সদস্যদ্বারাই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালিত হয়।

পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব

১। পরিবারের খাদ্যে ও পুষ্টির চাহিদা মেটায়।

২। অতিথি আপ্যায়নে fwgKv রাখে।

৩। পরিবারের বেকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।

৪। পরিবারের সদস্যদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

৫। পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃস্টি হয়।

৬। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়।

৭। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আগাছা, ফসলের বর্জ্য ও DcRvZmg‡ni সঠিক ব্যবহার করা যায়।

৮। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির gjgÎ ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৯। পরিকল্পিত পারিবারিক কৃষি খামার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১০। কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে।

নতুন শব্দ : ক্ষুদ্র আয়, দুগ্ধ দোহন।

পারিবারিক শাকসবজি ও পোল্ট্রি খামার

পারিবারিক শাকসবজি খামার

প্রধানত: পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য এই খামার তৈরি হলেও পারিবারিক ক্ষুদ্র আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই খামারের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই খামার বাড়ির আশে পাশে খালি জায়গা, উঁচু ভিটা, মাঝারি নিচু জমিতেও করা যায়। অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শ নিয়ে ঋতুভিত্তিক সারা বছরের চাষ পরিকল্পনা করলে প্রায় সারা বছরেই এই খামার থেকে ফসল পাওয়া যেতে পারে। যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পরেও কিছু আয়ও করতে পারে। পারিবারিক নিবিড় পরিচর্যায় আগাম ফসল উৎপাদন করতে পারলে D"P বাজার gj¨

পাওয়া যেতে পারে। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। যা সবার চাহিদা মেটাতে পারে। রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক সার ব্যবহার না করেও ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে শাকসবজি নিরাপদ ও সুস্বাদু হয়।

পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

পোল্ট্রি বলতে গৃহপালিত পাখি যেমন, হাঁস, মুরগি, কবুতর, তিতির, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। তিতির ও কোয়েল আমাদের দেশের নিজস্ব পোল্ট্রি না হওয়ায় তেমন জনপ্রিয় নয়। এদেশের কৃষক পারিবারিক পোল্ট্রি খামারে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। গৃহপালিত পাখি পালন এ দেশের কৃষকের কৃষ্টির Awe‡"Q`¨ অংশ। অতীতকাল থেকে কৃষক তার খামারে দেশি জাতের হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। সাধারণত কৃষক তার খামারে ৫-১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এই প্রচলিত খামারে কোনো উন্নত বাসস্থান বা খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে না। হাঁস-মুরগি নিজেরা বাড়ির আশেপাশে চরে খাদ্য শস্য ও পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে । এতে পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে এবং অনেক সময় ডিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ও হয়ে থাকে। এখানে বাণিজ্যিক বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশি জাতের হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা পারিবারিক খামারে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগি পালন করে আসছে যারা বছরে ২৫০টির মতো ডিম দেয়। এই পারিবারিক খামারে তারা অধিক মাংস উৎপাদনশীল ব্রয়লার মুরগিও পালন করে আসছে।

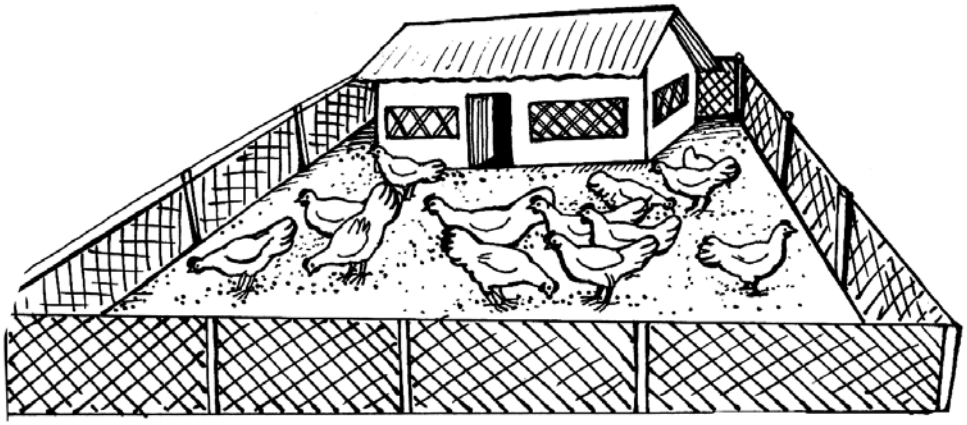

চিত্র : একটি পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

এসব পারিবারিক খামারে ৫০- ৩০০টি পর্যন্ত উন্নত জাতের ব্রয়লার বা লেয়ার মুরগি বা হাঁস পালন করতে দেখা যায়। যেসব কৃষক জমির অভাবে শস্য, গরু, ছাগল ও মাছ চাষ করতে পারে না তারা সহজে পারিবারিক হাঁস -মুরগির খামার স্থাপন করতে পারে ।

সফলভাবে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। বিশেষ করে পোল্ট্রির জাত, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ cwZ‡ivagjK ব্যবস্থা এবং টিকাদান KgmwP m¤ú‡K জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পোল্ট্রিকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পাখির চিকিৎসাকে বোঝায়। পোল্ট্রির ক্ষেত্রে চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেয়- কথাটি অধিক প্রযোজ্য। কারণ কোনো পোল্ট্রি খামারে রোগ দেখা দিলে

চিকিৎসা না করে কখনো ব্যবসা লাভজনক করা যায় না। তাই পারিবারিক পোল্ট্রি খামার পরিচালনার সময় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

১। সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ev"Pv দ্বারা খামার শুরু করা।

২। বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের আশপাশে পরিষ্কার রাখা।

৩। খামারের চারিদিকে মাঝে মধ্যে জীবাণুনাশক স্প্রে করা।

৪। খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা।

৫। সম্ভব হলে বেড়া দিয়ে খামারকে ঘেরাও করা।

৬। ঘরের মেঝে ও মুরগির লিটার শুকনা রাখা।

৭। পোল্ট্রির ঘর ce - পশ্চিমে লম্বালম্বি করা।

৮। ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।

৯। খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।

১১। সুষম খাবার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

১২। হাঁস, লেয়ার ও ব্রয়রার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান KgmwP মেনে চলা।

১৩। খামার কর্মীর শরীর ও শোষাক cwi"Qb থাকা।

মহামারী আকারে রোগ দেখা দিলে সকল পাখিকে ধ্বংস করে মাটি চাপা দিতে হবে। রোগ নিরাময়ে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক গবাদিপশুর খামার

হাঁস-মুরগির মতো গবাদিপশু পালনও এদেশের পারিবারিক কৃষি খামারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গৃহপালিত গবাদিপশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্রই পারিবারিক খামারে গরু ও ছাগল দেখা যায়। কিন্তু মহিষ ও ভেড়া সর্বত্র দেখা যায় না। ধনী খামারির পক্ষে গরু ও মহিষ পালন করা সম্ভব। কিন্তু দরিদ্র ও fwgnxb‡`i জন্য ছাগল পালন করা সহজ। বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে ছাগল পালন খুবই লাভজনক। কারণ ছাগলের মাংসের চাহিদা ব্যাপক থাকায় ইহার বাজার gj¨ অনেক বেশি। ব্যাক বেঙ্গাল ছাগল দ্রুত প্রজননের উপযুক্ততা লাভ করে। এরা একসাথে ২-৩টি ev"Pv প্রসব করে। পুরুষ ছাগল ৮ মাস বয়সে বাজারজাত করা যায়।

আমাদের দেশি গাভী দৈনিক ১.০-১.৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। তাই পারিবারিক দুগ্ধ খামারে দেশি গরু দ্বারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায় কিন্তু কোনো বাড়তি আয় করা যায় না। আমাদের চাহিদার তুলনায় দুধের সরবরাহ খুব কম হওয়ায় পারিবারিক গরুর খামারে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। হল্স্টাইন ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের সংকর গাভী দৈনিক ১৫-২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের পারিবারিক খামারগুলোতে এ ধরনের উন্নত জাতের সংকর গাভী পালন করা দরকার। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক উন্নত জাতের গাভীর পারিবারিক খামার করে সফলতা পেয়েছে। পারিবারিক খামারে গাভীর সংখ্যা ২-৫টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাভীর সংখ্যা এর অধিক হলে তা বাণিজ্যিক খামারের রূপ নেয় এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয়।

সফলভাবে পারিবারিক পশু খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। বিশেষ করে পশুর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ cwZ‡ivagjK ব্যবস্থা এবং টিকাদান KgmwP m¤ú‡K জ্ঞান থাকা দরকার।

গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পশু খামারের রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা প্রদান করাকে বোঝায়। পশুর চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করে পশুকে উৎপাদনে আনতে অনেক সময় লাগে। তাই গবাদিপশুর খামার পরিচালনার সময় রোগ না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

১। উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের চারিদিক পরিষ্কার রাখা।

২। খামারে সাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। খামারের আঙ্গিনায় নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা।

৪। খামারের পানি নামার জন্য নর্দমার ব্যবস্থা করা।

৫। গোয়াল ঘর ce -পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে তৈরি করা।

৬। খামারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।

৭। বন্য পশুপাখি খামারে ঢুকতে না দেওয়া।

৮। খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।

৯। সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

চিত্র : গুরু গোসল করানো n‡"Q|

১০। পশুকে নিয়মিত গোসল করানো

১১। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান KgmwP মেনে চলা।

১২। মৃত পশুকে মাটি চাপা দেওয়া।

১৩। পশুর রোগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা যেকোনো একটি খামার পরিদর্শন করবে এবং খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা m¤ú‡K প্রতিবেদন লিখবে।

পারিবারিক মৎস্য খামার

পারিবারিক মৎস্য খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

আমদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে অনেকের বাড়িতেই পুকুর আছে। এই পুকুরগুলো গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব পুকুরে সাধারণত: সনাতন পদ্ধতিতে কিছু মাছ চাষও করা হয়। যেমন- পোনা ছাড়া হয় মাছের খাবার হিসাবে বাড়ির যে উদ্বৃত্ত ভাত ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য থাকে তা দেওয়া হয়। ফলে এসব পুকুরে উৎপাদন অনেক কম। অথচ এসব পুকুরে পরিকল্পনামাফিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই উৎপাদিত মাছ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি

করা যায়। আবার বাড়ির আঙ্গিনায় বা পিছনে কিছুটা জায়গা থাকলে সহজেই একটি মিনি পুকুর খনন করা যায়। এবং এই মিনি পুকুরকেও পারিবারিক মৎস্যখামার হিসাবে গণ্য করে মাছ চাষ করা যায়। এসব পারিবারিক মৎস্য খামার গুলো বাড়ির মহিলাদের দ্বারাও পরিচালনা করা সম্ভব। মহিলারা এসব কাজ করার ফাঁকে কিছুটা সময় পুকুরে মাছ চাষের জন্য ব্যয় করলে একদিকে যেমন সহজেই পারিবারিক আমিষের চাহিদা ciY হবে অন্যদিকে সংসারে বাড়তি আয়ও সম্ভব হবে। আবার পারিবারিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

পারিবরিক খামারে চাষ উপযোগী মাছ

নিচে পারিবারিক খামারে চাষ করা যায় এরকম অর্থনৈতিক গুরুত্ব m¤úb কয়েকটি মাছের বর্ণনা দেওয়া হলোঃ-

ক) দেশি মাছ

চাষযোগ্য দেশি মাছের প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ চাষের জন্য খুব উপযোগী। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছগুলো পাওয়া যায়। তবে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘিসহ বদ্ধ পানিতে এরা ডিম পাড়ে না। বর্ষাকালে (মে-জুলাই) এ সকল মাছ স্রোতযুক্ত নদীর কম গভীর অংশে ডিম ছাড়ে। প্রণোদিত বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের পোনা উৎপাদন করা যায়। চাষকালীন সময়ে এ সব মাছ m¤úiK খাদ্য হিসাবে ফিশমিল, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের fwm গ্রহণ করে। পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা মাছ বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত হয়। রুই ও মৃগেল মাছ বছরে ১কেজি ওজনের হতে পারে। দুই বছর বয়সে এসকল মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয়।

খ) বিদেশি মাছ

আমাদের দেশের পরিবেশে সহজে খাপ খায়, দ্রুত বাড়ে ও হ্যাচারিতে সহজে পোনা তৈরি করা যায় এমন কিছু বিদেশি মাছ চাষের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাছ n‡"Q সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও, থাইসরপুঁটি, তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা ও থাইপাঙ্গাশ। এসব মাছ দেশি কার্প জাতীয় মাছের সাথে সহজেই মিশ্র চাষ করা যায়।

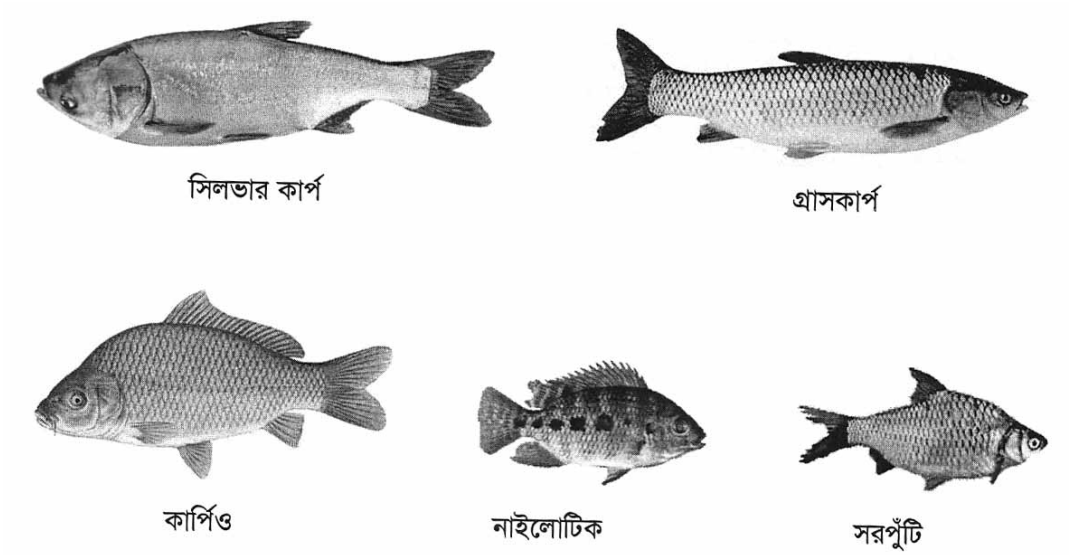

চিত্র : চাষযোগ্য কয়েকটি বিদেশি মাছ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ

অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো n‡"Q-

ক) খামারে পোনা মজুদce ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতি)ঃ ১) পুকুরের আগাছা পরিষ্কার ২) রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ `ixKiY ৩) পাড় মেরামত ৪) চুন প্রয়োগ ৫) সার প্রয়োগ ৬) পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ৭) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা।

খ) পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনাঃ ১) পোনার প্রজাতি নির্বাচন ২) ভালোপোনা বাছাইকরণ ৩) পোনা শোধন ৪) পোনার পরিমাণ নির্ধারণ ৫) পোনা পরিবহন ৬) পোনা অভ্যন্তকরণ ও ছাড়া।

গ) পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ ১) নিয়মিত সার প্রয়োগ ২) m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ ৩) মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ৪) মাছ ধরা ও বিক্রয়।

খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় ভিত্তিক উপকরণ mg‡ni চাহিদা নিচে দেওয়া হলো:

ব্যবস্থাপনার পর্যায়	উপকরণের চাহিদা
মজুদ ce বা পুকুর প্রস্ততি	দা, কোদাল, মাছ মারার বিষ (যেমন-রোটেনন), চুন, সার (জৈব ও অজৈব), বালতি, ড্রাম, মাটির চাড়ি, মগ, সেকী ডিক্স
মজুদকালীন	মাছের রেণু, হাড়ি বা পলিথিন ব্যাগ, খাবার লবণ, পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট, পি.এইচ কাগজ, থার্মোমিটার।
মজুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, মাটির চাড়ি, বাঁশের টুকরা, সেকী ডিক্স, m¤úiK খাদ্য, বালতি, মগ/বাটি, খাদ্যদানি, চুন/জিপসাম, দাঁ/কাঁচি, ব্যালেন্স, পাহার। দেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (ধর্ম জাল, ঝাঁকি জাল, বেড় জাল)।

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মাছ চাষকালীন সময়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাছের রোগের সাধারণ লক্ষণ n‡"Q মাছের সাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়, ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম খায়, মাছের দেহ অতিরিক্ত খসখসে AbfZ হয়। চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ n‡"Q ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পচা রোগ এবং মাছের উকুন। খামারের পুকুরে মাছ রোগাক্রাšÍ হলে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

১. মাছের ক্ষত রোগ: প্রাথমিকভাবে পুঁটি, শোল, টাকি মাছ এবং পরবর্তী সময়ে কার্প জাতীয় মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ শীত এবং গ্রীষ্মকালে এ রোগ দেখা যায়। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ অধিকতর সহজ। রোগ প্রতিরোধের সহজ উপায় n‡"Q পুকুরে নিয়মিত শুকিয়ে চুন দেওয়া, পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান স্থিতিবস্থায় রাখা। মাছের পাশাপাশি পুকুরে কিছু m¤úiK খাদ্য প্রয়োগ করা পুকুরে অতিরিক্ত পোনা মজুদ না করা, পুকুরে কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য না ফেলা, পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা এবং পুকুরে ঘনঘন ঝাকি জাল না ফেলা।

পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

১. মাছ ভেসে ওঠা ও খাবি খাওয়া (পানিতে অক্সিজেনের অভাব)

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ব, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। অক্সিজেনের অভাবে মৃত মাছের মুখ "হা' করা থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা cwmú দিয়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র : বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন মেশানো

২. পানির উপর সবুজ ¯—i

অতিরিক্ত সবুজ শেওলা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায়। এর পলে মাছের শ্বাস কষ্ট হয় হয় ও মাছ পানির উপর খাবি খেতে থাকে। শেওলা পচে পরিবেশ নষ্ট হয়। মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পাতলা mwZ কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়। সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে। কিছু বড় সিলভার কার্প ছেড়ে জৈবিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩. পানির উপর লাল ¯—i

লাল শোওলা অথবা অতিরিক্ত আয়রণের জন্য এ সমস্যা দেখা যায়। এর প্রভাবে পানিতে m‡hi আলো প্রবেশ করতে পারে না। মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। আবার পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতিও হয়। শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সে.মি নিচে বাঁশের খুটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে শেওলা দমন করে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে তেরি করে পানির উপর টেনে বা পাতলা mwZ কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

৪. ঘোলা পানি

বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশ করে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। পাড়ে ঘাস না থাকলেও এমনটি দেখা যায়। এর ফলে পানিতে m‡hi আলো ঢুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ফিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায়।

৫. পুকুরের তলদেশের কাদায় গ্যাস জমা হওয়া

কারণ: পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ লতাপাতা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুর শুকনো হলে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

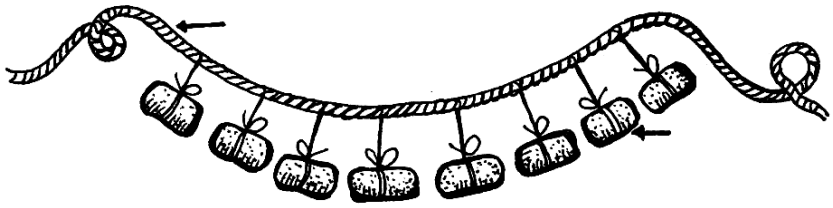

চিত্র : হররা

পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের gj উদ্দেশ্য n‡"Q পরিবারের মাছের চাহিদা মেটানো এবং সেসাথে সাথে সম্ভব হলে বাড়তি কিছু মাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের স্ব"QjZv বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

নতুন শব্দঃ হররা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার

গাভী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। একজন মানুষের বছরে প্রায় ৯০ লিটার দুধ পান করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করে থাকে। তাই দেশে দুধের উৎপাদন ও চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে গুঁড়া দুধ আমদানি করে এই ঘাটতি আংশিক ciY করা হয়। দেশে দুধের ঘাটতি থাকায় বিগত দুই দশকে মানুষের মধ্যে গাভী পালন ও দুগ্ধখামার স্থাপনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহর ও উপশহরে অনেকেই পারিবারিকভাবে গাভী পালন করছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালনে গাভীর বাসস্থান ও

খাদ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গাভী পালন করে স্বকর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, fwgnxb ও প্রান্তিক চাষিদের আয় বাড়ানো যায় এবং পরিবারের পুষ্টি ও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং আমরা নিজের বাড়িতে পারিবারিক খামার করে ২-৫টি গাভী পালনের মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করে দুধের চাহিদা মেটাতে পারি।

উন্নত জাতের গাভীর খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি গাভী সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপন করা যায়। সাধারণত ৫টি বা তদুর্দ্ধ গাভী সমন্বয়ে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যায়। ঋণের মাধ্যমে gjab সংগ্রহ করলে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ক্ষতিয়ান বিবেচনা করে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। খামারের জন্য গাভী নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে উন্নত জাতের অধিক `»m¤úb হয়। পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য বসতবাড়ির উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচনে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে , সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১। অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শুষ্ক fwg|

২। খামারের fwg উন্নয়ন ও নির্মাণ।

৩। খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ।

৪। বসতঘর হতে একটু `‡i|

৫। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৬। পানি ও পশু খাদ্যের প্রাপ্যতা।

৭। পণ্যের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা বিবেচনা।

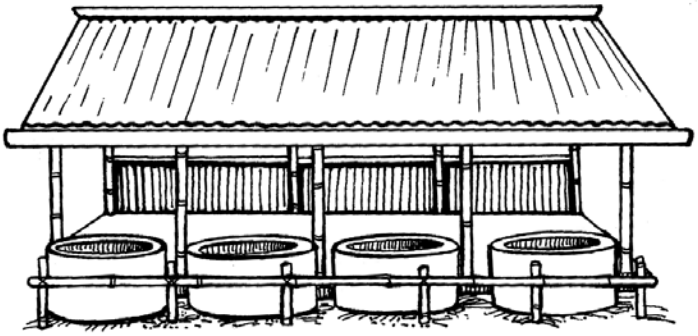

চিত্র : একটি পারিবারিক গোশালা

পারিবারিক দুগ্ধ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করতে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। খামার নির্মাণের জন্য gjab থেকে শুরু করে গাভীর ev"Pv প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় উহাদের গুণগতমান m¤ú‡K খেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে DcKiYmg‡ni পরিচিতি দেওয়া হলো :

১। gjab| ২। খামারের fwg বা জমি। ৩। ভালো জাতের গাভী। ৪। আদর্শ গোশালা। ৫। গোশালা নির্মাণ সামগ্রী। ৬। উন্নত খাদ্যের ও পানির পাত্র। ৭। ঘাসের জমি। ৮। পানির লাইন। ৯। পরিবহনের জন্য পিক আপ / মটর ভ্যান বা রিকসা ভ্যান। ১০। ঘাস কাটার চপিং মেশিন। ১১। ফিড ট্রলি ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। ১২। দুগ্ধ দোহন ও বিতরণ সামগ্রী। ১৩। পশুর প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি। ১৪। পশুর জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য। ১৫। টিকার সরবরাহ। ১৬। পশুকে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা।

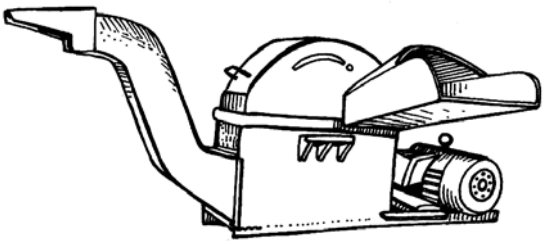

চিত্র : ঘাস চপিং মেশিন

কাজ : পারিবারিক দুগ্ধ খামারের উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যবতী ও কর্মক্ষম থাকে সে ব্যবস্থা করা। একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ev"Pv প্রসবের জন্য গাভীর সেবা করা। গাভীর পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে।

১। গাভীকে নিয়মিত হাঁটাচলা করানো।

২। প্রয়োজনবোধে গাভীর খুর কাটা।

৩। গাভীর স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করা।

৪। দুধ দোহনের সময় গাভীকে উত্তেজিত ও বিরক্ত না করা ।

৫। গাভীকে নিয়মিক কৃমির ঔষধ খাওয়ানো।

৬। গাভীকে সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া।

৭। প্রতিদিন গাভীর শরীর ব্রাশ করা।

৮। ঘরের দুর্গন্ধ ও মশা-মাছি দমনের জন্য মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা।

৯। গাভীর বাসস্থান বা গোয়ালঘর সব সময় পরিষ্কার cwi"Qb রাখা।

১০। প্রতিদিন গাভীকে গোসল করানো। ফলে গাভী পরজীবী যেমন- আঠালি, উঁকুন, মাছি, মাইটস ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

১১। গাভীর দুধ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে নির্দিষ্ট সময় দোহন করা।

১২। দুধ দোহনের পূর্বে ওলান পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া, দোহনকারীর হাতও পটাশ মিশ্রিত পানি বা জীবাণুনাশক ঔষধ মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া।

১৩। গাভীর ev"Pv প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হলে ডাক্তারি পরীক্ষা করে গরম হওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৪। ev"Pv প্রসবের পর গাভীর ফুল পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা `‡i সরিয়ে মাটিতে পুতে ফেলা।

১৫। ev"Pv জন্মের পর প্রসবের iv¯—vi বাইরের অংশটুকু জীবাণুনাশক ঔষধ মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা।

বাছুরের পরিচর্যা

একটি সুস্থ ও সবল বাছুর আগামী দিনের একটি ভালো উৎপাদরক্ষম ষাড় বা গাভীতে পরিণত হয়। তাই অধিক উৎপাদনক্ষম গাভী পেতে হলে গর্ভবতী গাভী ও বাছুরের যত্ন নিতে হবে। দেশে ষাড় দিয়ে প্রচলিত প্রাকৃতিক প্রজনন বন্ধ করে আধুনিক প্রযুক্তির কৃত্রিম প্রজনন ব্যবহার করতে হবে। এতে করে দুগ্ধ খামারের জন্য উন্নত জাতের সংকর বাছুর পাওয়া যাবে। নিম্নে বাছুরের সার্বিক পরিচর্যা আলোচনা করা হলো।

১। একটি ভালো ev"Pvi জন্য গর্ভাবস্থায় গাভীকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা।

২। ev"Pv প্রসবের সময় গাভীকে পরিষ্কার cwi"Qb ও শুকনো জায়গায় রাখা।

৩। বাছুর জন্মের স্থান শুকনো খড় ও ছালা বিছিয়ে নরম করে দেওয়া।

চিত্র : খড় বিছানো বাছুরের ঘর

৪। বাছুর জন্মের পর পরই তাকে ছালার উপর রেখে নাক মুখের শেষ্মা পরিষ্কার করে দিতে হবে যাতে বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাসে সুবিধা হয়।

৫। শরীর পরিষ্কার করার পর পরই বাছুরকে গাভীর সম্মুখে দিতে হবে, এতে গাভী বাছুরের নাক, মুখ, চোখ ও শরীর থেকে আঠাল পদার্থ চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

এরপর সম্ভব হলে বাচুরের শরীর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া।

৬। বাছুরের নাভী রজ্জু ঝরে না গেলে নাভী থেকে ৫ সেন্টিমিটার `‡i নতুন বেড দিয়ে নাভী রজ্জু কেটে দিয়ে সেখানে টিংচার আয়োডিন, বেনজিন, ডেটল বা স্যাভলন লাগানো।

৭। বাছুরকে শাল দুধ খাওয়ানো।

৮। বাছুর ও গাভীকে অন্য পশু থেকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে।

৯। বাছুর যাতে পরিমিত দুধ পান করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

১০। বাছুরকে প্রয়োজনে মিল্ক রিপেসার (Milk Replacer) ও কিড স্টার্টার (Kid Starter) খাওয়ানো।

১১। বাছুরকে দৌড়াদৌড়ি করার সুযোগ দেওয়া যাতে বাছুরের দেহ সুস্থ ও সবল থাকে।

১২। এঁড়ে বাছুরকে সময়মতো খাসি করানো।

কাজ ঃ শিক্ষার্থীরা এককভাবে গরুর বাছুরের জন্য একটি কাফ স্টার্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

দুগ্ধ দোহন

গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে দুধ দোহন বলে। নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে একই গোয়ালা দ্বারা গাভী থেকে দুধ দোহন করতে হয়। এতে করে গাভী স্থিরতাবোধ করে এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

দুধ দোহনের ধাপ-

১। দুধ দোহনের সময় ঃ প্রতিদিন দুবার অথবা তিনবার দুধ দোহন করা যায়। নির্দিষ্ট mgqmwP মেনে দোহন করলে দুধ উৎপাদন বাড়ে।

২। গাভী প্রস্তুত করা ঃ দুধ দোহনের c‡e কখনোই গাভীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই গাভীকে মারধর করা যাবে না। দুধ দোহনের c‡e গাভীর ওলান ও বাঁট কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে ওলান ও বাট ধুয়ে নিতে হবে।

৩। গোয়ালার প্রস্তুতি ঃ দোহনের c‡e †গায়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। গামছা বা কোনো কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে। দোহনকারীর নখ কেটে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর বদভ্যাস যেমন- থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি কথা বলা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে।

৪। দোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করা ঃ ওলান থেকে দুধ দোহনের সময় বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা বালতি ব্যবহার করা উচিত। দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরবর্তি দোহনের ce পর্যন্ত তাকে পাত্রগুলো উপুড় করে রাখতে হবে।

৫। গাভীকে মশামাছি মুক্তরাখা ঃ দুধ দোহনের সময় মশা মাছি যেন গাভীকে বিরক্ত না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬। দুধ দোহনের জন্য গাভীকে উদ্দীপিত করা ঃ বাছুরের দ্বারা গাভীর বাঁট চুঁষিয়ে অথবা গোয়ালা কর্তৃক ওলান ম্যাসাজ করে গাভীকে দুধ দোহনের জন্য উদ্দীপিত করতে হবে।

৭। দোহনের সময় গাভীকে খাওয়ানো ঃ দুধ দোহনের সময় গাভীকে e¨¯Í রাখার জন্য অল্প পরিমাণ দানাদার খাদ্য বা সবুজ ঘাস গাভীর সামনে দেওয়া উচিত। এতে গাভী খাবার খেতে e¨¯Í থাকে এবং দুধ দোহন সহজ হয়।

দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি ঃ দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি দুই প্রকার -

১। সনাতন পদ্ধতি ঃ হাত দ্বারা দোহন

২। আধুনিক পদ্ধতি ঃ যন্ত্রের সাহায্যে দোহন

দুধ দোহনের সময় যে কোনো একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

হাত দিয়ে দুগ্ধ দোহন ঃ দোহনের সময় ওলানের বাঁটের গোড়া বন্ধ রেখে বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে বাঁটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে। আবার চাপ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ওলান থেকে বাঁটে দুধ এসে জমা হয়। এভাবেই প্রক্রিয়াটি বারবার চলতে থাকে। হাত দিয়ে দোহনের সময় গাভীর বামপাশ থেকে দোহন করতে হয়। দুধ দোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাঁট একসাথে ও পরে পিছনের দুই বাঁট একসাথে দোহন করা হয়। আবার অনেকে গুণ (X) চিহ্নের মতো সামনের একটি ও পিছনের একটি বাঁট একসাথে অথবা যে বাঁটে দুধ বেশি আছে বলে মনে হয় সেগুলো আগে দোহন করে থাকে।

চিত্র : দুগ্ধ দোহনের বালতি

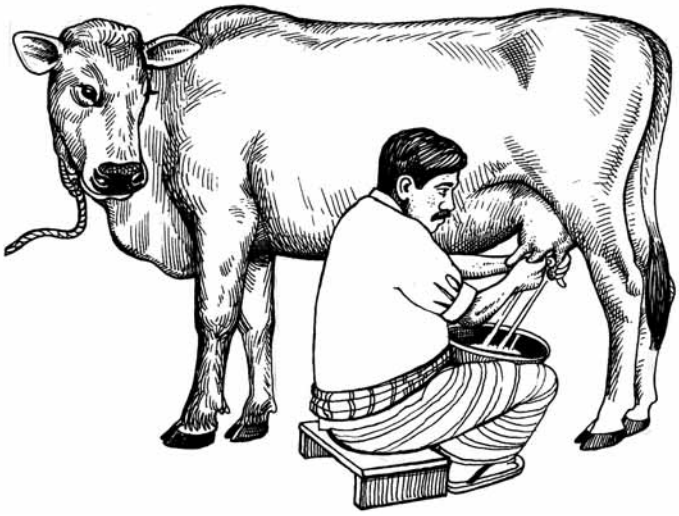

চিত্র : হাত দিয়ে দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি

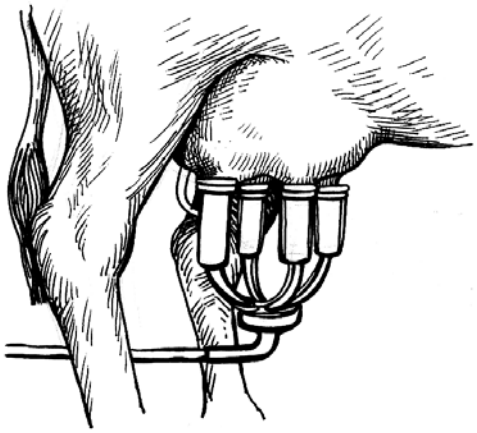

চিত্র : যন্ত্র দ্বারা গাভীর দুগ্ধ দোহন করা n‡"Q

চিত্র : দুধ দোহনের বিশেষ পাত্র

বড় বড় বাণিজ্যিক খামারে যেখানে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিট কাপ লাগিয়ে দুগ্ধ দোহন যন্ত্র চালু করা হয়। এতে সহজে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুগ্ধ দোহনের আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতি m¤ú‡K Zjbvgj K আলোচনা করবে।

দুগ্ধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত দুধকে খাদ্য হিসাবে উপযোগী রাখতে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দোহনের পর পরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠাণ্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সাধারণত কাঁচা দুধ বিক্রি করা হয়। দুধ অধিক সময় কাঁচা অবস্থায় থাকলে গুণগত মান ক্ষুন্ন হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কাই (*Streptococci*) নামক জীবাণু প্রধানত দুধে এসিড তৈরি করে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। নিম্নে দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ক) দুধ সংরক্ষণের সনাতন পদ্ধতি

দুধ তাপ দ্বারা ফুটিয়ে সংরক্ষণ করা : পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে ৪ ঘণ্টা ভালো থাকে। তাই ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে ফুটালে প্রায় সবরকম রোগ উৎপদানকারী জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবে, এতেও দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কেননা D"P তাপ প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ভিটামিন ও অ্যামাইনো এসিড নষ্ট হয়ে যায়।

খ) দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

১। রিফ্রিজারেটরে অল্প সময়ের জন্য ৪০ সে. রেখে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

২। ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। এখানে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিক, তবে দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

৩। দুধ c¯—wiKiY

পৃথিবীতে দুধকে অন্যতম আদর্শ খাদ্য বলা হয়। এই দুধ বাছুর বা মানুষের জন্য আদর্শ খাবার, সাথে সাথে এটি অণুজীবের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দুধ দোহনের পর সময়ের সাথে সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে এবং দীর্ঘক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় m¤úYi‡c এটি নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে প্রধানত অণুজীবকে দায়ি করা হয়। এই অণুজীব AwZD"P তাপমাত্রায় ও নিম্ন মাত্রায় জন্মাতে ও বংশ we¯—vi করতে পারে না। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হলো c¯'wiKiY| দুধ পাস্তুরিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস করা। দুধ বেশি সময় সংরক্ষণ এর জন্য অবাঞ্জিত জীবাণু ধ্বংস করা, দুধে উপস্থিত এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণ।

লুই c¯'i (১৮৬০-১৮৬৫খিস্ট্রাব্দ) একজন ফরাসি রসায়নবিদ প্রথম অনুধাবন করেন যে, পচন প্রণালি এক প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘঠিত হয়। যদিও লুই c¯'iB c¯—wiKiY প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, কিন্তু দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে ড. সথসলেট নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম এর ব্যবহার করেন। দুধে উপস্থিত রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও এনজাইম ধ্বংস কল্পে দুধের প্রত্যেক কণাতে ১৪৫ ফা: (৬২.৮) তাপমাত্রায় ৩০ মি. সময়কাল অথবা ১৬২ ফা: (৭২.২ফা) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ডে সময়কাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করাকে c¯'wiKiY বলে। c¯'wiKZ দুধ সঙ্গে সঙ্গে ৪ সে: তাপমাত্রার নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

পাস্তুরিকরণ এর সুবিধা:

১। cv¯‘wiKZ দুধ নিরাপদ, কেননা এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।

২। cv¯‘wiKiY দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে, কেননা ইহা ল্যাকটিক এসিড c¯‘ZKvix জীবাণুর সংখ্যা কমায়।

৩। cv¯‘wiKiY এর ফলে দুধের এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় । যার ফলে দুধ দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকে।

৪। cv¯‘wiKi‡Yi মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়।

৫। এই প্রক্রিয়ায় দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে, কোনো বিস্বাদের সৃষ্টি হয় না।

পাস্তুরিকরণের অসুবিধা:

১। cv¯‘wiKiY প্রক্রিয়া আদর্শ উপায় করতে না পারলে অতিরিক্ত Av‡jv"Q‡j দুধের চর্বিকণা পৃথক হতে পারে।

২। তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৩। D"PZvcRwbZ কিছুটা বিস্বাদের সৃষ্টি করতে পারে।

পাস্তুরিতকরণের প্রকারভেদ:

১। নিম্নতাপ দীর্ঘ সময় cv¯‘wiKiYt ৬২.৮০ সে. তাপ ৩০ মি. সময়ের জন্য।

২। D"PZvc কম সময় cv¯‘wiKiYt ৭২.২০ সে. তাপ ১৫ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

৩। AwZD"PZv‡c cv¯—wiKiYt ১৩৭.৮০ সে. তাপে ২ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

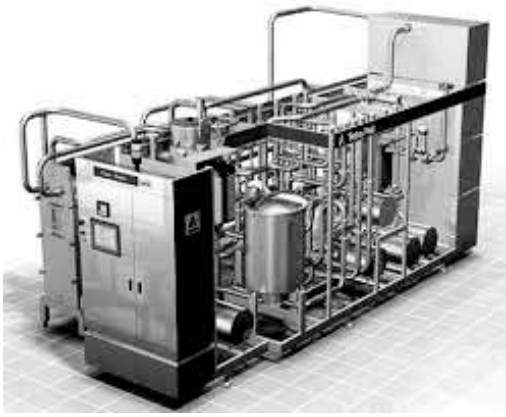

চিত্র : দুধ cv¯—wiKi‡Yi আধুনিক মেশিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-অস্থাবর m¤ú` m¤úwËi বিবরণ, ব্যয় বা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মুনাফার

তথ্য লিপিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

পারিবারিক খামার : আলিফ পারিবারিক খামার

মালিকের নাম : আলিফ মিঞা

ঠিকানা ; গ্রাম- বয়রা

মৌজা -বয়রা-ভালুকা

উপজেলা/থানা- ময়মনসিংহ সদর

ডাকঘর- ময়মনসিংহ ২২০২

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ : ২ বিঘা (সাতষট্টি শতাংশ) মোট।

উঁচু জমি	:	৩০ শতক
মাঝারি নিচু জমি	:	১০ শতক
বসত বাড়ি	:	৭ শতক
পুকুর	:	২০ শতক
খামার	:	৩ টি
১। মৎস্য খামার	:	২০ শতক
২। সবজি খামার	:	১০ শতক
৩। ব্রয়লার মুরগির খামার	:	৩ শতক

নিম্নে ব্রয়লার মুরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণনা করা হলো।

খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন করলে নিজেদের খাবার মাংস ও ডিমের চাহিদা মেটে। তাছাড়া ব্রয়লার ও খাবার ডিম বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি-

ক। স্থায়ী খরচ

খ। চলমান খরচ

স্থায়ী খরচ (Capital or Fixed Expenditure) : খামারে e¨vPv তোলার আগে জমি, মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র, ড্রাম ও বালতি ইত্যাদি LvZmg‡n যে mg¯— খরচ হয় তাকে gjab বা স্থায়ী খরচ বলে। নিচে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

জমি	মুরগির ঘর তৈরি	ব্রুডার যন্ত্র (হোভার, চিক গার্ড, বাল্ব)	খাদ্যের ও পানির পাত্র	পানির বালতি ও ড্রাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১০০০/-	১২,০০০/-

চলমান খরচ (Recurring Expenditure) ঃ খামারে e¨vPv ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। e¨vPv পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে ২-৫ টির মৃত্যু হয়। চলমান খরচের মধ্যে e¨vPvi দাম, খাদ্য ক্রয়, চলতি বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মুরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উলেখযোগ্য। ব্রয়লার মুরগি মোট ১ মাস খামারে থাকে। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের চলমান খরচ হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৫০/ -)	খাদ্য ক্রয় (প্রতিটি ৩০০ কেজি, প্রতি কেজি ৩৩/ -)	বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক ৩০০/ -)	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৫,০০০/ -	৯,৯০০/ -	৩০০/ -	১৫০০/ -	২০০/ -	নিজ	৫০০/ -	১৭,৪০০/ -

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১৬০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে ক্লাসে জমা দিবে।

প্রকৃত ব্যয় হিসাবের জন্য মোট চলমান খরচের সাথে মুরগির ঘর, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও চলমান খরচের উপর অপচয় খরচ (Depreciation Cost) হিসাব করতে হবে।

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ (Depreciation Cost)

১। মুরগির ঘরের উপর (৮০০০/- টাকার উপর ৫%) = ৪০০/-

২। যন্ত্রপাতির উপর (৪,০০০/-টাকার উপর ১০%) = ৪০০/-

৩। মোট স্থায়ী gjab ও মোট চলমান খরচ = (১২,০০০+ ১৭,৪০০/-) উপর ১৫% = ৪,৪১০/-

মোট বাৎসরিক অপচয় খরচ = ৫,২১০/- টাকা

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাচ পালন করা যায় তবে একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ হবে = টাঃ ৫২১/- টাকা
অতএব মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = টাঃ ১৭,৪০০/- +টাঃ ৫২১/- = টাঃ ১৭,৯২১/-

আয় (Income) ঃ ব্রয়লার মুরগি, লিটার ও খাদ্যের e¯—vi বিক্রি করে আয় করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি থেকে আয় হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

ব্রয়লার মুরগি বিক্রি ৯৫টি (৫%মৃত্যু) ১৫০/ - কেজি (গড় ওজন ১.৪ কেজি)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ৬টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
১৯,৯৫০/ -	১০০/ -	৬০/-	২০,১১০/ -

নিট লাভ =(মোট আয় - মোট ব্যয়)=টাঃ ২০,১১০/- - টাঃ ১৭,৯২১/- = টাঃ ২,১৮৯/- টাকা

কাজ : শিক্ষার্থীরা খামারের আয় ব্যয়ের ও লাভ ক্ষতির হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি m¤ú‡K লিখবে।

নতুন শব্দ: স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার ।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মৌসুমী পুকুরে কী কী মাছ চাষ করা যেতে পারে?

২. পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করতে কী কী উপকরণের দরকার।

৩. cv¯ÍwiKiY কী?

৪. মাছের খাবি খাওয়া বলতে কী বোঝ?

eYbvgjK ck

১. পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. মাছের ৫টি সাধারণ রোগের নাম লিখ এবং যে কোনো তিনটি রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।

৩. পারিবারিক দুগ্ধ খামারে কীভাবে গাভীর পরিচর্যা করা হয় বর্ণনা কর।

৪. ২০০ টি ব্রয়লার মুরগি দ্বারা গঠিত পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের আয় ব্যায়ের হিসাব লিপিবদ্ধ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. পারিবারিক মিনি পুকুরে চাষ করা হয় কোন মাছ ?

ক. মৃগেল খ. গ্রাস কার্প

গ. সরপুঁটি ঘ. পাঙ্গাশ

২. দুধ cv¯ÍwiK করণের উদ্দেশ্য-

i. জীবানু ধ্বংস করা।

ii. গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখা।

iii. রাসায়নিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নিহন মিয়া তার বাড়ির সামনের ৬০ শতকের ১.৫ মিটার গভীরতার পুকুরে মাছের চাষ করেন। বর্ষার শেষে তিনি পুকুরে গিয়ে লক্ষ করেন তার পুকুরের মাছগুলো ঘাটে পুতে রাখা বাঁশের সাথে গা ঘষছে। তিনি এ বিষয়ে মৎস কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলে মৎস্য কর্মকর্তা তাকে কিছু পরামর্শ দেন।

৩. নিহন মিয়ার পুকুরের মাছগুলো কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল?

ক. ক্ষত রোগ খ. লেজ পচা রোগ

গ. মাছের উকুন রোগ ঘ. লাল ফুটকি রোগ

৪. নিহন মিয়ার পুকুরের জন্য কমপক্ষে কত কেজি ডিপটারেক্স প্রয়োজন?

ক. ১.৫ কেজি খ. ১.৮ কেজি

গ. ২.৫ কেজি ঘ. ২.৮ কেজি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ- হাসিফ দীর্ঘ দিন ধরে নিজ আঙ্গিনায় দেশি জাতের মুরগি পালন করে আসছেন। এতে তেমন লাভবান না হওয়ায় তাঁরা পোল্ট্রি খামারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পারিবারিক পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলতা লাভ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ করলেন তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশকে `IZ করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পচিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে?

খ. বাণিজ্যিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. আরিফ-হাসিফের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফ-হাসিফের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা বিশেষণ কর।

সমাপ্ত

2013

wk¶vel

9,10-Kwlwk¶v

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :